বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

তেতাল্লিশতম খণ্ড	গ্রীষ্ম সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫

সম্পাদক
ভীষ্মদেব চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক
সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক ইয়ারুল কবির
সম্পাদক	:	অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী
সহযোগী সম্পাদক	:	অধ্যাপক সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ
সদস্য	:	অধ্যাপক আবদুল বাছির
		অধ্যাপক শুচিতা শরমিন
		অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
Price	:	Tk. 200.00
		US$ 10.00

প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal of the Asiatic Society of Bangladesh) edited by Professor Bhishmadeb Choudhury, published by Professor M. Siddiqur Rahman Khan, General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5, Old Secretariat Road, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 02-226640753, E-mail: asbpublication@gmail.com

সূচিপত্র

বাংলার মোগল মসজিদ স্থাপত্যের ছাদ নির্মাণরীতি ও কৌশল: একটি সমীক্ষা
এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম ১
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.001

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতা: কৃষক-শ্রমিক প্রসঙ্গ
ইসমাইল সাদী ৩৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.002

ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন সংবাদপত্র: একটি সাধারণ পর্যালোচনা
মোঃ মনিরুজ্জামান ৫১
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.003

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলাধীন নতুন আবিষ্কৃত ভালাইপুর গণহত্যা: একটি জরিপ প্রতিবেদন
পারভীনা খাতুন ৬৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.004

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মানুষের অন্বয়
মোঃ মোকাদ্দেস-উল-ইসলাম ৮৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.005

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ
মো. আবু বকর সিদ্দিক ১০৭
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.006

বাংলাদেশের ছোটগল্প : নারী মনস্তত্ত্বের স্বরূপ
রোজী আহমেদ ১২৯
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.007

আগুনপাখি : বিদীর্ণ মানব মনস্তত্ত্বের বিনির্মাণ
জাহিদ হাসান সরকার ১৪৩
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.008

জাকির তালুকদারের ছোটগল্প: ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নিম্নবর্গীয় বাস্তবতা
মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম ১৬১
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.009

গ্রন্থ-পর্যালোচনা

মনসুর মুসা, *পাণিনি, চমস্কি ও তারপর*
মোছা: খাদিজা খাতুন মিম ১৭৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.010

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় এশিয়ার সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকারদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেওয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এক কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ:
   - বাংলা বিজয় সফট্ওয়্যারের সুতন্বি-এমজে ফন্টে প্রবন্ধটি কম্পোজ করতে হবে। প্রবন্ধটির মোট শব্দসংখ্যা ৩০০০ থেকে ৫০০০-এর মধ্যে সীমিত হতে হবে;
   - কাগজের সাইজ হবে A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ১.৫ ইঞ্চি, নিচে ১.৫ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি।

২. প্রবন্ধের সাথে প্রবন্ধকারের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়ে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে:
   - জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি;
   - এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
   - প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
   - এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে প্রবন্ধকার পত্রিকার একটি কপি ও প্রকাশিত প্রবন্ধের দশ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. কোনো প্রবন্ধ প্রকাশের বিষয়ে সম্পাদনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

৫. বাংলা একাডেমির *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের বানান অনুযায়ী প্রবন্ধটি রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো ভুক্তিতে (entry) একাধিক শীর্ষশব্দ (headword) থাকলে প্রথমটির বানান গ্রহণ করতে হবে। তবে গবেষক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তাও অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।

৬. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।

৭. প্রবন্ধের শেষে টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যানুক্রমে উপস্থাপন করতে হবে। মূল পাঠের মধ্যে টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যা সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ[১]) ব্যবহার করাই নিয়ম।

৮. মূলপাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৯. তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে লেখকের পূর্ণ নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশস্থান, প্রকাশক, প্রকাশকাল এবং পৃষ্ঠা নম্বরের উল্লেখ করতে হবে।

১০. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই : *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)।

১১. প্রবন্ধের সূচনায় একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে। আনুমানিক ২০০ শব্দের সারসংক্ষেপ এবং চাবি শব্দ (Key word) (৩-৭টি) থাকতে হবে।

১২. একাধিক লেখকের নামযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পাণ্ডুলিপির সঙ্গে পৃথক পৃষ্ঠায় বাংলা ও ইংরেজিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজনী হিসেবে জমা দিতে হবে:

(ক) প্রবন্ধের শিরোনাম, (খ) সারসংক্ষেপ, (গ) চাবি শব্দ, (ঘ) সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

কাউন্সিল : ২০২৪ ও ২০২৫

সভাপতি	:	অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক হাফিজা খাতুন অধ্যাপক সাজাহান মিয়া অধ্যাপক ইয়ারুল কবির
কোষাধ্যক্ষ	:	ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
সম্পাদক	:	অধ্যাপক মো. আবদুর রহিম
সদস্য	:	অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (ফেলো) ব্যরিস্টার শফিক আহমেদ (ফেলো) অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন অধ্যাপক মোঃ লুৎফর রহমান অধ্যাপক সাদেকা হালিম অধ্যাপক আশা ইসলাম নাঈম অধ্যাপক আবদুল বাছির অধ্যাপক নাজমা খান মজলিশ অধ্যাপক মো. আবদুল করিম অধ্যাপক শুচিতা শরমিন অধ্যাপক সাব্বীর আহমেদ

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.001

বাংলার মোগল মসজিদ স্থাপত্যের ছাদ নির্মাণরীতি ও কৌশল : একটি সমীক্ষা

এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম*

সারসংক্ষেপ

১৫৭৬-১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ মোগল বংশীয় শাসনামলে বাংলার বিভিন্ন রাজধানী শহর রাজমহল, ঢাকা এমনকি মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাসনিক অঞ্চলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে অসংখ্য ধর্মীয় ও লৌকিক ইমারত নির্মিত হয়েছে। এসব পুরাকীর্তি মূলত দুটি প্রাচীন নির্মাণরীতির – একটি দেশজ প্রাক-মোগল সুলতানি স্থাপত্যরীতি এবং অপরটি উত্তর ভারতীয় মুসলিম নির্মাণশৈলী সংশ্লেষণের ফসল। সংখ্যার বিচারে এসব ধর্মীয় ইমারতের এক বিরাট অংশই হলো মসজিদ, যে মসজিদ স্থাপত্য সর্বতোভাবে মুসলিম শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। বাংলার মোগল মসজিদসমূহ যথাযথ স্থাপত্যিক অবয়ব ও দ্বিপ্তিময় অলংকরণ বিশেষত্বে গঠিত। এ যুগের মসজিদ স্থাপত্য ভূমি নকশা অনুযায়ী তিনটি ধারায় – বর্গাকার, আয়তাকার ও বারান্দাযুক্ত – বিকশিত। কিন্তু আচ্ছাদন প্রকৃতির দিক থেকে বাংলার সুলতানি মসজিদের চিরাচরিত উল্টানো *চাঁড়ি* সদৃশ গম্বুজ ও দেশজ *চৌচালা* ছাদের পরিবর্তে মোগল বাংলার মসজিদসমূহে সর্বক্ষেত্রে কন্দাকৃতির গম্বুজ এবং ক্ষেত্র বিশেষে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ, সমতল ছাদ, নলাকৃতির খিলানছাদ ও *চৌচালা* খিলানছাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আর ছাদ নির্মাণ কৌশল হিসেবে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ, ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ ও স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মাঠ জরিপ ও লিখিত উৎস পর্যালোচনাপূর্বক রচিত আলোচ্য প্রবন্ধ মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ছাদ নির্মাণরীতি ও কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

চাবি শব্দ: বাংলা, মোগল, মসজিদ স্থাপত্য, *চৌচালা*, নির্মাণ রীতি।

ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল বংশানুক্রমিক শাসনের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ জহিরউদ্দীন মুহাম্মদ বাবরের উত্তরাধিকারী পুত্র সম্রাট নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ হুমায়ূন প্রথম বাংলা বিজেতা (১৫৩৮) হিসেবে কৃতিত্বপূর্ণ গৌরবের অধিকারী হলেও মূলত ১৫৭৬ সাল বাংলার ইতিহাসে একটি যুগ পরিবর্তনকারী কাল।[১] উল্লিখিত সালে সম্রাট আকবরের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষ মুনিম খান কর্তৃক রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানীর পরাজয়ের মধ্যদিয়ে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে মোগলদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিল মূলত সুবাদার মানসিংহের (১৫৯৪-১৬০৬) পথ ধরে ইসলাম খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে (১৬০৮-১৬১৩)। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মোগলদের মাধ্যমে বহির্ভারতীয় ইউরো-আফ্রো-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে বাংলা প্রদেশের পরিচিতির

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পাশাপাশি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ন্যায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ করে স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে দৈশিক ও বৈশ্বিক নির্মাণরীতির মিশ্রণে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটে। বলা যায়, কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনের পাশাপাশি নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজনের মধ্য দিয়ে সুলতানি বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে যে ধারার উন্মেষ ঘটেছিল তা মোগল আমলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং এক নতুন রীতির স্থাপত্যধারার উদ্ভব হয়। প্রসঙ্গত বগুড়া জেলার খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২) ও পাবনার চাটমোহর মসজিদের (১৫৮১-৮২) নামোল্লেখ করা যায়।[২] মসজিদ দুটিতে বাংলার সুলতানি স্থাপত্যের অনেক বৈশিষ্ট্য যেমন– উল্টানো *চাঁড়ি* সদৃশ গম্বুজ, অবস্থান্তর পর্যায়ে পান্দানতিফের ব্যবহার, বক্রাকার কার্নিশ পর্যন্ত উত্থিত কোণস্থিত বুরুজ, কৌণিক খিলানের প্রয়োগ, অবতল মিহরাব *কুলঙ্গি*, পোড়ামাটির অলংকরণ প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। তবে উভয় মসজিদের এক কক্ষবিশিষ্ট নামাজঘর তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে'-বর্গ আবার একটি করে গম্বুজে আচ্ছাদিত, যা বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছে।

উত্তর ভারতীয় মুসলিম নির্মাণ ঐতিহ্যের এ জনপ্রিয় রীতি (তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ) পরবর্তীকালে পরিমার্জিত আকারে সমগ্র মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হতে থাকে। অর্থ্যাৎ বিবর্তনের মাধ্যমে এ বিশেষ রীতির মসজিদ নির্মাণধারা পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং আদর্শরূপে গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উত্তর ভারতে সম্রাট আকবরের লাল বেলে পাথর স্থাপত্য থেকে সম্রাট শাহজাহানের সাদা মর্মর প্রস্তর স্থাপত্যে রূপান্তর প্রক্রিয়ার ন্যায় বাংলাতেও প্রাক-মোগল সুলতানি স্থাপত্য ঐতিহ্য বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমেই উন্নত মোগল নির্মাণধারায় রূপান্তরিত হয়। তাই বলা যায় যে, বাংলার মোগল মসজিদ স্থাপত্য দুটি প্রাচীন নির্মাণরীতির সংমিশ্রণের ফসল – একটি দৈশিক প্রভাবপুষ্ট সুলতানি স্থাপত্যধারা এবং অপরটি উত্তর ভারতীয় মুসলিম রীতি বিশেষ করে রাজধানী শহর দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রি ও লাহোরে বিকশিত ঐতিহ্যবাহী মোগল নির্মাণশৈলী। তবে সংগত কারণে বর্ণিত দুটি ধারার মধ্যে পরবর্তী রীতির প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। কেননা মোগল বাংলার সুবাদার ও নবাব সকলেই উত্তর ভারতীয় মোগল শাসকদের অধীন প্রতিনিধি-কর্মচারী হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন এবং এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তাদের আত্মীয়-পরিজন। উল্লেখ্য যে, দিল্লির সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত বাংলার সুবাদার কিংবা নবাবদের মধ্যে কমবেশি সকলেই স্থাপত্যশিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কোনো কোনো সুবাদার-নবাব বিশেষ করে সুবাদার শাহ সুজা (১৬৩৯-৫৮), শায়েস্তা খান (১৬৬৩-৭৮ ও ১৬৭৯-৮৮) এবং নবাব মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-২৭) খ্যাতনামা নির্মাতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। এসব প্রশাসকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার বিভিন্ন রাজধানী শহর যেমন– রাজমহল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ নগরাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য ধর্মীয় ও লৌকিক ইমারত নির্মিত হয়েছে, যার কিছু কিছু উদাহরণ অদ্যাবধি টিকে রয়েছে। এসব পৃষ্ঠপোষক-নির্মাতার নিকট দেশীয় সংস্কৃতি পরিপুষ্ট সুলতানি

বাংলার স্থাপত্যরীতি ততটা চিত্তাকর্ষক ছিল বলে মনে হয় না। আর এ কারণেই মূলত দিল্লির রাজকীয় নির্মাণশৈলীর অনুকরণে এ দেশে ক্রমান্বয়ে এক নতুন স্থাপত্যধারার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। প্রসঙ্গত বাংলার উন্নত মোগল রীতির মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ সর্বদা সরু বুরুজ বেষ্টিত উদগ্রভাবে (prominent) নির্মিত, যা পারসিক প্রভাবান্বিত উত্তর ভারতীয় ইওয়ান-ই-প্রবেশপথের প্রাদেশিক সংস্করণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। তাছাড়া সংকীর্ণ গ্রীবা সংবলিত কন্দাকৃতির গম্বুজ, চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান, কার্নিশ থেকে ওপরে উত্থিত কোণস্থিত বুরুজ, গোলায়িত পান্দানতিফ, শীর্ষদণ্ড ও ছত্রীর ব্যবহার, মুকার্নাস কারুকার্য, মার্লনযুক্ত সমান্তরাল বপ্র, অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির মিহরাব, পলেস্তারায় রচিত স্বল্প গভীর আয়তাকৃতির প্যানেল সজ্জা, বদ্ধ পত্র নকশা (*কানজুরা*) প্রভৃতি নতুন ধারায় নির্মিত এসব মোগল মসজিদের এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। সর্বোপরি ছাদ নির্মাণরীতি ও কৌশলের দিক থেকে মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্য সুলতানি মসজিদের চিরাচরিত *চাঁড়ি* সদৃশ গম্বুজ ও দেশীয় *চৌচালা* খিলানছাদে আচ্ছাদন প্রক্রিয়ায় বিশেষ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে।

মধ্যযুগীয় বাংলায় ভূমি নকশা মূলত বর্গাকার, আয়তাকার ও বারান্দাযুক্ত মসজিদ স্থাপত্যের তিনটি ধারায় বিকশিত হয়েছে। আয়তাকার পরিকল্পনায় মসজিদ নির্মাণরীতির অসংখ্য উদাহরণ বাংলাসহ উত্তর ভারত তথা বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে বিদ্যমান। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ (১৩৭০), গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদ (১৪৭৯) ও ছোটসোনা মসজিদ (১৪৯১-১৫১৯), দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ (১১৯৫) ও আড়াই দিনকা ঝোপড়া মসজিদ (১১৯৯), বহির্ভারতীয় দামেস্ক জামি মসজিদ (৭০৫-১৫), বাগদাদ জামি মসজিদ (৭৬২), সামাররা মসজিদ (৮৪৭), কায়রোর আল-হাকিমের মসজিদ (৯৯০-১০১৩) প্রভৃতি এ রীতির অনন্য উদাহরণ। উল্লেখ্য যে, মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে দামেস্ক জামি এক কক্ষবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদের প্রাচীনতম উদাহরণ, যেটি দেবমন্দির (Temenos) ও অভ্যন্তরীণ গির্জার ভূমি নকশা দ্বারা প্রভাবিত বলেই অনুমিত হয়। আর বাংলাসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সর্বযুগে সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট ছত্রী রীতির মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এ ধরনের মসজিদের অন্যতম উদাহরণ হলো খান জাহানের সমাধি সংলগ্ন মসজিদ (১৪৫৯), পনেরো শতকে নির্মিত রনবিজয়পুর মসজিদ ও সিংড়া মসজিদ, বিবির মসজিদ (১৬২৮), এগারসিন্ধুর সাদীর মসজিদ (১৬৫২), আল্লাকুরী মসজিদ (১৬৮০) প্রভৃতি। বলাবাহুল্য বর্গাকার পরিকল্পনায় মসজিদ নির্মাণরীতির উৎস মুসলিম শিল্পকলার ইতিহাসে সমাধি স্থাপত্যের মধ্যে নিহিত। বাংলার স্থাপত্যে একলাখী সমাধি (১৪১৮-৩৩) ও বাগেরহাটের খান জাহানের সমাধি (১৪৫৯) একই শৈলীর দুটি বিদ্যমান নিদর্শন।[৩] বাংলার বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট এরূপ সমাধি সৌধ নির্মাণের ধারণা উত্তর ভারতীয় (ইলতুৎমিশের সমাধি) কিংবা তারও পূর্বে আব্বাসীয় আমলে নির্মিত (বোখারার ইসমাইল সামানীদের সমাধি ও হাযারা মসজিদ) অনুরূপ উদাহরণ থেকে গৃহীত হয়ে থাকতে পারে। আবার ভারতীয় তথা মুসলিম স্থাপত্যে এক

গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতির ইমারত নির্মাণের এ রীতি সম্ভবত সাসানীয় অগ্নিমন্দির *চাহারতাক*-এর ভূমি পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলীর মধ্যেই প্রোথিত বলে ধারণা করা যায় এবং খ্রিষ্টীয় দুই শতকে নির্মিত নাইসার ও ফিরূজাবাদের ভগ্নমন্দির দুটি সাসানীয় অগ্নিমন্দিরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৪] তাছাড়া বাংলার স্থাপত্যে বারান্দাযুক্ত এক ও ততোধিক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের বেশ কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত পনেরো শতকে নির্মিত দিনাজপুর জেলার গোপালগঞ্জ মসজিদ ও সুরা মসজিদ, গৌড়ের লট্টন মসজিদ ও খানিয়াদীঘি মসজিদ, বারোবাজারের গোড়ার মসজিদ ও সিংদহ আউলিয়া মসজিদ এবং পটুয়াখালীর মসজিদবাড়ি মসজিদ প্রভৃতি এ রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একইভাবে বহু গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদের সম্মুখেও বারান্দা সংযোজনের প্রমাণ মিলে, যার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হলো গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদ ও বড়সোনা মসজিদ। বারান্দাযুক্ত এক ও ততোধিক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের এ ধারা পরবর্তীতে মোগল আমলে অনুসৃত হয়েছে। যেমন– টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ (১৬০৯) ও রংপুর জেলার ভাঙনী মসজিদ (আঠারো শতক)। এসব মসজিদের সম্মুখে বারান্দার সংযোজন গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুঁড়েঘর কিংবা মাটির ঘরবাড়ির সামনে সংযুক্ত বারান্দার হুবহু অনুকৃতি বলেই প্রতীয়মান।[৫] কেননা এতদঞ্চলের দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষ আর্থিক সংগতি না থাকায় এ ধরনের বারান্দা সংবলিত খড়ের ছাউনিযুক্ত কুঁড়েঘর নির্মাণ করে বসবাস করত এবং দেশীয় বারান্দাযুক্ত কুঁড়েঘরের অনুকরণে এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি রচনায় বাংলার কারিগরদের যে প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বারান্দাযুক্ত এক ও ততোধিক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের এ বাংলা-রীতি পরবর্তীকালে উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যে দিল্লি জামি ও লাহোরের বাদশাহী মসজিদে অনুসৃত হতে দেখা যায়। এই উভয় মসজিদের নামাজঘরের সম্মুখে এগারো খিলানবিশিষ্ট একটি করে টানা বারান্দা সংযুক্ত রয়েছে।[৬]

ছাদ নির্মাণরীতি ও কৌশলের ওপর ভিত্তি করে মূলত মোগল বাংলার বর্গাকার মসজিদকে দুটি শ্রেণিতে যথা– এক গম্বুজ ও নয় গম্বুজ; আয়তাকার মসজিদকে চারটি ভাগে যেমন– তিন গম্বুজ, পাঁচ গম্বুজ, ছয় গম্বুজ ও দশ গম্বুজ; বারান্দাযুক্ত মসজিদকে একাধিক ভাগে– এক ও তিন গম্বুজ এবং বিবিধ রীতির মসজিদকে পাঁচটি ভাগে যথাক্রমে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ বিশিষ্ট, *চৌচালা* খিলানছাদ সংবলিত, সমতল ছাদ বিশিষ্ট, বাংলা রীতি ও নলাকৃতির খিলানছাদ বিশিষ্ট মসজিদ প্রভৃতি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ভূমি নকশা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিশেষ উল্লেখপূর্বক বাংলার মোগল মসজিদ স্থাপত্যের ছাদ নির্মাণরীতি ও কৌশল সম্পর্কিত একটি বৈশ্লেষিক সমীক্ষণ তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যা মোগল বাংলার গৌরবোজ্জ্বল স্থাপত্যিক ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। তবে রীতিভিত্তিক মোগল মসজিদের আচ্ছাদন প্রকৃতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে নির্মাণ তারিখের কালানুক্রম রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

১ বর্গাকার মসজিদ

১.১ বর্গাকৃতির এক গম্বুজ মসজিদ

বিবির মসজিদ (ভূমি নকশা-১): ১০৩৮ হিজরি মোতাবেক ১৬২৮ সালে সৈয়দ আলী মোতওয়ালী কর্তৃক নির্মিত আলোচ্য মসজিদটি বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার খেরুয়া মসজিদ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।[৭] এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতির পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের প্রতিবাহুর পরিমিতি ৪.৫৭ মিটার। মসজিদের সমগ্র বহির্গাত্র পলেস্তারায় আচ্ছাদিত এবং প্রতি কোণে রয়েছে একটি করে কোণস্থিত বুরুজ, যেগুলো বর্তমানে বিলুপ্ত। একদা অবস্থান্তর পর্যায়ে ইটের তৈরি কর্বেল পান্দানতিফ সহযোগে তৈরি বিশাল আকৃতির গম্বুজ দ্বারা মসজিদটি আচ্ছাদিত ছিল। বক্রাকার কার্নিশযুক্ত আলোচ্য মসজিদের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে তিনটি আক্ষিক প্রবেশপথ বিদ্যমান এবং কিবলা দেয়ালের তিনটি মিহরাব *কুলঙ্গি* বর্তমানে নতুন করে নির্মিত। আলোচ্য মসজিদের কার্নিশ সুলতানি বাংলার ঐতিহ্যবাহী রীতি বক্রাকারে রচিত এবং এটি মোগল বাংলার ইতিহাসে নতুন রীতির সূচনাকারী ইমারত হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। একই ধারায় নির্মিত মোগল বাংলার বর্গাকৃতির এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের অন্যান্য উদাহরণ হলো এগারসিন্ধুর সাদীর মসজিদ (১৬৫২) (আলোকচিত্র-১), গাজীপুরের সুলতানপুর মসজিদ (সতেরো শতক), ঢাকার হায়াত বেপারী মসজিদ (১৬৪৪), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদুগড় মসজিদ (১৬৭৩), কিশোরগঞ্জের হরশী মসজিদ (১৬৭৫-৭৬), ঢাকার আল্লাকুরী মসজিদ (১৬৮০), কিশোরগঞ্জের গোরাই মসজিদ (আনু. ১৬৮০) ও শাহ মোহাম্মদ মসজিদ (সতেরো শতক), বাগেরহাটের চাকশ্রী মসজিদ (সতেরো শতক) ও চকরী মসজিদ (সতেরো শতক), সতেরো শতকে নির্মিত বরিশালের বাগমারা মসজিদ ও উত্তর-বাউরগাতী মসজিদ, নারায়গঞ্জের মোগরাপাড়া মসজিদ (১৭০০-০১), গোয়ালদি মসজিদ (১৭০৪) ও গরিবুল্লাহ মসজিদ (আঠারো শতক), বগুড়া জেলার ফররুখ শিয়ার মসজিদ (১৭১৮), আঠারো শতকে নির্মিত রাজশাহী রৈপাড়া মসজিদ, চুনারিপাড়া মসজিদ, সিরাজগঞ্জের বেরিপোটাল মসজিদ প্রভৃতি। এ সকল মসজিদ মূলত এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার পরিকিল্পনায় নির্মিত। প্রতিটি মসজিদের গম্বুজ অষ্টভুজাকৃতির কিংবা গোলায়িত অনুচ্চ পিপার ওপর সংস্থাপিত হলেও উপর্যুক্ত মসজিদসমূহের গম্বুজ নির্মাণ কৌশলের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। অর্থাৎ উল্লিখিত উদাহরণের প্রায় সকল মসজিদের গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে ইটের তৈরি কর্বেল পান্দানতিফ পদ্ধতির প্রয়োগ দৃশ্যমান। তবে হায়াত ব্যাপারী মসজিদ, শাহ মোহাম্মদ মসজিদ, চাকশ্রী মসজিদ, চকরী মসজিদ, গরিবুল্লাহ মসজিদ, আল্লাকুরী মসজিদ ও বেরিপোটাল মসজিদের ছাদের ভার বহনে অবস্থান্তর প্রবৃত্তিতে সুলতানি রীতির অর্ধ-গম্বুজাকৃতির স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর ভাদুগড় মসজিদ ও গোয়ালদি মসজিদের গম্বুজ নির্মাণে একই সাথে অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির স্কুইঞ্চ খিলান ও পান্দানতিফ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। সর্বোপরি মোগরাপাড়া মসজিদ এক গম্বুজবিশিষ্ট হলেও আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত (৭.৭৭ × ৫.৩৩ মিটার) বিধায় ছাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করা

হয়েছে। মসজিদটি আচ্ছাদনের ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়াল শীর্ষে দুটি অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ (half-domed vault) নির্মাণপূর্বক আয়তাকার কক্ষকে প্রথমে বর্গাকারে রূপান্তর করে তদুপরি চার কোণে পান্দানতিফ সহযোগে ভরাটপূর্বক একটি করে গম্বুজ স্থাপন করা হয়েছে। বাংলার স্থাপত্যে এক গম্বুজবিশিষ্ট ছত্রী রীতির মসজিদের ছাদ নির্মাণে উল্লিখিত পদ্ধতি এক বিরল দৃষ্টান্ত।

মধ্যযুগীয় বাংলায় সুলতানি আমলে সর্বপ্রথম এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতির মসজিদ নির্মাণের নজির পাওয়া যায় এবং ঢাকার বিনত বিবি মসজিদ (১৪৫৭) এ রীতির প্রাচীনতম বিদ্যমান উদাহরণ।[৮] আর একলাখী সমাধি নির্মাণের (১৪৩৩) মধ্যদিয়ে বাংলার স্থাপত্যে এরূপ এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত নির্মাণধারার সূত্রপাত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। আলোচ্য সমাধি মধ্যযুগীয় বাংলায় এক নতুন রীতির সূচনাকারী ইমারত হিসেবে পরিগণিত, যার মাধ্যমে সমগ্র সুলতানি আমলে এমনকি তৎপরবর্তী সময়ে অত্র এলাকায় এক স্বতন্ত্র রীতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে উল্লিখিত সমাধিকে ভিত্তি ধরে ঢাকার মসজিদের অনুকরণে সুলতানি বাংলায় অসংখ্য বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এ রীতির অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে বাগেরহাটের খান জাহানের সমাধি সংলগ্ন মসজিদ (১৪৫৯), পনেরো শতকে নির্মিত রনবিজয়পুর মসজিদ ও চুনাখোলা মসজিদ, হোসেনশাহী আমলে নির্মিত বারোবাজারের জোড়বাংলা মসজিদ, নূনগোলা মসজিদ, পাঠাগার মসজিদ ও চেরাগদানী মসজিদ, দিনাজপুরের রুকনখান মসজিদ (১৫১২), সোনারগাঁওয়ের গোয়ালদি মসজিদ (১৫১৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সুলতানি বাংলার এক গম্বুজ মসজিদের অনুকরণে পরবর্তীতে মোগল আমলে এক গম্বুজবিশিষ্ট অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হতে দেখা যায়, উল্লিখিত মসজিদসমূহ তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে গঠন বৈশিষ্ট্যের বিচারে এসব মোগল মসজিদ সুলতানি উদাহরণ থেকে অনেকাংশেই ভিন্নতর। এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার পরিকল্পনায় গঠিত ঢাকার আল্লাকুরী মসজিদের (১৬৮০) নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আলংকারিক সরু বুরুজ বেষ্টিত চার আক্ষিক প্রক্ষিপ্ত অংশের কারণে আলোচ্য মসজিদ সুলতানি বাংলার এক গম্বুজ মসজিদ থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। বাংলার এক গম্বুজ বর্গাকার ইমারত নির্মাণের ধারণা উত্তর ভারত তথা পারসিক স্থাপত্যের (সামানীয় সমাধি) মধ্যে প্রোথিত হলেও মূলত প্রাক-মুসলিম সাসানীয় অগ্নিমন্দির *চাহারতাক* নির্মাণের মধ্য দিয়ে এর বীজ রোপিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, বাংলার এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত ও সামানীয় সমাধির ভূমি নকশা ও গঠনশৈলী অভিরূপ (উভয় গম্বুজাবৃত বর্গাকার) হলেও তারা দুটি ভিন্ন সভ্যতার প্রতিনিধিত্বকারী ইমারত। মধ্য-এশিয়ার ইমারতে (সামানীয় সমাধি) ঊর্ধ্বাভিমুখী ক্রমহ্রাসমানতা, দেয়ালগাত্রের বিজড়িত ইষ্টক নকশা এবং চারটি আক্ষিক প্রবেশপথ বিদ্যমান। অপরদিকে বাংলার ইমারতে ইটের প্রশস্ত দেয়াল নির্মাণের ফলে বিশালত্বের ছাপ প্রস্ফুটিত এবং পোড়ামাটির ফলক নকশা নান্দনিকতার বিচারে অতুলনীয়। তাছাড়া বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনা, অবনমন দেয়ালগাত্র, আক্ষিক প্রবেশদ্বার ও স্কুইঞ্চ খিলান সহযোগে গম্বুজ নির্মাণ প্রভৃতি প্রাক-ইসলামি সাসানীয় নির্মাণরীতি বোখারার সমাধিতে

যথাযথভাবে প্রতিভাত হলেও আলোচ্য সৌধটি অধিক পরিমার্জিত ও পরিশীলিত এবং মুসলিম বিশ্বের একক ও অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে।

১.২ বর্গাকৃতির নয় গম্বুজ মসজিদ

লালদীঘি মসজিদ (ভূমি নকশা-২; আলোকচিত্র-২): পলেস্তারার আস্তরণে আবৃত ইটের তৈরি আলোচ্য মসজিদ গঠনশৈলী বিবেচনায় আঠারো শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়।[৯] বর্গাকৃতির নয় গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের প্রতিবাহুর বহিস্থ পরিমাপ ৯.৫৪ মিটার এবং এর অভ্যন্তরভাগ দু-সারি স্তম্ভ দ্বারা নয়টি বর্গাকৃতির (১.৭১ মিটার) ইউনিটে বিভক্ত। প্রতিটি 'বে'-বর্গ একটি করে গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং গম্বুজগুলো আবার অষ্টভুজি পিপার ওপর সংস্থাপিত। পিপার ভার বহনে অবস্থান্তর পর্যায়ে বাঙালি পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে রয়েছে পাঁচটি অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির মিহরাব। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও মিহরাব তুলনামূলকভাবে বড় এবং উদ্‌গত পরিকল্পনায় রচিত। এর চারকোণায় রয়েছে চারটি বুরুজ, যেগুলো মসজিদের সমান্তরাল কার্নিশ ছেড়ে ওপরে উত্থিত এবং নিরেট কিউপোলায় সমাপ্ত। উল্লেখ্য যে, বর্গাকার নয় গম্বুজবিশিষ্ট আলোচ্য মসজিদ সমগ্র মোগল ভারতের একমাত্র ব্যতিক্রম উদাহরণ। বলাবাহুল্য এরূপ মসজিদ নির্মাণের উৎস কিংবা অনুপ্রেরণা কি? এর প্রতিউত্তরে বলা যায় যে, সুলতানি বাংলার অনুরূপ উদাহরণ দ্বারা মসজিদটির নির্মাণ পরিকল্পনা রচিত হয়ে থাকতে পারে, যা বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের যথার্থ অনুকরণ বলেই অনুমিত হয়। উদাহরণস্বরূপ পনেরো ও ষোলো শতকে নির্মিত বাগেরহাটের নয় গম্বুজ মসজিদ ও মসজিদকুড় মসজিদ, বরিশালের কসবা মসজিদ ও ফরিদপুরের সাতৈর মসজিদের নামোল্লেখ করা যায়। এসব মসজিদের অভ্যন্তরভাগ চারটি স্তম্ভ সহযোগে নয়টি বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে'-বর্গ আবার একটি করে গম্বুজে আচ্ছাদিত। তাছাড়া এর তিন দিকে তিনটি করে প্রবেশপথ এবং পূর্বদিকের প্রবেশপথ বরাবর কিবলা (কেবলা) দেয়ালে তিনটি মিহরাব সন্নিবেশিত। যদিও কসবা মসজিদে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে মাত্র দুটি পার্শ্ব প্রবেশপথ লক্ষণীয়। বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের এরূপ বিন্যাস হয়তো দিল্লির স্থাপত্য থেকে উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে। দিল্লির বিদ্যমান খিড়কী মসজিদের (১৩৭০) নয় গম্বুজ নির্মাণ পরিকল্পনা উল্লিখিত বিষয়ের সমর্থনে উপস্থাপন করা যায়। বর্ণিত মসজিদের ছাদ পঁচিশটি অংশে বিভক্ত – এর মধ্যে চারটি অংশ উন্মুক্ত ও বারোটি ক্ষেত্র সমতল ছাদে এবং অবশিষ্ট নয়টি অংশ নয়টি করে গম্বুজগুচ্ছে আচ্ছাদিত। এরূপ নয় গম্বুজগুচ্ছ প্রতিসমরূপে তিনটি করে সারিতে স্থাপন করা হয় এবং প্রতিটি গম্বুজগুচ্ছ পর্যায়ক্রমে নয়টি সমতল ছাদের সাথে সংস্থাপিত।[১০] প্রসঙ্গত এরূপ নয় গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত নির্মাণধারা খ্রিষ্টীয় নয় শতকের সূচনালগ্ন থেকে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আলোচ্য রীতির প্রতিনিধিত্বকারী প্রাচীনতম উদাহরণ আফগানিস্তানের বলখে নির্মিত মসজিদ-ই-তারিখ (নয় শতক) এবং দাব জুবাইদা কর্তৃক সৌদি আরবের কুরতে খননাবিষ্কৃত অনুরূপ নয় 'বে'-সংবলিত মসজিদের ভিত্তিভূমি উন্মোচিত হয়েছে।[১১] একই ধরনের নির্মাণ ঐতিহ্যের অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে সুসার কথিত বু ফাত্তা মসজিদ (৮৪০) ও কায়রোর শরীফ তাবাতবা মসজিদ (৯৫০)[১২] এবং টলেডোর বাব মর্দুম মসজিদ (৯৯৯) ও ইলদ্রিনের ইস্কি ক্যামি (১৪০৩)[১৩] প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২ আয়তাকার মসজিদ

২.১ তিন গম্বুজ রীতির আয়তাকৃতির মসজিদ

মধ্যযুগীয় বাংলার স্থাপত্যে মোগলদের দ্বারাই তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ নির্মাণের সূচনা ঘটে, যা উত্তর ভারতীয় মসজিদ স্থাপত্যের হুবহু অনুকৃতি বলেই অনুমিত হয়। কিন্তু বাংলার প্রারম্ভিক মোগল উদাহরণসমূহ গঠনশৈলী ও অন্যান্য বিশেষত্বে উত্তর ভারতীয় পুরাকীর্তির সাথে তেমন একটা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল না। এ দেশের বৈরী আবহাওয়া ও নির্মাণকর্মে স্থানীয় কারিগরদের সম্পৃক্ততার কারণে মূলত এরূপ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যাহোক বিবর্তনের মাধ্যমে আলোচ্য তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ পরিপূর্ণতা লাভের পাশাপাশি আদর্শরূপ পরিগ্রহ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে নামাজঘর কেন্দ্রিক এ রীতির মসজিদ নির্মাণ পরিকল্পনা লোদী ও সূরী আমালে প্রথম লক্ষ করা যায়, যার প্রকৃষ্ট উদহারণ হলো দিল্লির বড় গুম্বাদ মসজিদ (১৪৯৪) ও মথ-কী-মসজিদ (১৫০৫) এবং বিহারের রোটাসগড় মসজিদ (১৫৪৩)।[১৪] এরূপ নির্মাণ ঐতিহ্য পারসিক *ইওয়ান-ই-কারখা* রীতির মসজিদের পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত অনুকরণ বলেই অনুমেয়।[১৫] প্রসঙ্গত *ইওয়ান-ই-কারখা*র আচ্ছাদন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় গম্বুজ ও উভয় পার্শ্বস্থিত নলাকৃতির খিলানছাদের সমন্বয়ে গঠিত। দিল্লির সুলতানি স্থাপত্যের এ রীতি পরবর্তীতে মোগলদের বিভিন্ন রাজধানী শহর দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রি ও লাহোরের বিখ্যাত মোগল মসজিদগুলো তিনটি গম্বুজে আচ্ছাদিত। তবে এসব মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজ পার্শ্ববর্তী গম্বুজদ্বয় অপেক্ষা বৃহদাকারে নির্মিত। যাহোক বাংলার এ তিন গম্বুজ রীতির মোগল মসজিদসমূহ আবার দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত যথা– ক) বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ সংবলিত মসজিদ ও খ) সম-আকৃতির তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ। উভয় শ্রেণিভুক্ত মসজিদের অভ্যন্তরভাগ এক আইল বিশিষ্ট এবং পূর্ব-পশ্চিমে দুটি আড়াআড়ি খিলান দ্বারা তিনটি 'বে'-বর্গে বিভক্ত। তবে প্রথম শ্রেণিভুক্ত মসজিদের কেন্দ্রীয় 'বে'-টি অপেক্ষাকৃত বড় ও বর্গাকার হওয়ায় মধ্যবর্তী অংশটি বৃহদাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং পার্শ্ববর্তী 'বে'-সমূহ সর্বদাই আকৃতিতে ছোট ও আয়তাকার পরিসরে রচিত। ফলে উভয় পার্শ্বের গম্বুজ কেন্দ্রীয় গম্বুজ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রাকৃতির। আর দ্বিতীয় শ্রেণির মসজিদের 'বে'-সমূহ সম-আয়তনের বর্গাকার বিধায় এদের ছাদও সম-পরিমাপ বিশিষ্ট তিনটি গম্বুজে আবৃত। নিম্নে বাংলার তিন গম্বুজ রীতির মোগল মসজিদকে দুটি পৃথক শিরোনামে উপস্থাপন করা হলো।

২.১.১ বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ সংবলিত তিন গম্বুজ মসজিদ

ইসলাম খান মসজিদ (ভূমি নকশা-৩): পুরান ঢাকার ইসলামপুর রোডে আলোচ্য মসজিদটি অবস্থিত এবং ১৬৩২-৪০ সালে সুবাদার ইসলাম খান কর্তৃক নির্মিত।[১৬] ইট সহযোগে নির্মিত এ মসজিদের অভ্যন্তরীণ পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১০.০৬ মিটার ও প্রস্থে ৪.১৫ মিটার। এর পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ বিদ্যমান এবং উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে একটি করে খিলানপথ। মসজিদের চারকোণার অষ্টভুজাকৃতির বুরুজগুলো ছাদের ওপরে বর্ধিত এবং এগুলোর শীর্ষভাগে রয়েছে কলস শীর্ষচূড়া শোভিত ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত নিরেট ছত্রী। কিবলা দেয়ালে রয়েছে তিনটি মিহরাব কুলঙ্গি, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাব অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির এবং পার্শ্ববর্তীগুলো অগভীর আয়তাকার। কেন্দ্রীয় মিহরাব ও প্রবেশপথ সম্মুখদিকে প্রক্ষিপ্ত এবং এদের উভয় প্রান্তে রয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির সরু বুরুজ। বুরুজগুলো বপ্রের উপরিভাগ পর্যন্ত প্রলম্বিত এবং এগুলোর শীর্ষে রয়েছে কলস শীর্ষচূড়া শোভিত নিরেট ছত্রী। মসজিদের দেয়াল সংলগ্ন স্তম্ভ থেকে উত্থিত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত দুটি প্রশস্ত আড়াআড়ি খিলান আয়তাকার নামাজঘরকে তিনটি অসম বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত করেছে। কেন্দ্রীয় 'বে'-বর্গটি বর্গাকার (৪.১৫ মিটার) এবং উভয় পার্শ্বের দুটি আয়তাকৃতির (৪.১৫ × ২.১৩ মিটার)। প্রতিটি 'বে'-বর্গের ওপরে আচ্ছাদন হিসেবে অষ্টভুজি পিপার ওপর সংস্থাপিত হয়েছে একটি করে কন্দাকৃতির গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি উভয় পার্শ্বের গম্বুজদ্বয় অপেক্ষা বড়। তবে পার্শ্ববতী আয়তাকার 'বে'-বর্গ আচ্ছাদনে এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে বাংলার স্থাপত্যে অজ্ঞাত হলেও পরবর্তীতে কৌশলটি উপর্যুপরি ব্যবহৃত হতে থাকে। আলোচ্য কৌশল অনুসারে পার্শ্ববর্তী আয়তাকার পরিসরের উপরিভাগে পূর্ব-পশ্চিম দেয়ালে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ প্রতিস্থাপন করে প্রাথমিকভাবে একটি বর্গাকার ক্ষেত্র তৈরিপূর্বক এর চার কোণায় আবার গোলায়িত মোগল পান্দানতিফ সংযোজনের মাধ্যমে সৃষ্ট গোলাকৃতির ক্ষেত্রের উপরিভাগে ক্ষুদ্র গম্বুজটি সংস্থাপন করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও মিহরাবের উপরিস্থ বদ্ধ খিলানসহ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত দুটি প্রশস্ত খিলান এবং ওপরের অংশে চারকোণে সংযুক্ত ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ কেন্দ্রীয় গম্বুজের ভার বহন করছে। অনুরূপভাবে পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে নির্মিত অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ এবং কোণের পান্দানতিফের ওপর পার্শ্ববর্তী গম্বুজদ্বয়ের ভার ন্যস্ত। বাংলার স্থাপত্যে আলোচ্য মসজিদ তিন গম্বুজ রীতির মসজিদের এক নতুর রীতির সূচনাকারী ইমারত হিসেবে চিহ্নিত। সাধারণ তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের তিনটি বর্গাকার 'বে'-এর ওপরে নির্মিত তিনটি সম-আকৃতির গম্বুজের পরিবর্তে আলোচ্য মসজিদে কেন্দ্রীয় গম্বুজ পার্শ্ববর্তী গম্বুজদ্বয় অপেক্ষা বৃহদাকারে তৈরি। একইভাবে গম্বুজগুলোর নিম্নের তিনটি 'বে'-বর্গ অসম আকৃতি সম্পন্ন, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় 'বে'-বর্গটি অপেক্ষাকৃত বড় ও বর্গাকৃতির। সে তুলনায় পার্শ্ববর্তী 'বে'-বর্গ দুটি ছোট এবং আয়তাকৃতির পরিকল্পনায় রচিত। এরপর থেকে পরবর্তীতে বাংলায় তিন গম্বুজ রীতির মোগল মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বৃহদাকারে নির্মিত। তবে পার্শ্ববর্তী গম্বুজগুলো নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে বিভিন্ন সময় নানা কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে।

বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ সংবলিত বাংলার অপরাপর মসজিদের মধ্যে নবরায় লেন মসজিদ (সতেরো শতক), রাজমহলের তথাকথিত আকবরী মসজিদ (সতেরো শতক), সিরসী মসজিদ (সতেরো শতক), রওশন মসজিদ (সতেরো শতক), শাহ সুজা মসজিদ (সতেরো শতক), ওয়ালীপুরের শাহ সুজা মসজিদ (১৬৫৬), মহাজন তলী মসজিদ (সতেরো শতক), শায়েস্তা খান মসজিদ (১৬৬৬), আন্দর কিল্লা মসজিদ (১৬৬৭), খাজা আম্বর মসজিদ (১৬৭৭-৭৮), চক মসজিদ (১৬৭৬), মুসা খান মসজিদ (সতেরো শতক), লালবাগ দুর্গ মসজিদ (১৬৭৮-৭৯), বিবি মরিয়ম মসজিদ (১৬৮০), সাত গম্বুজ মসজিদ (১৬৮০), বাগ-ই-হামজা মসজিদ (১৬৮২), বখসি হামিদ মসজিদ (১৬৯২), পাথরঘাটা মসজিদ (সতেরো শতক), কমলাপুর মসজিদ (সতেরো শতক), শাহ পরাণ দরগাহ মসজিদ (সতেরো শতক), মাহমুদ খান মসজিদ (১৬৮২),আনোয়ার শহীদ মসজিদ (১৬৯৯), পাকুল্লা মসজিদ (সতেরো শতক), মরিয়ম সালেহ মসজিদ (১৭০৬), বড় শরীফ মসজিদ (১৭০৬-০৭), বড় জামালপুর মসজিদ (আঠারো শতক), বায়েজীদ বোস্তামী দরগা মসজিদ (আঠারো শতক), কদম-ই-মোবারক মসজিদ (১৭২৩), বজরা মসজিদ (১৭৪১-৪২), উলচাপাড়া মসজিদ (১৭৩০-৩০), সাইফাল্লাহ মসজিদ (১৭৪৮), খান মুহাম্মদ মির্ধার মসজিদ (১৭০৪-০৫), নয়াবাদ মসজিদ (১৭৮৫), ইমামবারা মসজিদ (১৭৯১), ছেপড়াঝর মসজিদ (১৭৯৫), মাতুবী মসজিদ (১৮১৪-১৫), সীতারা মসজিদ (আঠারো শতক), সীতারা বেগম মসজিদ (১৮১৫), দারোগা আমীরউদ্দীন মসজিদ (উনিশ শতক), কাজী সদরউদ্দীন মসজিদ (আঠারো শতক), মাঝোপাড়া মসজিদ (আঠারো শতক) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত তালিকাভুক্ত মসজিদসমূহ বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজসহ তিনটি গম্বুজে আচ্ছাদিত। প্রতিটি গম্বুজ আবার অষ্টভুজি পিপার ওপর সংস্থাপিত। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় গম্বুজ নির্মাণে ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও উভয় পার্শ্বস্থ গম্বুজদ্বয়ের ভার বহনে অবস্থান্তর ক্ষেত্রে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তবে কতিপয় মসজিদের ছাদ নির্মাণ কৌশলের ক্ষেত্রে কিছুটা বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত চট্টগ্রামের আন্দর কিল্লা মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি সরাসরি গোলায়িত পান্দানতিফের ওপর ন্যস্ত এবং উভয় পার্শ্বের আয়তাকার 'বে'-সমূহ অভ্যন্তরীণভাবে ক্রুশাকৃতির খিলানছাদে আচ্ছাদিত হলেও এর উপরিভাগে ক্ষুদ্রাকৃতির মেকি গম্বুজ সংস্থাপিত। বলাবাহুল্য ছাদ নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে মসজিদটি মোগল বাংলার স্থাপত্যে বিশেষ চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। এ রীতির অন্যান্য উদাহরণ হলো বাগ-ই-হামজা মসজিদ, মাহমুদ খান মসজিদ ও বখসি হামিদ মসজিদ। তাছাড়া তিন গম্বুজবিশিষ্ট বিবি মরিয়ম মসজিদ ব্যতিক্রমী ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এবং এ রীতির এটিই একমাত্র জ্ঞাত উদারহণ। মসজিদটি তিনটি 'বে'-বর্গে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে'-সমূহ বর্গাকারে রচিত। এ পদ্ধতি সফল করতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী 'বে'-বর্গের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়াল তুলনামূলকভাবে পুরু করে নির্মাণ করা হয়েছে। আলোচ্য মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজসহ অপরাপর গম্বুজের ভার বহনে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার লক্ষণীয়। অনুরূপভাবে মুসা খান মসজিদের কেন্দ্রীয়

গম্বুজ অর্ধ-গম্বুজাকৃতির স্কুইঞ্চ খিলান সহযোগে নির্মিত হলেও উভয় পার্শ্বের গম্বুজদ্বয়ের নিম্নাংশে অবস্থান্তর পর্যায়ে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে সীতারা মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজ নির্মাণে ক্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতি এবং উভয় পার্শ্বের গম্বুজদ্বয়ের ভার বহনে স্কুইঞ্চ খিলান ও অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

বাংলার স্থাপত্যে লালবাগ দুর্গ মসজিদ (আলোকচিত্র-৩) তিন গম্বুজ রীতির মোগল আদর্শ নকশার মসজিদের পূর্ণাঙ্গ রূপ হিসেবে পরিগণিত, যার সূচনা ইতঃপূর্বেই সংঘটিত হয়েছে। আর এ রীতির বিকশিত রূপ সতেরো শতকে নির্মিত রাজমহল ও শাহ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর মসজিদদ্বয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। বাংলার তিন গম্বুজবিশিষ্ট মোগল মসজিদ উত্তর ভারতীয় স্থাপত্য ঐতিহ্য বিশেষ করে দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রি ও লাহোরে বিকশিত মোগল স্থাপত্য রীতির প্রাদেশিক সংস্করণ বলা হয়ে থাকে। আবার মালদহ জামি (১৫৯৬) ও রাজমহল মসজিদে (১৫৯৫-৯৬) উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব বর্ধিতরূপে প্রতিভাত হয়েছে। আর মালদহ জামির দেয়ালগাত্রের পলেস্তারার আস্তরণ, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে আলংকারিক সরু বুরুজ বেষ্টিতকরণ, পদ্ম ও কলস শীর্ষদণ্ড, খাটো কন্দাকৃতির গম্বুজ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকভাবে বাংলায় সর্বপ্রথম প্রবর্তনের জন্য সবিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। তাছাড়া লালবাগ দুর্গ মসজিদের সমকালীন কিংবা পরবর্তী সময়ে নির্মিত ঢাকাস্থ মসজিদসমূহ যথাক্রমে খাজা শাহবাজ মসজিদ (১৬৭৯), সাত গম্বুজ মসজিদ (১৬৮০) এবং খান মুহম্মদ মির্ধার মসজিদে (১৭০৪) কিছু কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান। অর্থাৎ বাংলার মোগল মসজিদের পূর্ব ফাসাদে সাধারণত দেয়ালসংযুক্ত দুটি আলংকারিক সরু বুরুজ ব্যবহৃত হলেও খাজা শাহবাজ মসজিদ ও সাতগম্বুজ মসজিদের ফাসাদে চারটি এবং খান মুহম্মদ মির্ধার মসজিদের ফাসাদে ছয়টি আলংকারিক সরু বুরুজের সংযোজন অনেকটাই বৈচিত্র্যময়।[১৭] তবে সাতগম্বুজ মসজিদের (আলোকচিত্র-৪) চারকোণের চারটি ফাঁপা বুরুজ পুরনো ঢাকার হোসেনী দালান (১৬৪২) ও বড় কাটরার (১৬৪৪) অনুরূপ উদাহরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা দিল্লির মথ-কী-মসজিদের (১৫০৫) পশ্চাৎ দেয়ালের উভয় কোণে সংযোজিত দ্বিতলাকৃতির অষ্টভুজি ফাঁপা বুরুজের হুবহু অনুকৃতি বলে ধরে নেয়া যায়।[১৮]

২.১.২ সম-আকৃতির তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ

খেরুয়া ও চাটমোহর মসজিদ (ভূমি নকশা-৪; আলোকচিত্র-৫): প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত ইটের তৈরি পাবনা জেলার চাটমোহর মসজিদ ও বগুড়া জেলার খেরুয়া মসজিদ একই ভূমি নকশা ও গঠনশৈলীতে নির্মিত। প্রথমোক্ত মসজিদ ১৫৮১-৮২ সালে বিদ্রোহী মোগল সামরিক কর্মকর্তা মাসুম খান কাবুলী কর্তৃক নির্মিত।[১৯] ১৮.২৮ × ৮.২২ মিটার বাহ্যিক পরিমাপের আলোচ্য মসজিদের শিলালিপি পর্যালোচনায় জানা যায় যে, মসজিদটির নির্মাতা মাসুম খান কাবুলী সুলতান উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।[২০] অন্যদিকে বগুড়া জেলার খেরুয়া মসজিদ মাসুম

খান কাবুলীর ঘনিষ্ঠ মিত্র ও জহুর আলী খান কাকশালের পুত্র মীর্জা মুরাদ খান কাকশাল কর্তৃক ৯৮৯ হিজরি মোতাবেক ১৫৮২ সালে নির্মিত।[২১] এর বাহ্যিক পরিমাপ ১৭.৬৭ × ৭.৬২ মিটার। উভয় মসজিদের অষ্টভুজাকৃতির কোণস্থিত বুরুজ ছাদের বক্রাকার কার্নিশ বরাবর উত্থিত। এদের সম্মুখ দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে মোট পাঁচটি দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলানপথ রয়েছে। পূর্ব দিকের তিনটি খিলানপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে খাঁজ খিলান সংবলিত তিনটি অর্ধ-বৃত্তাকার মিহরাব কুলঙ্গি বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও মিহরাব অপেক্ষা কিছুটা বড়। দুটি বৃহদাকৃতির খিলান দ্বারা মসজিদের অভ্যন্তরভাগ তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত। প্রতিটি 'বে'-বর্গ আবার একটি করে উল্টানো *চাঁড়ি* সদৃশ গম্বুজে আচ্ছাদিত। অর্থাৎ মসজিদের ছাদ তিনটি সমায়তনের গম্বুজের সমন্বয়ে গঠিত। গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে কর্বেল পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উভয় মসজিদ পোড়ামাটির ফলক নকশায় সজ্জিত এবং অলংকরণ বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপিত গোলাপ ফুল, খাঁজ খিলান, *কানজুরা* নকশা ও বিভিন্ন ধরনের পত্র নকশা মসজিদের সার্বিক সৌন্দর্য বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

সম-আকৃতির তিন গম্বুজ রীতির এ দেশের অপরাপর মোগল মসজিদের মধ্যে বগুড়া জেলার খোন্দকার তোলা মসজিদ (১৬৩২), যশোরের মির্জানগর মসজিদ (সতেরো শতক), গৌড়ের শাহ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ (সতেরো শতক), খাজা শাহবাজ মসজিদ (১৬৭৯), রংপুরের কাজীপাড়া মসজিদ (সতেরো শতক), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আরিফাইল মসজিদ (সতেরো শতক), রংপুরের দরিয়াপুর মসজিদ (১৭১৭-১৮), শাহজালাল দরগা মসজিদ (১৭৪৪), কুষ্টিয়ার ঝাউদিয়া মসজিদ (আঠারো শতক), সিলেটের ফতেহ খানের মসজিদ (১৭২৭), রংপুরের ফুলহার মসজিদ (সতেরো শতক), কামদিয়া মসজিদ (সতেরো শতক), দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদ (১৭৪০-৪১), লালমনিরহাটের নয়ারহাট মসজিদ (১৭৬২-৬৩), রংপুরের কাজীতাড়ী মসজিদ (সতেরো শতক), তংকা মসজিদ (সতেরো শতক), মাস্তা মসজিদ (সতেরো শতক), মিঠাপুকুর মসজিদ (আঠারো শতক), কুড়িগ্রামের বেলদহ মসজিদ (আঠারো শতক), রাজশাহীর বাগদানী মসজিদ (আঠারো শতক), কিসমত মাড়িয়া মসজিদ (আঠারো শতক), তরফ পারিলা মসজিদ (আঠারো শতক), নাটোরের নাবিয়া পাড়া মসজিদ (আঠারো শতক) ও বাউরা মসজিদ (আঠারো শতক) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত মসজিদগুলোর সম-আকৃতির গম্বুজ তিনটি অষ্টভুজাকৃতির কিংবা গোলায়িত পিপার ওপর সংস্থাপিত। আর ছাদ নির্মাণ কৌশল হিসেবে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল মসজিদের অবস্থান্তর পর্যায়ে ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যতিক্রম উদাহরণ হিসেবে শাহজালাল দরগা মসজিদের ছাদ নির্মাণে একই সাথে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদের পাশাপাশি ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, যা শাহজালাল দরগা মসজিদেও অনুসৃত হয়েছে। তবে এ যুগের কোনো কোনো মসজিদের ছাদ

নির্মাণে অবস্থান্তর প্রবৃত্তিতে প্রাক-মোগল সুলতানি স্থাপত্যের ন্যায় বাঙালি পান্দানতিফ পদ্ধতির প্রয়োগের নজির পাওয়া যায়।

বগুড়া জেলার খোন্দকার তোলা মসজিদ ভূমি নকশা, গঠনশৈলী ও অলংকরণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বর্ণিত খেরুয়া ও চাটমোহর মসজিদের প্রতিলিপি হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য। তবে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও মিহরাব উদ্‌গতপূর্বক সরু বুরুজ বেষ্টিতকরণ বিশেষত্বে আলোচ্য মসজিদ পূর্ববর্তী মসজিদদ্বয় থেকে কিছুটা ভিন্নতর।[২২] বলাবাহুল্য বাংলার স্থাপত্যে মালদহ জামি মসজিদে এ রীতি সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়, যা মূলত উত্তর ভারতীয় মোগল নির্মাণ ঐতিহ্যের এক জনপ্রিয় অনুকরণ এবং ফতেপুর-সিক্রি জামি (১৫৭১) ও আগ্রা জামি মসজিদ (১৬৪৮) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া গৌড়ের শাহ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ যথাসম্ভব সম-আকৃতির তিন গম্বুজ রীতির আদর্শিক মোগল মসজিদের প্রাচীনতম বিদ্যমান উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত। গৌড়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত লালবাজার মসজিদ (সতেরো শতক) ও রাজমহল জামি মসজিদ ভূমি নকশা, গঠনশৈলী ও অন্যান্য বিশেষত্বে শাহ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর মসজিদের অনুলিপি এবং গৌড়স্থ মসজিদে মোগল বাংলার স্থাপত্যের উন্নত রীতির প্রতিনিধিত্বকারী প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা মোগলদের রাজধানী শহর ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের স্থাপত্য-নিদর্শনে বিশেষভাবে দৃশ্যমান। আর খাজা শাহবাজ মসজিদের দেয়ালগাত্রে প্রোথিত যুগল স্তম্ভ শীর্ষ থেকে উত্থিত দুটি বৃহদাকৃতির বহু খাঁজ খিলান দ্বারা মসজিদ অভ্যন্তর তিনটি সম-বর্গাকার অংশে বিভক্তকরণ রীতি আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরস্থ সম্রাট শাহজাহানের খাস মহল এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব নির্মিত দিল্লি দুর্গের মতি মসজিদের (১৬৬২) যথার্থই অনুকরণ বলে ধরে নেয়া যায়।[২৩] এছাড়া রংপুরের কাজীপাড়া মসজিদের অন্যতম বিশেষত্ব হলো পোড়ামাটির অলংকরণ এবং অলংকরণ বিষয়বস্তু হিসেবে গোলাপ ফুল, পুষ্পশোভিত লতাপাতা নকশা ও বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক নকশা উপস্থাপিত হয়েছে, যা সুলতানি বাংলার স্থাপত্যের প্রথাগত বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া নয়ারহাট মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাব শীর্ষে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদের অভ্যন্তরে সুদৃশ্য মুকার্নাস সজ্জা একটি আকর্ষণীয় বিশেষত্ব, যা সতেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে ঢাকা ও রাজমহলে নির্মিত পুরাকীর্তিসমূহের অনুরূপ উদাহরণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।[২৪] এতদ্ভিন্ন বগুড়ার খেরুয়া ও চাটমোহর মসজিদ মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি ইমারত, যাদের মাধ্যমেই মধ্যযুগীয় বাংলার স্থাপত্যে তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণরীতির সূচনা হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মসজিদের পৃষ্ঠপোষক ও নির্মাতা মাসুম খান কাবুলী সম্ভবত বিহারের তিন গম্বুজবিশিষ্ট উল্লিখিত মসজিদগুলো সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন। কেননা তিনি বাংলায় আগমনের পূর্বে সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫) মোগল সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে বিহারে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।[২৫] আর মির্জা মুরাদ খান কাকশাল মাসুম খান কাবুলীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ

সহযোগী হিসেবে নেতার পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আলোচ্য মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলেই অনুমিত হয়।

২.২ পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকৃতির মসজিদ

টেঙ্গা মসজিদ (ভূমি নকশা-৫): মসজিদটি সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের টেঙ্গা গ্রামে অবস্থিত। আয়তাকৃতি পরিকল্পনায় নির্মিত আলোচ্য মসজিদের বহিস্থ পরিমাপ ৪১.১৫ × ১০.৬৭ মিটার এবং অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ৩৬.৮৮ × ৬.৪০ মিটার। মসজিদের নামাজঘর এক আইল বিশিষ্ট এবং পাঁচটি স্বতন্ত্র বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় বে-বর্গটি বৃহদাকৃতির (৬.৫২ মিটার) হলেও উভয় পার্শ্বের 'বে'-বর্গসমূহ তুলনামূলক ক্ষুদ্রাকৃতির (৫.৭৩ মিটার)। প্রতিটি 'বে'-বর্গ আবার একটি করে কন্দাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় গম্বুজ বৃহদাকৃতির এবং উভয় পার্শ্বের দুটি করে মোট চারটি গম্বুজ অপেক্ষাকৃত ছোট। প্রতিটি গম্বুজ অষ্টভুজি পিপার ওপর সংস্থাপিত এবং গম্বুজ শীর্ষে পদ্ম ও কলস শিরোচূড়া মণ্ডিত। গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির স্কুইঞ্চ খিলান ও বাঙালি পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর চার কোণায় রয়েছে চারটি অষ্টভুজাকৃতির কোণস্থিত বুরুজ, যেগুলো সমান্তরাল কার্নিশ থেকে ওপরে উত্থিত এবং শীর্ষদণ্ডযুক্ত কিউপোলায় শোভিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ সম্মুখদিকে উদগত পরিকল্পনায় নির্মিত। নির্মাণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় মসজিদটি মোগল যুগের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তি। কিন্তু এর প্রকৃত নির্মাতা কে ছিলেন তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। ১৬১২ সালে রাজা মানসিংহ এক যুদ্ধে রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে অত্র এলাকায় স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আলোচ্য মসজিদ তারই নির্মাণকীর্তি বলে ধরে নেয়া যায়।[২৬] মসজিদটি বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ এবং মোগলদের তিন গম্বুজ মসজিদের বর্ধিতায়ন কিংবা সম্প্রসারণ হিসেবে বাংলার স্থাপত্যে এরূপ পাঁচ গম্বুজ রীতির মসজিদের উদ্ভব হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

করতলব খান মসজিদ (আলোকচিত্র-৬): ঢাকার বেগম বাজার সংলগ্ন আলোচ্য মসজিদ *দীউয়ান* মুর্শিদকুলী খান ওরফে করতলব খান কর্তৃক ১৭০০-০৪ সালে নির্মিত।[২৭] মসজিদটি বেগম বাজার মসজিদ নামেও পরিচিত। আয়তাকার পরিকল্পনায় রচিত এ মসজিদ নিম্নতল কক্ষ সংবলিত উঁচু মঞ্চস্থি মসজিদের শ্রেণিভুক্ত, যা মোগল বাংলার অসংখ্য উদাহরণের অনুলিপি হিসেবে স্বীকৃত। ২৮.৬৫ × ৮.২৩ মিটার আয়তন বিশিষ্ট মসজিদটির অভ্যন্তরভাগে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত চারটি চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান দ্বারা পাঁচটি 'বে'-তে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় 'বে'-টি বর্গাকার এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য আয়তাকার 'বে'-গুলো থেকে অপেক্ষাকৃত বড়। তবে ভূমি পরিকল্পনা ও আচ্ছাদন প্রকৃতির দিক থেকে আলোচ্য মসজিদ ওপরে বর্ণিত পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট টেঙ্গা মসজিদের অনুকৃতি হিসেবে ধরে নেয়া যায়। অর্থাৎ মসজিদের কেন্দ্রীয়

'বে'-বর্গ বৃহদাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং উভয় পার্শ্বের প্রতিটি আয়তাকার 'বে'-বর্গ অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজে আবৃত। গম্বুজগুলো আবার অষ্টভুজি পিপার ওপর সংস্থাপিত এবং পদ্ম ও কলস চূড়ায় শোভিত, যা মোগল স্থাপত্যের অন্যতম নির্মাণ ঐতিহ্য। গম্বুজের ভার বহনে ব্যবহৃত পদ্ধতি ঢাকার লালবাগ দুর্গ মসজিদ (১৬৭৮-৭৯) ও সাত গম্বুজ মসজিদে (১৬৮০) প্রয়োগকৃত কৌশলের অনুরূপ। অর্থাৎ মধ্যবর্তী বর্গাকার 'বে' সংশ্লিষ্ট বৃহদাকৃতির গম্বুজ সরাসরি ত্রিকোণাকার পান্দানতিফের ওপর ন্যস্ত। কিন্তু পার্শ্ববর্তী আয়তাকৃতির 'বে' শীর্ষে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ নির্মাণপূর্বক বর্গাকার পরিসরে রূপান্তর করা হয়েছে। এরূপ বর্গাকার ক্ষেত্রের চার কোণায় আবার পান্দানতিফ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গোলাকার কাঠামো তৈরিপূর্বক ছোট ছোট গম্বুজে আচ্ছাদিত করা হয়েছে। মসজিদের চার কোণে সংযোজিত চারটি অষ্টভুজাকৃতির কলসভিত্তি শোভিত কোণস্থিত বুরুজগুলো আনুভূমিক বপ্র ছেড়ে ওপরে উত্থিত। কোণস্থিত বুরুজগুলো ছোট গম্বুজসহ বদ্ধ ছত্রী এবং পদ্ম ও কলস শোভিত শীর্ষদণ্ডে শোভিত।

সরাইল মসজিদ (ভূমি নকশা-৬): আলোচ্য মসজিদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলা সদরে অবস্থিত। ইট সহযোগে এ মসজিদ আয়তাকার পরিকল্পনায় (বহিস্থ পরিমাপ ১৪.৩৩ × ৭.৬২ মিটার এবং অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ১১.২৮ × ৪.৮৮ মিটার) নির্মিত। মসজিদের অষ্টভুজাকৃতির কোণস্থিত বুরুজসমূহ বক্রাকার কার্নিশ থেকে ওপরে উত্থিত এবং নিরেট কিউপোলায় মণ্ডিত। পূর্ব-পশ্চিমে প্রশস্ত দুটি খিলান দ্বারা মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ তিনটি অংশে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় 'বে'-বর্গটি অপেক্ষাকৃত বড় ও বর্গাকার (৪.৭৫ মিটার) পরিকল্পনায় রচিত। অথচ উভয় পার্শ্বের 'বে'-বর্গ দুটি ছোট ও আয়তাকার (৪.৭৫ × ১.৯৮ মিটার) পরিসরে গঠিত। কেন্দ্রীয় 'বে'-বর্গ গোলায়িত পিপার ওপর ন্যস্ত একটি বৃহদাকার গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু উভয় পার্শ্বের আয়তাকার 'বে'-দুটির অভ্যন্তরীণ দিক থেকে *চৌচালা* রীতির খিলানছাদে আবৃত। তবে বাইরের দিকে দুটি করে মোট চারটি গম্বুজ বিদ্যমান। সুতরাং বাহ্যিকভাবে মসজিদটি পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট – বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ ও চারকোণার চারটি ক্ষুদাকৃতির গম্বুজ। প্রধান প্রবেশপথ ও মিহরাব ব্যতীত সমগ্র মসজিদের দেয়ালগাত্র স্বল্প গভীর আয়তাকার প্যানেলসহ পলেস্তারার আস্তরণে অলংকৃত। তবে প্রবেশপথ ও মিহরাব এলাকা পোড়ামাটির ফলক নকশায় সজ্জিত। শিলালিপি অনুযায়ী মসজিদটি ১০৭৪ হিজরি মোতাবেক ১৬৬৩ সালে নির্মিত।[২৮] উল্লেখ্য যে, একটি বড় কেন্দ্রীয় গম্বুজ এবং চারকোণে চারটি ছোট গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত মসজিদটি মোগল বাংলার স্থাপত্যে এক বিরল রীতির জন্ম দিয়েছে। মসজিদ স্থাপত্যের এ রীতি বাংলায় প্রথম পরিলক্ষিত হয় কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে অবস্থিত কুতুবশাহী মসজিদে (ষোল শতক)।[২৯] আলোচ্য নির্মাণরীতির অনুপ্রেরণা দিল্লির রাজকীয় স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের মধ্যে প্রোথিত বলেই অনুমিত হয়, যার অন্যতম উদাহরণ হলো জামাত খানা মসজিদ (১৩১০-১৬)।[৩০] আলোচ্য মসজিদের নামাজঘর আচ্ছাদিতকরণে এরূপ গম্বুজগুচ্ছের ব্যবহার বিহারের সুর স্থাপত্য বিশেষ করে পাটনার শেরশাহের মসজিদ (১৫৪০)

এবং চৌদ্দ শতকে নির্মিত দিল্লির খিড়কি মসজিদের একাধিক গম্বুজগুচ্ছের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩১]

ওয়ালীপুর আলমগীর মসজিদ (ভূমি নকশা-৭): মসজিদটি চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত ওয়ালীপুর গ্রামে অবস্থিত। আলোচ্য মসজিদ ওপরে বর্ণিত পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট সরাইল ও অষ্টগ্রাম মসজিদের অনুকরণে ১১০৪ হিজরি মোতাবেক ১৬৯২ সালে নির্মিত।[৩২] আয়তাকার এ মসজিদের (১৫.২৪ × ৮.২৩ মিটার) পূর্ব দিকের সম্মুখভাগের মধ্যবর্তীস্থানে উভয় প্রান্তে অষ্টভুজাকৃতির ক্ষুদ্র বুরুজ বেষ্টিত একটি অভিক্ষিপ্ত আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সংস্থাপিত প্রধান প্রবেশপথ সুউচ্চ খিলান ও অর্ধ-গম্বুজে শোভিত। তবে আলোচ্য মসজিদের অভ্যন্তরীণভাগ দুটি অষ্টভুজাকৃতির ইটের স্তম্ভ দ্বারা পাঁচটি বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত। ৫.৮৭ মিটার পরিমাপ বিশিষ্ট বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় অংশটি সুবিশাল কন্দাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং এর উভয় পার্শ্বে পূর্ব-পশ্চিম অক্ষে নির্মিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির 'বে'-বর্গ চারটি কিউপোলা সদৃশ গম্বুজে আবৃত। গম্বুজগুলো গোলাকার পিপার ওপর সংস্থাপিত এবং পদ্ম ও কলস শিরোচূড়ায় সুশোভিত। আর গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর প্রবৃত্তিতে স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কাটরা মসজিদ: ১৭২৪-২৫ সালে আদর্শ মোগল রীতিতে নির্মিত মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদের বাহ্যিক আয়তন দৈর্ঘ্যে ৩৯.৬১ মিটার ও প্রস্থে ৭.৩১ মিটার। আলোচ্য মসজিদ পাঁচটি কন্দাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং গম্বুজের নিম্নাংশে ফাঁকা স্থান ভরাটকরণে কর্বেল পান্দানতিফ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। মসজিদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আয়তাকার স্বল্প গভীর প্যানেল সজ্জা, আলংকারিক সরু বুরুজ বেষ্টিত ইওয়ান সদৃশ কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ, পত্র নকশা সংবলিত সমান্তরাল বপ্র ও ছাদের ওপরে কোণস্থিত বুরুজের উত্থিতকরণ উল্লেখযোগ্য। তবে এর অপর একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো প্রবেশপথের সম্মুখে ইউরোপীয় শৈলীর গোলাকার খাঁজ খিলানের ব্যবহার।[৩৩] বলাবাহুল্য ইউরোপীয় নির্মাণ রীতির প্রভাবপুষ্ট মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ বাংলার স্থাপত্যের প্রারম্ভিক উদাহরণসমূহের অন্যতম।

পাঁচ গম্বুজ মসজিদ বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এ ধারার আবার দুটি ধরন রয়েছে – একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় গম্বুজ ও প্রতিপাশে একই সারিতে একজোড়া করে ছোট গম্বুজ এবং একটি কেন্দ্রীয় গম্বুজ ও চারকোণায় চারটি ক্ষুদ্র গম্বুজ। টেঙ্গা মসজিদ প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলেও সরাইলের হাটখোলা মসজিদ, ওয়ালীখান মসজিদ ও কাটরা মসজিদ দ্বিতীয় ধারার মসজিদ স্থাপত্যের অন্যতম উদাহরণ। পরবর্তীকালে এ ধারার হুবহু প্রতিফলন দেখা যায় দু-শতক পরে নির্মিত ঢাকার বেচারাম দেউড়ি মসজিদে (১৮৭২)।[৩৪] আলোচ্য মসজিদ নির্মাণ পরিকল্পনার দিক থেকে ওয়ালীপুর আলমগীরী মসজিদের অনুরূপ। বাংলায় এরূপ মসজিদ নির্মাণধারার সূচনা হয়েছিল মূলত অষ্টগ্রামের কুতুবশাহী মসজিদ (ষোল শতক) নির্মাণের মধ্যদিয়ে, সরাইল হাটখোলা মসজিদে এর বিস্তৃতি ঘটে এবং ওয়ালীপুর

আলমগীরী মসজিদে এ ধারা বস্তুত আদর্শিক রূপ লাভ করে। এ ধরনের নির্মাণ পরিকল্পনা উত্তর ভারতের দিল্লিস্থ জামাতখানা মসজিদ ও আগ্রাস্থ হুমায়ূনের মসজিদের (১৫৩০) অনুরূপ নির্মাণরীতির বিকশিত বা বিবর্তিত রূপ বলেই প্রতীয়মান হয় এবং পূর্ব ভারতের পাটনায় অবস্থিত শেরশাহের সমাধি (১৫৪০) একই ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত।[৩৫] স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে দিল্লির এ নির্মাণ ঐতিহ্যের আদি উৎস কোথায়? উসমানীয় শাসনামলে টোকাতে (Tokat) নির্মিত রোস্তম সেলিবির মসজিদ (পনেরো শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত) সম্ভবত এ ধারার প্রাথমিক উদাহরণ। পরবর্তীতে একই ধারায় নির্মিত অন্যান্য মসজিদের মধ্যে হায়রাবুলর গুজেলচি হাসান বে মসজিদ (১৪০৬), এদ্রিনের উক সেরেফেলি ক্যামি (১৪৩৭-১৪৪৭), ইস্তাম্বুলের বাইজিদ মসজিদ (১৫০১-১৫০৬), সুলাইমানিয়া মসজিদ (১৫৫০-১৫৫৯) ও এদ্রিনের সেলিমিয়া মসজিদ (১৫৬৯-১৫৭৫) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৬] বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এরূপ মসজিদ পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলী সম্পাদনে নির্মাতা এবং নির্মাণ শিল্পীগণ যথেষ্ট যোগ্যতা ও উদ্ভাবন কৌশলের স্বাক্ষর রেখেছেন। পাঁচ 'বে'-সংবলিত বা পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ পরিকল্পনায় নির্মিত অটোমান মসজিদগুলো সম্ভবত সিরিয়ার প্রাথমিক কিছু উদাহরণের অনুকরণে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। অতএব, বাংলায় দ্বিতীয় ধারার পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা বাংলার স্থপতিদের নিজস্ব উদ্ভাবন ছিল না এবং উপর্যুক্ত উৎসসমূহ হতে কিংবা তুরস্ক ও ভারতীয় স্থাপত্য ঐতিহ্য হতে এটি উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে।

২.৩ ছয় গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকৃতির মসজিদ

মোল্লা মিসকিন মসজিদ (ভূমি নকশা-৮): খ্রিষ্টীয় সতেরো শতকে নির্মিত চট্টগ্রাম শহরের মহসীন কলেজ সংলগ্ন ছোট টিলার শীর্ষে আলোচ্য মসজিদ অবস্থিত। আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের বহিস্থ পরিমাপ ১০.২৪ × ৭.১৯ মিটার এবং অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ৮.৪১ × ৫.১৮ মিটার। মসজিদটি দু-আইল ও তিন 'বে'-বিশিষ্ট এবং ছয়টি প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি 'বে'-বর্গ অষ্টভুজাকৃতির পিপার ওপর সংস্থাপিত একটি করে কন্দাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং গম্বুজের নিম্নাংশের কোণের ফাঁকা স্থান ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতিতে ভরাটকৃত। ভূমি নকশা ও আচ্ছাদন প্রকৃতির দিক থেকে আলোচ্য মসজিদ সুলতানি মসজিদের হুবহু অনুকৃতি বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গত ঢাকার রামপাল মসজিদ (১৪৮৩), গৌড়ের ঝনঝনীয়া মসজিদ (১৫৩৫), বাগেরহাটের গলাকাটা মসজিদ (ষোলো শতক) ও নওগাঁ জেলার কুসম্বা মসজিদ (১৫৫৮) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উল্লিখিত সুলতানি বাংলার অনুরূপ নিদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হলেও আলোচ্য মসজিদ মোগল আদর্শ রীতির এক অনন্য উদাহরণ। মোগল শৈলীর মধ্যে সমান্তরাল বপ্র, কার্নিশ থেকে ওপরে উত্থিত কোণস্থিত বুরুজ, গম্বুজ শীর্ষে পদ্ম ও কলস শিরোচূড়া সংযোজন, অষ্টভুজাকৃতির পিপার ওপর গম্বুজ সংস্থাপন, সরু বুরুজ বেষ্টিত প্রক্ষিপ্ত কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ, পলেস্তারার অলংকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য মসজিদ সমগ্র মোগল

বাংলায় নির্মিত এ রীতির প্রথম উদাহরণ এবং ভূমি নকশার দিক থেকে সুলতানি স্থাপত্যের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে।

ওয়ালীখান মসজিদ (ভূমি নকশা-৯; আলোকচিত্র-৭): চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন চৌমুহনী এলাকায় অবস্থিত আলোচ্য মসজিদ আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত, যার বহিস্থ পরিমাপ ২০.৪২ × ১২.৮০ মিটার এবং অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ১৭.৮৬ × ১২.২৪ মিটার। মসজিদটি এক সারি স্তম্ভ দ্বারা দু-আইল ও তিনটি 'বে'-তে বিভক্ত। প্রতিটি 'বে'-বর্গ আবার একটি করে গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং গম্বুজগুলো অষ্টভুজি পিপার ওপর সংস্থাপিত। গম্বুজ নির্মাণের কৌশল হিসেবে অবস্থান্তর পর্যায়ে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ছয় গম্বুজবিশিষ্ট বর্ণিত এ মসজিদের ভূমি নকশা ও গঠনশৈলী বিবেচনায় উপর্যুক্ত মোল্লা মিসকিন মসজিদের অনুলিপি হিসেবে ধরে নেয়া যায়। সুতরাং নির্মাণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় ১৭১৪-১৯ সালে নির্মিত মসজিদটির নির্মাতা ওয়ালী খান চট্টগ্রাম অঞ্চলের একজন মোগল প্রশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[৩৭]

২.৪ দশ গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকৃতির মসজিদ

কুতুবশাহী মসজিদ (আলোকচিত্র-৮): মালদহ জেলার হযরত পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধি ও প্রখ্যাত সুফি-সাধক নূর কুতুব উল-আলমের সমাধির মধ্যবর্তী স্থানে আলোচ্য মসজিদ অবস্থিত এবং মখদম শেখ কর্তৃক ৯৯০ হিজরি মোতাবেক ১৫৮২ সালে নির্মিত।[৩৮] মসজিদটি মোগল আমলে নির্মিত হলেও নির্মাণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় গৌড়ের সুলতানি মসজিদের অনুকৃতি বলে চিহ্নিত হবার যোগ্য। প্রসঙ্গত ইটের তৈরি এ মসজিদের বহির্গাত্র প্রস্তর আস্তরণে আচ্ছাদিত। এতদ্বিবেচনায় মসজিদটি গৌড়ের বড়সোনা কিংবা ছোটসোনা মসজিদ অথবা নওগাঁ জেলার কুসম্বা মসজিদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ২৫.১০ × ১১.৫০ মিটার বাহ্যিক আয়তন বিশিষ্ট এ মসজিদের অভ্যন্তরভাগ বহুভুজ সংবলিত পাথরের স্তম্ভ দ্বারা পাঁচটি 'বে' এবং কিবলা দেয়ালের সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থিত দু-সারি গলিপথে বিভক্ত। দশটি বর্গাকৃতির 'বে'-বিশিষ্ট আলোচ্য মসজিদ তাই দশটি গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং গম্বুজসমূহ সরাসরি ইটের তৈরি বাংলা পান্দানতিফের ওপর ন্যস্ত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি করে দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলানপথ বিদ্যমান। পূর্ব দেয়ালের পাঁচটি খিলানপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে রয়েছে পাঁচটি মিহরাব *কুলঙ্গি*। মসজিদের খিলানপথ শীর্ষ এবং বক্রাকার কার্নিশ শীর্ষ পেঁচানো দড়ি সদৃশ্য স্ফীত ব্যান্ড দ্বারা অলংকৃত এবং প্রবেশপথ ও মিহরাবের খিলানের ত্রিকোণাকার ভূমিসমূহ ফুলেল নকশায় সজ্জিত। বাংলার স্থাপত্যে দশ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের প্রাচীনতম উদারণ হলো ত্রিবেণীর জাফর খান গাজীর মসজিদ (১২৯৮), গৌড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদ (১৪৮০) ও রাজশাহী জেলার বাঘা মসজিদ (১৫২৩)। সুতরাং ধারণা করা হয় যে, বাংলার মোগল স্থাপত্যের ইতিহাসে দশ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণধারা সুলতানি বাংলার অনুরূপ নির্মাণরীতি দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত কিংবা প্রভাবিত হয়েছে বলেই অনুমিত হয়।

৩ বারান্দাযুক্ত মসজিদ

৩.১ বারান্দাযুক্ত এক গম্বুজ মসজিদ

আতিয়া মসজিদ (ভূমি নকশা-১০, আলোকচিত্র-৯): শিলালিপি অনুসারে মসজিদটি টাঙ্গাইল জেলার বিখ্যাত জমিদার বাইজিদ খান পন্নীর পুত্র সাঈদ খান পন্নী কর্তৃক কথিত পীর আলী শাহানশাহ কাশ্মেরীর সৌজন্যে ১০১৮ হিজরি মোতাবেক ১৬০৯ সালে নির্মিত।[৩৯] আলোচ্য মসজিদ দুটি অংশের একটি বর্গাকার নামাজঘর এবং অপরটি নামাজঘরের সম্মুখস্থ একটি টানা বারান্দা – সমন্বয়ে গঠিত। নামাজঘরের প্রতি বাহুর পরিমিতি ৭.০২ মিটার এবং বারান্দার পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ৭.০২ মিটার ও প্রস্থে ৩.০৮ মিটার। মসজিদের নামাজঘর অষ্টভুজাকৃতির পিপার ওপর সংস্থাপিত একটি মাত্র বিশালাকৃতির গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত, অথচ টানা বারান্দার উপরিভাগে রয়েছে তিনটি গম্বুজ। নামাজঘরের গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে ইটের সরু ও প্রসারিত বিন্যাসে রচিত বাঙালি পান্দানতিফ ও অর্ধ-গম্বুজাকৃতির স্কইঞ্চ খিলান ব্যবহৃত হলেও বারান্দার গম্বুজের নিম্নাংশে কেবলমাত্র পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে দৃশ্যমান। এর চার কোণায় রয়েছে চারটি অষ্টভুজাকৃতির কোণস্থিত বুরুজ, যেগুলো নিরেট ছত্রী শোভিত। বলাবাহুল্য পিপার ওপর গম্বুজ সংস্থাপন উত্তর ভারতীয় এ রীতিটি আলোচ্য ইমারতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলার স্থাপত্যে আত্মীকৃত হয় এবং পরবর্তীতে মোগল বাংলার প্রায় প্রতিটি মসজিদে ধারাবাহিকভাবে এ রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। অথচ ভূমি নকশা ও অন্যান্য বিশেষত্বে যেমন– বক্রাকার কার্নিশ, পোড়ামাটির অলংকরণ, অর্ধ-বৃত্তাকৃতির মিহরাব *কুলঙ্গি*, দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলান, স্কুইঞ্চ ও পান্দানতিফের প্রয়োগে আতিয়া মসজিদ সুলতানি বাংলার অনুরূপ উদাহরণ। যথা– দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ মসজিদ (১৪৬০) ও সুরা মসজিদ (পনেরো শতক), গৌড়ের লট্টন মসজিদ (পনেরো শতক) ও খানিয়াদিঘি মসজিদ (১৪৭৯), বারোবাজারের গোড়ার মসজিদ (পনেরো শতক) ও সিংদহ আউলিয়া মসজিদ (পনেরো শতক), সিলেটের শঙ্কর পাশা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯), পাবনার নবগ্রাম মসজিদ (১৫২৬) এবং পটুয়াখালীর মসজিদবাড়ি মসজিদ (পনেরো শতক) প্রভৃতির অনুকৃতি বলেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বলা যায় যে, মসজিদটি মোগল ও সুলতানি নির্মাণরীতির আনন্দঘন সমাহারের এক অভিনব ফসল।

বাংলার সুলতানি ও মোগল আমলে নির্মিত এসব মসজিদের সম্মুখে বারান্দার সংযোজন গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুঁড়েঘর কিংবা মাটির ঘরবাড়ির সামনে সংযুক্ত বারান্দার হুবহু অনুকৃতি বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে কেউ কেউ বাংলার এরূপ ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদের উৎস ভারতীয় কিংবা ভারত বহির্ভূত মধ্যযুগীয় নির্মাণরীতি বিশেষ করে উসমানীয় স্থাপত্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। এরূপ বারান্দাযুক্ত এক গম্বুজবিশিষ্ট ইমারতের বিদ্যমান জ্ঞাত ভারতীয় প্রাদেশিক উদাহরণ হলো আহমদাবাদের দরিয়া খানের সমাধি (১৪৫৩) এবং উসমানীয় শাসনামলে নির্মিত কারামানের বেলিক দেভানডস মসজিদ, বুসরার আলাউদ্দীন মসজিদ (১৩২৬), হাজী উজবেক মসজিদ (১৩৩৩), ইজনিকের গ্রীন মসজিদ (১৩৭৮), ইস্তাম্বুলের ফিরূজ আগা মসজিদ (১৪৯০), মাজানির ইলদ্রিন বাইজিদ মসজিদ

(১৩৮২), ইস্কি ক্যামি (১৪৫০) প্রভৃতি এ রীতির সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।[৪০] বাংলার স্থাপত্যে উপর্যুক্ত মসজিদ নির্মাণে ভারতীয় অথবা বহির্ভারতীয় স্থাপত্যের বিকশিত কিংবা বিবর্তিতরূপ হিসেবে মনে করা হলেও মূলত বাংলার ঐতিহ্যবাহী দেশজ রীতিকে নির্দেশ করে। আর দেশীয় বারান্দাযুক্ত কুঁড়েঘরের অনুকরণে এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি রচনায় বাংলার কারিগরদের যে প্রত্যক্ষ প্রভাবের রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩.২ বারান্দাযুক্ত তিন গম্বুজ মসজিদ

ভাঙনী মসজিদ (ভূমি নকশা-১১, আলোকচিত্র-১০): রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার অন্তর্গত আলোচ্য মসজিদ ইট নির্মিত ও চুন-সুরকির পলেস্তারায় আচ্ছাদিত আঠারো শতকের শেষার্ধে অথবা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত।[৪১] মসজিদের পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ১৪ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯.২০ মিটার। এর চার কোণায় চারটি গোলাকৃতির বুরুজ রয়েছে এবং প্রতিটি বুরুজ আবার একটি করে গোলাকার আলংকারিক সরু বুরুজ দ্বারা বেষ্টিত। কৌণিক এ বুরুজগুলোর মধ্যভাগেও অধীন সরু বুরুজ বিদ্যমান। কোণস্থিত বুরুজগুলো এবং সরু বুরুজসমূহ বপ্রের উপরিভাগ পর্যন্ত উত্থিত ও কিউপোলা মণ্ডিত। প্রতিটি কিউপোলার শীর্ষবিন্দুতে আবার কলসাকৃতির শিরোচূড়া বিদ্যমান। নামাজঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় খিলানপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণের প্রবেশপথ সম্মুখদিকে প্রলম্বিত। এ অংশের উভয় পার্শ্বে গোলাকার সরু বুরুজ বেষ্টিত। প্রবেশপথগুলো বরাবর অভ্যন্তরভাগের কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব সন্নিবেশিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির হলেও পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটি অর্ধ-বৃত্তাকার। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ন্যায় কেন্দ্রীয় মিহরাবও পশ্চাৎ দিকে অভিক্ষিপ্ত এবং এর উভয় পার্শ্বে দুটি গোলাকার সরু বুরুজ সংযোজিত। পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটির খিলান গর্ভ সাদামাটা হলেও কেন্দ্রীয় মিহরাব বহু খাঁজ খিলান নকশায় সজ্জিত। মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরীণ পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ১০.৮০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২.৯০ মিটার। নামাজগৃহটি দুটি খিলান দ্বারা তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত। প্রতিটি 'বে'-বর্গের ওপর প্রতিষ্ঠিত তিনটি গগন সদৃশ কন্দাকৃতির গম্বুজ সমগ্র নামাজগৃহকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। গম্বুজগুলো আবার খিলান এবং প্রবেশপথ ও মিহরাবের খিলানের ওপর সংস্থাপিত। গম্বুজের নিম্নাংশের কোণের ফাঁকা স্থান আচ্ছাদিতকরণে ত্রিভুজাকৃতির পান্দানতিফ রীতির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। আবার নামাজগৃহের সম্মুখভাগে সংযোজিত বারান্দাটির পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ১৪ মিটার ও প্রস্থে ১.৯৫ মিটার। বারান্দায় প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি প্রবেশপথ রয়েছে। বারান্দার ছাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত চারটি অর্ধ-বৃত্তাকৃতির গম্বুজ তিনটি সমান্তরাল খিলানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজগুলোর নিম্নভাগের কোণগুলো ত্রিভুজাকৃতির পান্দানতিফ পদ্ধতিতে পূর্ণ। এ মসজিদের সকল গম্বুজের ওপরে সূক্ষ্ম পদ্ম নকশা ও কলসযুক্ত শিরোচূড়া এর বহির্দৃশ্যকে সুষমামণ্ডিত করেছে এবং কার্নিশ ও বপ্র সামগ্রিকভাবে ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল।

আলোচ্য মসজিদ তিন গম্বুজবিশিষ্ট ও বারান্দা সমন্বয়ে গঠিত। সমগ্র মোগল ভারতীয় স্থাপত্যে এ ধরনের মসজিদের এটিই একমাত্র জ্ঞাত উদাহরণ। এ যুগে নির্মিত উপর্যুক্ত তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ সচরাচর দেখা গেলেও বর্তমান মসজিদের সম্মুখে বারান্দার সংযোজন বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে এক নতুন অভিযোজন। মোগল আমলে নির্মিত এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের সম্মুখে গম্বুজ অথবা চালাছাদ সংবলিত বারান্দা সংযোজিত হতে দেখা যায়। কিন্তু তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের সম্মুখে গম্বুজ সংবলিত বারান্দার সংযোজন মধ্যযুগীয় বাংলার স্থাপত্যে একটি ব্যত্যয়ধর্মী উদাহরণ। সম্মুখে বারান্দা সংবলিত এক গম্বুজ ইমারতের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ ও ঢাকার দারা বেগমের সমাধি (সতেরো শতক)।[৪২] কিন্তু সুলতানি বাংলার এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের সম্মুখে গম্বুজ আচ্ছাদিত বারান্দার নজির পাওয়া যায়, যা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। তবে এ আমলে নির্মিত বহু গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের সম্মুখে গম্বুজ আচ্ছাদিত বারান্দার সংযোজন বাংলার স্থাপত্যের কতিপয় বিদ্যমান উদাহরণ হলো গৌড়ের দরসবাড়ী মসজিদ (১৪৭৯), গুন্মান্ত মসজিদ (পনেরো-ষোল শতক) ও বড়সোনা মসজিদ (১৫১৯-৩১)।[৪৩] এসব উৎস থেকেই সম্ভবত ভাঙ্গনী মসজিদের নামাজঘরের সম্মুখে বারান্দা নির্মাণের ধারণাটি গৃহীত হয়ে থাকতে পারে। আর সুলতানি বাংলার এরূপ নির্মাণ ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে প্রাচীন বাংলার বহুল প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী কুঁড়েঘর, যার সম্মুখে টানা বারান্দা সংযোজিত এবং গ্রাম-বাংলার এ প্রাচীন নির্মাণ ঐতিহ্যের প্রতিফলন অদ্যাবধি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাটির কিংবা ইটের তৈরি বাংলো বাড়িতে আজও পরিলক্ষিত হয়।

৪ বিবিধ রীতির মসজিদ

৪.১ কেন্দ্রীয় গম্বুজসহ খিলানছাদ বিশিষ্ট মসজিদ

আজিমপুর মসজিদ (ভূমি নকশা-১২): ঢাকার আজিমপুরে অবস্থিত আলোচ্য মসজিদ ১৭৪৬ সালে নির্মিত।[৪৪] মসজিদের বহিস্থ পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১১.৫৮ মিটার এবং প্রস্থে ৭.৪১ মিটার। এর নামাজঘরের কেন্দ্রীয় বৃহৎ বর্গাকৃতির 'বে'-টি গতানুগতিক পরিক্রমায় একটি বৃহদাকার কন্দাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত, যা গোলাকার পিপার ওপর সংস্থাপিত এবং পার্শ্ববর্তী আয়তাকার 'বে'-বর্গ দুটি সম্পূর্ণরূপে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদে আচ্ছাদিত। অর্থাৎ এ মসজিদের আচ্ছাদন প্রকৃতি কেন্দ্রীয় গম্বুজ ও অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদের সমন্বয়ে গঠিত। অনুরূপভাবে সাতক্ষীরা জেলার আতারৌ মসজিদ (সতেরো শতক), তেতুলিয়া মসজিদ (সতেরো শতক), তালা মসজিদ (সতেরো শতক) এবং নারায়গঞ্জের মোগরাপাড়া মসজিদ (১৭০০-০১) সমগোত্রীয় রীতির অপর চারটি বিদ্যমান উদাহরণ। তবে ভূমি নকশা ও আচ্ছাদন প্রকৃতির দিক থেকে তালা মসজিদ আলোচ্য রীতির অন্যান্য উদাহরণের অনুলিপি হলেও আলংকারিক সরু বুরুজ বেষ্টিত চার আক্ষিক উদ্‌গত পরিকল্পনা মোগল বাংলার স্থাপত্যের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য, যে বিশেষত্ব বাংলার স্থাপত্যে ইতঃপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। আলোচ্য বৈশিষ্ট্যটি নিঃসন্দেহে উত্তর ভারতীয় মোগল আদর্শ নকশার মসজিদ যেমন– দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রি ও লাহোর জামি মসজিদের চার আক্ষিক ইওয়ান পথের ধারণা

থেকে এসেছে বলে অনুমিত হয়। যাহোক এরূপ আচ্ছাদন প্রকৃতির উৎস কোথায়? বলা যেতে পারে উসমানীয় আমলের প্রারম্ভিক আদর্শ নকশার মসজিদের যেমন– ইস্তাম্বুলের সুলতান দ্বিতীয় বাইজিদ ক্যামির (১৫০১-১৫০৬) নামাজঘরের ছাদ নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঢাকার অনুরূপ উদাহরণের যথেষ্ট সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।[৪৫] উসমানীয় স্থাপত্যের এ রীতি খুব সম্ভব আরমেনীয়দের মাধ্যমে বাংলার স্থাপত্যে অনুপ্রবেশ করে থাকতে পারে। কেননা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এ দেশে আগত অনেক আরমেনীয় ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলেছিলেন বলে ইতিহাস পাঠে জানা যায়।[৪৬]

৪.২ কেন্দ্রীয় গম্বুজ সমেত *চৌচালা* মসজিদ

সুজাউদ্দীন মসজিদ: ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার দহপাড়ায় অবস্থিত আলোচ্য মসজিদ ১৭৪৩ সালে (১১৫৬ হিজরি) নবাব সুজাউদ্দীন কর্তৃক নির্মিত।[৪৭] মসজিদের কোণস্থিত বুরুজসমূহ প্রথাগতভাবে সমান্তরাল বপ্র ছেড়ে ওপরে উত্থিত। ইতঃপূর্বে নির্মিত রাজমহল জুমা মসজিদ ও ঢাকার অন্যান্য উদাহরণের মতোই আলোচ্য মসজিদ আয়তাকার পরিকল্পনায় গঠিত এবং এর অভ্যন্তরভাগ তিনটি 'বে'-বর্গে বিভক্ত। কিন্তু ঢাকা ও রাজমহল মসজিদের সকল 'বে'-বর্গ একটি করে গম্বুজে আচ্ছাদিত হলেও আলোচ্য উদাহরণের কেবল মধ্যবর্তী 'বে'-টি গম্বুজাবৃত এবং পার্শ্ববর্তী 'বে'-বর্গ দুটি *চৌচালা* খিলানছাদে আচ্ছাদিত। অর্থাৎ তিন 'বে' বিশিষ্ট আলোচ্য মসজিদের ছাদ গম্বুজ ও *চৌচালা* খিলানছাদে আবৃত এবং রীতিটি বাংলার স্থাপত্যে সম্ভবত বর্তমান উদাহরণের মাধ্যমেই প্রথম আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ আলোচ্য মসজিদ মোগল বৈশিষ্ট্য সংবলিত তিন 'বে' বিশিষ্ট হলেও আচ্ছাদন প্রকৃতির দিক থেকে বাংলার স্থাপত্যে এক নতুন রীতির সূচনা করেছে। বলা যেতে পারে মসজিদ স্থাপত্যে গম্বুজ ও খিলানছাদের সমন্বয়ে নামাজঘর আচ্ছাদন রীতিটি বাংলার স্থাপত্যে একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ এবং মোগল বাংলার স্থপতিদের এক অভিনব উদ্ভাবন। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, দৈশিক ও বৈশ্বিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গঠিত আলোচ্য মসজিদ বাংলার শিল্পকলার ইতিহাসে এক অনন্য বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। মুর্শির্দাবাদের গোলাপবাগ মসজিদ (আঠারো শতক) ও বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার যদুনগর মসজিদ (আঠারো শতক) একই রীতির অপর দুটি অনন্য উদাহরণ (ভূমি নকশা-১৩)।[৪৮] তাছাড়া উল্লিখিত মসজিদই সম্ভবত বাংলার স্থাপত্যের প্রথম উদাহরণ, যেখানে পশ্চাৎ দেয়ালে মিহরাবের প্রক্ষিপ্ত অংশ এবং ফাসাদের খিলানপথ শীর্ষ পলেস্তারায়কৃত *চৌচালা* ও *দোচালা* অলংকরণ বিষয়বস্তু দ্বারা সজ্জিত।[৪৯] এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তীতে মুর্শিদাবাদের মসজিদ স্থাপত্যে উপর্যুপরি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

৪.৩ সমতল ছাদ বিশিষ্ট মসজিদ

ফারুক শিয়ার মসজিদ: সুবাদার আজিম উস-শানের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলায় আগত যুবরাজ ফারুক শিয়ার কর্তৃক আলোচ্য মসজিদটি ১৭০৩-০৬ সালে নির্মিত।[৫০] বর্তমানে মসজিদটি

লালবাগ শাহী মসজিদ হিসেবে সমধিক পরিচিত। মোগল বাংলার কয়েকটি বৃহদাকৃতির মসজিদের মধ্যে আলোচ্য মসজিদ অন্যতম, যার পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ৫০ মিটার ও প্রস্থে ১৭ মিটার। ভূমি পরিকল্পনা ও ছাদ নির্মাণ কৌশলের কারণে মসজিদটি বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বলাবাহুল্য তিন গলিপথ বিশিষ্ট এ মসজিদের নামাজঘর মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে প্রথম ও শেষ জ্ঞাত উদাহরণ। কিন্তু সুলতানি বাংলায় এ রীতির অসংখ্য উদাহরণ অদ্যাবধি বিদ্যমান। সুতরাং ফারুক শিয়ার মসজিদের তিন গলিপথ বিশিষ্ট নামাজঘরের ধারণা সুলতানি বাংলার অনুরূপ উদাহরণ দ্বারাই প্রভাবিত বলে অনুমিত হয়। সুলতানি আমলে নির্মিত গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদ ও ছোটসোনা মসজিদ, নওগাঁ জেলার মাহীসন্তোস মসজিদ, বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় মসজিদ প্রভৃতি তিন গলিপথ বিশিষ্ট মসজিদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া আলোচ্য মসজিদ সমতল ছাদে আচ্ছাদিত, যা বাংলার স্থাপত্যে একটি নতুন বিশেষত্ব। বৈশিষ্ট্যটি সম্ভবত উত্তর ভারতের ফতেপুর-সিক্রিস্থিত নাগিনা মসজিদের অনুরূপ উদাহরণ থেকে অনুকৃত হয়ে থাকতে পারে।[৫১]

৪.৪ বাংলা রীতির মসজিদ

চুরিহাট্টা ও আরমানিটোলা মসজিদ (ভূমি নকশা-১৪): ঢাকার চকবাজার মসজিদ থেকে পশ্চিমে অবস্থিত চুরিহাট্টা মসজিদ ১৬৫০ সালে (১০৬০ হিজরি) এবং আরমানিটোলা মসজিদ ১৭১৬ সালে (১১২৯ হিজরি) নির্মিত।[৫২] উভয় মসজিদই বাংলা-রীতির মসজিদের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মসজিদ দুটি আয়তাকার পরিল্পনায় রচিত এবং সম-আয়তন বিশিষ্ট। অর্থাৎ উভয় মসজিদের বহিস্থ পরিমাপ ৫.৪৮ × ৩.০৫ মিটার। মসজিদদ্বয় একটি মাত্র *চৌচালা* খিলানছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। আরমানিটোলা ও চুরিহাট্টা মসজিদ দুটি সুলতানি বাংলার স্থাপত্যে এ রীতির উদাহরণ বাগেরহাটের সাহেবডাঙ্গা মসজিদের (ষোল শতক) প্রভাবে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়।[৫৩] তাছাড়া উভয় মসজিদ ইটে তৈরি ও পলেস্তারায় আবৃত। নামাজঘরের সম্মুখে তিনটি প্রবেশপথ বিদ্যমান, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ পার্শ্ববর্তীগুলো অপেক্ষা বড় এবং অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির খিলানছাদে আচ্ছাদিত। আরমানিটোলা মসজিদে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে রয়েছে একটি মাত্র অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির মিহরাব এবং মিহরাবটি কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ন্যায় পশ্চাৎ দিকে অভিক্ষিপ্ত। অথচ চুরিহাট্টা মসজিদের কিবলা দেয়ালে রয়েছে তিনটি মিহরাব, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাব অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির হলেও উভয় পার্শ্বের মিহরাব দুটি আয়তাকার পরিকল্পনায় গঠিত। উল্লেখ্য যে, প্রথমোক্ত মসজিদে কোণস্থিত বুরুজ থাকলেও শেষোক্ত মসজিদে তা অনুপস্থিত।

চৌচালা খিলানছাদের ব্যবহার সুলতানি বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের *চৌচালা* ছাদের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় নওগাঁ জেলার ধামইরহাটের মাহীসন্তোষ মসজিদ (১৪৬৩), বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, গৌড়ের লট্টন মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯), ছোটসোনা মসজিদ, দরসবাড়ি মসজিদ ও বগুড়ার মহাস্থানগড় মসজিদে (পনেরো শতক)। তাছাড়া মোগল আমলে নির্মিত ঢাকার বড় কাটরা (১৬৪৪-১৬৪৬), ছোট কাটরা (১৬৬৩) ও

পুরানা পল্টন মসজিদ অনুরূপ *চৌচালা* ছাদে আচ্ছাদিত। বাংলার এ স্থানীয় নির্মাণরীতি পরবর্তীতে সম্রাট শাহাজাহানের আমলে নির্মিত আগ্রা দুর্গের জাহানারা প্রাসাদ (১৬৩৭), দিল্লির লালকেল্লাস্থ (১৬৩৯-১৬৪৮) দিওয়ান-ই-আমের সিংহাসন কক্ষ, লাহোর দুর্গের নওলাখি প্যাভিলিয়ন (১৬৪০), দাক্ষিণাত্যের বন্দেনেওয়াজ দরগাহ (১৬৪০) এমনকি আঠারো শতকে নির্মিত রাজপুত ইমারতে পরিদৃষ্ট হয়।[৫৪] বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের এ অভিনব *চৌচালা* ছাদ নির্মাণ কৌশলটি মধ্যযুগীয় বাংলার মন্দির স্থাপত্যেও অনুসৃত হয়েছে। পাবনার কপিলেশ্বর শিবমন্দির (১৬৩৫), মাগুরার শিবমন্দির (১৭৩৩), পুঠিয়ার শিবমন্দির (আঠারো শতক) প্রভৃতি উল্লিখিত পদ্ধতির চলমানরূপ।[৫৫] তবে এসব মন্দিরের উপরিস্থিত *চৌচালা* ছাদ কিছুটা পিরামিড আকৃতির। মধ্যযুগীয় বাংলার মসজিদ ও মন্দির স্থাপত্যে এরূপ *চৌচালা* খিলানছাদ পরিদৃষ্ট হলেও প্রাচীন বাংলার হিন্দু-বৌদ্ধ স্থাপত্যে এ রীতির প্রচলন আদৌ ছিল কি-না তার কোনো নজির পাওয়া যায় না। সুতরাং বিদ্যমান জ্ঞাত উদাহরণের অভাবে ধারণা করা যায় যে, এ ধরনের নির্মাণরীতি স্থানীয় কুঁড়েঘরের চালাছাদের অনুকরণে মুসলমানরাই প্রথম স্বীয় ইমারত নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রবর্তন করে, যা পরবর্তীকালে বাংলার মন্দির স্থাপত্যের ক্রমবিকাশে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। বলতে দ্বিধা নেই যে, দেশীয় কুঁড়েঘর সদৃশ বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে *চৌচালা* খিলানছাদের ব্যবহার এদেশের কারিগরদের অনন্য অবদানের ফসল এবং বাঙালিকরণের এক অভিনব প্রচেষ্টা।

৪.৫ নলাকৃতির খিলানছাদ বিশিষ্ট মসজিদ

মালদহ জামি (আলোকচিত্র-১১): পুরাতন মালদহ শহরের দক্ষিণাংশে আলোচ্য জামি মসজিদ অবস্থিত এবং জনৈক মাসুম কর্তৃক ১৫৯৬ সালে (১০০৪ হিজরি) নির্মিত।[৫৬] ভূমি নকশা অনুযায়ী মসজিদটি উত্তর ভারতে বিকশিত মোগল উদাহরণের অনুরূপ বলেই প্রতীয়মান হয়। অষ্টভুজাকৃতির কোণস্থিত বুরুজ দ্বার সুরক্ষিত আলোচ্য মসজিদের বাহ্যিক পরিমাপ ২২ × ৮ মিটার। মসজিদের নামাজঘর একটি প্রশস্ত গলিপথ দ্বারা দুটি অংশে বিভক্ত এবং কেন্দ্রীয় গলিপথ নলাকৃতির খিলানছাদে আচ্ছাদিত। তবে উভয় পার্শ্বের 'বে'-বর্গ মোগল রীতির কন্দাকৃতির গম্বুজে আবৃত। অর্থাৎ আচ্ছাদন প্রকৃতির দিক থেকে মসজিদটি বাংলার স্থাপত্যে বিশেষ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। গলিপথ দ্বারা নামাজঘরকে দ্বিখণ্ডিতকরণ রীতি অর্থাৎ ভূমি নকশা বিবেচনায় মসজিদটি গৌড়ের আদিনা মসজিদ, ছোটসোনা মসজিদ, দরসবাড়ি মসজিদ, ষাটগম্বুজ মসজিদ, মাহীসন্তোষ মসজিদ, মহাস্থানগড় মসজিদ ও গুন্মান্ত মসজিদের অনুলিপি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে ছাদ নির্মাণরীতি অনুযায়ী বর্ণিত মসজিদ গৌড়ের আদিনা মসজিদ ও গুন্মান্ত মসজিদের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ।[৫৭] আলোচ্য নির্মাণ ঐতিহ্য (ভূমি নকশার দিক থেকে) দিল্লির বেগমপুরী মসজিদের (চৌদ্দ শতক) প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফসল হিসেবে ধরে নেয়া যায়। নামাজঘরকে প্রশস্ত গলিপথ দ্বারা সমবিভাজন ঐতিহ্য মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে উমাইয়া আমলে নির্মিত দামেস্ক জামি মসজিদে (৭০৫-১৫) সর্বপ্রথম

পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে রীতিটি আব্বাসীয় আমলে ও পারসিক ভূখণ্ডে নির্মিত যথাক্রমে বাগদাদ মসজিদ (৭৬২), রাক্কা মসজিদ (৭৭২), সামাররা মসজিদ (৮৪৭), আবু দুলাফ মসজিদ (৮৫৯), বিবি খানম মসজিদ (১৩৯৯), মসজিদ-ই-শাহ (১৬১২-১৬৩৭), শেখ লুৎফুল্লাহ জামি (১৬১৭) এমনকি ইস্পাহান জামি মসজিদে (আট-সতেরো শতক) ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে।[৫৮] বলাবাহুল্য মুসলিম স্থাপত্যে নামাজঘরকে নলাকৃতির খিলানছাদ ও গম্বুজ দ্বারা আবৃতকরণ রীতির সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো আট শতকে নির্মিত পারস্যের দামগান *তারিখখানা* মসজিদ (ঈশ্বরের ঘর) ও নাইরিজ মসজিদ (নয় শতক)।[৫৯] বাংলার স্থাপত্যে ব্যবহৃত নলাকৃতির খিলানছাদের উৎপত্তি কোথায় তা নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, এর স্থাপত্যিক উৎস বাংলাতেই, আবার অনেকেই বহির্বিশ্বের প্রাক-মুসলিম কিংবা মুসলিম স্থাপত্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। অর্থাৎ দানীর ভাষায়, নলাকৃতির খিলানছাদের নুমনা-আদর্শ একদা বাংলার নদ-নদীতে চলমান নৌকার ছই আকৃতির চালাছাদের প্রতিরূপ হতে পারে।[৬০] কিন্তু *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার* সূত্র মতে, নলাকৃতির গঠনশৈলী প্রথম পরিলক্ষিত হয় প্রাচীন মিশর ও নিকট-প্রাচ্যে।[৬১] আবার কেউ কেউ পারস্যের গজনভী ও সেলযুক স্থাপত্যে এ রীতির বীজ রোপিত হয়েছিল বলে মনে করে থাকেন। যাহোক আলোচ্য মসজিদের গম্বুজ শীর্ষ মোগল রীতির পদ্মফুল আকৃতির শীর্ষদণ্ডে সজ্জিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের সম্মুখাংশে সরু বুরুজ বেষ্টিত একটি *পিসতাক* বিদ্যমান এবং পার্শ্ববর্তী অংশদ্বয়ের কার্নিশ বক্রভাবে রচিত। আলোচ্য মসজিদের নামাজঘরের সম্মুখে পিসতাকের সংযোজন বাংলার স্থাপত্যে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে প্রথম পরিলক্ষিত হয় এবং দিল্লির কিলা-ই-কুহনা মসজিদ (১৫৪৫) ও জৌনপুর জামি মসজিদ (১৪৭০) আলোচ্য রীতির অনুপ্রেরণার একমাত্র উৎস হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য।[৬২] ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের আঞ্চলিক পর্যায়ে জৌনপুরের পাশাপাশি গুজরাটের মসজিদ স্থাপত্যে বর্ণিত শৈলী যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।[৬৩] মসজিদটি সামগ্রিকভাবে পলেস্তারায় অলংকৃত – যে পলেস্তারার আস্তরণ পরবর্তী মোগল বাংলার স্থাপত্যের চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। আলোচ্য মসজিদের কতিপয় নির্মাণ বৈশিষ্ট্য যেমন–পলেস্তারার আস্তরণ, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ অভিক্ষিপ্তপূর্বক আলংকারিক সরু বুরুজ দ্বারা বেষ্টিতকরণ এবং গম্বুজশীর্ষে পদ্ম ও কলস শীর্ষদণ্ডে সজ্জিতকরণ– পরবর্তীকালে মোগল বাংলার স্থাপত্যের গঠন ও বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

রাজমহল মসজিদ (আলোকচিত্র-১২): বর্তমান রাজমহল শহরের ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে মসজিদটি অবস্থিত এবং সম্রাট আকবরের পূর্বাঞ্চলীয় ভাইসরয়-জেনারেল রাজা মানসিংহ কর্তৃক ১৫৯৫-৯৬ সালে নির্মিত।[৬৪] মসজিদের আয়তাকার নামাজঘরের পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ৬৭ মিটার ও প্রস্থে ২০ মিটার। নামাজঘরের প্রতিটি কোণ অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ দ্বারা সুদৃঢ়কৃত এবং বুরুজসমূহ সমান্তরাল ছাদ কিনারা অতিক্রমপূর্বক ওপরে উত্থিত ও শীর্ষদেশ কিউপোলায় সুশোভিত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে সাতটি বৃহদাকৃতির চতুষ্কেন্দ্রিক খিলানপথ বিদ্যমান এবং

মধ্যবর্তী প্রবেশপথটি সম্মুখদিকে উদগতপূর্বক উঁচু খিলান সংবলিত *পিসতাক*-এ সমৃদ্ধ। এর উভয় পার্শ্বে আলংকারিক সরু বুরুজ বেষ্টিত। মসজিদের সমান্তরাল বপ্র মোগল স্থাপত্যের চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত *কানজুরা* নকশায় সজ্জিত। এর নামাজঘর একটি প্রশস্ত গলিপথ দ্বারা দুটি অংশে বিভক্ত। প্রতিটি অংশ আবার উত্তর-দক্ষিণে ধাবমান দুটি গলিপথ এবং পূর্ব-পশ্চিমে লম্বমান দুটি 'বে'-বর্গের সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ মসজিদের উভয় পার্শ্বের প্রতিটি অংশ চারটি করে মোট আটটি 'বে'-বর্গে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় প্রশস্ত গলিপথ নলাকৃতির খিলানছাদে আচ্ছাদিত হলেও উভয় পার্শ্বের প্রতিটি 'বে'-বর্গ গম্বুজাবৃত। গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মসজিদের অভ্যন্তরের সর্বোত্তরে ও সর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত চারটি স্বতন্ত্র দ্বিতল বিশিষ্ট কক্ষ পরিলক্ষিত হয়, যা বাংলার স্থাপত্যে আলোচ্য মসজিদের পূর্বাপরে আর দেখা যায় না। নামাজঘরের উভয় প্রান্তস্থিত দ্বিতল কক্ষ বিন্যাস ও ইওয়ান-ই-প্রবেশপথ, চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান, সমান্তরাল বপ্র, অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতি মিহরাব *কুলঙ্গি*, পলেস্তারার আস্তরণ প্রভৃতি বিশেষত্বে রাজমহল জামি মসজিদ সম্রাট আকবরের ফতেপুর-সিক্রি জামির (১৫৭১) সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ।[৬৫]

উপসংহার

শিল্পকলা একটি দেশ-জাতির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহের প্রতিচ্ছবি। সুকুমার শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা স্থাপত্যকলা মূলত দেশ-জাতির অর্থনৈতিক ও শিল্পসত্তার মানোন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মানব সভ্যতার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস প্রণয়নে পুরাকীর্তির ভূমিকা অপরিসীম। কেননা স্থাপত্যশিল্প ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উৎস। বলাবাহুল্য যে কোনো দেশ-জাতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বস্তুত সমসাময়িক গ্রন্থনির্ভর হওয়ায় সাধারণ্যের নিকট তা অনেকটাই আড়ালে থেকে যায় এবং প্রণেতার স্বীয় মননের ছাপ কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্থাপত্য-ঐতিহ্যের ইতিহাস জীবন্ত, যা সবার সামনে সমরূপে দৃশ্যমান। মধ্যএশিয়া ও পারসিক বংশোদ্ভূত মোঙ্গল-তৈমুরীয় হওয়ায় জাতিগতভাবে আলাদা সত্তার বলয়ে সমগোত্রীয় উত্তর ভারতীয় মোগল শাসকদের বিশ্বস্ত-অনুগত কর্মচারী হিসেবে বাংলার সুবাদার এবং নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এ দেশে গড়ে ওঠা স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় মসজিদ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন ও বিবর্তন লক্ষণীয়। এ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্য এক নতুন ধারায় রূপান্তরিত হয়, যে ধারা ইতঃপূর্বে বিকশিত সুলতানি বাংলার মসজিদ স্থাপত্য থেকে বহুলাংশেই ভিন্নতর। অর্থাৎ এ পরিবর্তন শুধু মসজিদের ভূমি নকশা ও গঠনশৈলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং অলংকরণের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে দৃশ্যমান। তবে সমকালীন স্থাপত্যের ইতিহাসে মূল্যমান বিচারে সুলতানি বাংলার অনুরূপ উদাহরণের তুলনায় অনেকটাই সাদাসিধে ও নিরাভরণ। তাছাড়া এ নতুন ধারায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রাক-মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের চিরাচরিত উল্টানো *চাঁড়ি* সদৃশ গম্বুজ ও দেশীয় *চৌচালা* খিলানছাদের স্থলে এ যুগের মসজিদ স্থাপত্য ভিন্নরূপে আচ্ছাদিত হতে থাকে এবং সে

আচ্ছাদন প্রক্রিয়ায় বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। অর্থাৎ বাংলার মোগল মসজিদসমূহের ছাদ নির্মাণে কন্দাকৃতির গম্বুজ, অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ, সমতল ছাদ, ক্রুশাকৃতির খিলানছাদ, নলাকৃতির খিলানছাদ এবং *চৌচালা* খিলানছাদ ব্যবহৃত হয়েছে, বর্ণিত সমীক্ষণ থেকে বিষয়টি স্পষ্টত উপলব্ধি করা যায়। আর ছাদ নির্মাণ কৌশল হিসেবে কর্বেল কিংবা ত্রিকোণাকৃতির পান্দানতিফ এবং স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যাহোক এ ভিন্নতায় পারসিক প্রভাবান্বিত উত্তর ভারতীয় মুসলিম বিশেষ করে মোগল রাজকীয় স্থাপত্যের প্রাধান্য সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। উত্তর ভারতীয় তথা বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যরীতির প্রভাবের অন্যতম কারণ হলো অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বাংলায় আগত মুসলিম শাসক ও কারিগরগণ মূলত উত্তর ভারতীয় হওয়ায় তাদের নির্মিত ইমারতে উত্তর ভারতের তথা বহির্দেশীয় স্থাপত্যরীতির প্রভাব সর্বাধিক পরিলক্ষিত হবে এটিই স্বাভাবিক। তবে বাংলার মোগল স্থাপত্যের পরিপূর্ণতা অর্জনে এ দেশের সুলতানি স্থাপত্যরীতির অবদানকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। বরং মোগল বাংলার সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণে বিশেষ করে স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে দুটি ধারা লক্ষণীয় – একটি সুলতানি এবং অপরটি উত্তর ভারতীয় মুসলিম। এ কথা স্মর্তব্য যে, প্রাক-মোগল স্থানীয় স্থাপত্য ঐতিহ্যের প্রভাব তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ নগরাঞ্চলে নির্মিত ইমারতসমূহে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হলেও ঢাকাসহ অপরাপর রাজধানী শহরাঞ্চলে উত্তর ভারতীয় নির্মাণশৈলীর প্রাধান্য সর্বাধিক দৃশ্যমান। এর সফল ও সার্থক প্রতিফলন লক্ষিত হয় মোগল বাংলার নির্মাণশিল্পের ইতিহাসে – যে নির্মাণশিল্প সর্ব যুগে যে কোনো দেশ-জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

ভূমি নকশা

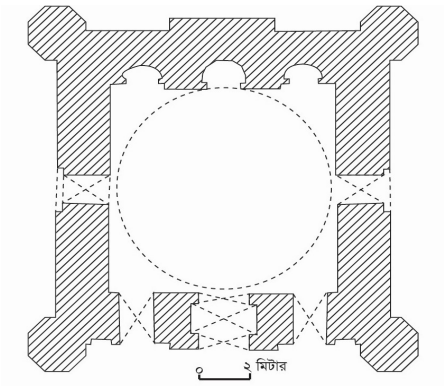

ভূমি নকশা-১: বিবি মসজিদ, বগুড়া।

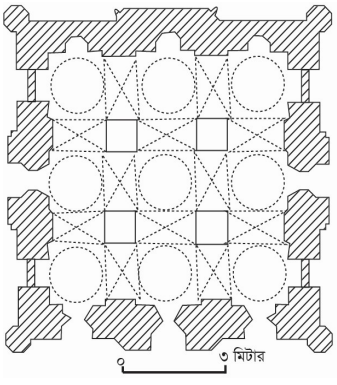

ভূমি নকশা-২: লালদীঘি মসজিদ, রংপুর।

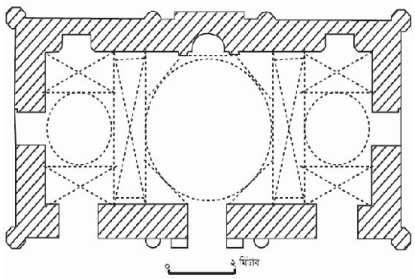

ভূমি নকশা-৩: ইসলাম খান মসজিদ, ঢাকা।

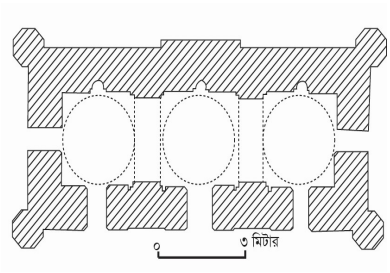

ভূমি নকশা-৪: খেরুয়া মসজিদ, বগুড়া।

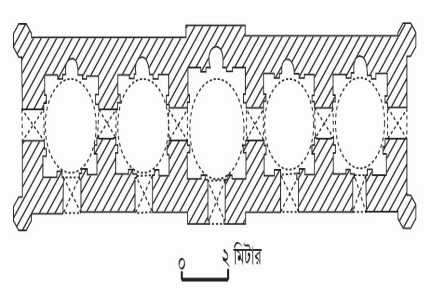

ভূমি নকশা-৫: টেঙ্গা মসজিদ, সাতক্ষীরা।

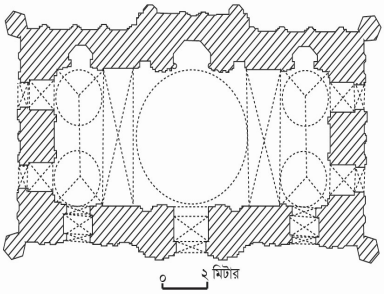

ভূমি নকশা-৬: সরাইল মসজিদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

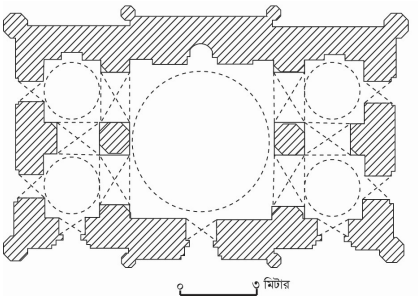

ভূমি নকশা-৭: ওয়ালীপুর আলমগীর মসজিদ, চাঁদপুর।

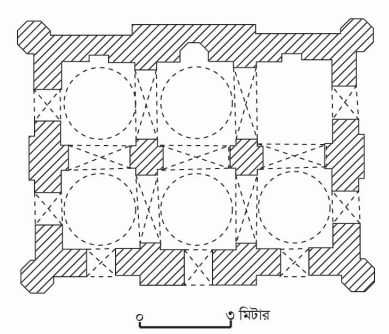

ভূমি নকশা-৮: মোল্লা মিসকিন মসজিদ, চট্টগ্রাম।

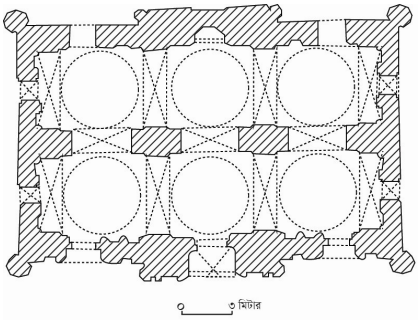

ভূমি নকশা-৯: ওয়ালীখান মসজিদ, চট্টগ্রাম।

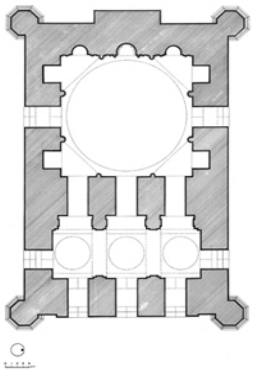

ভূমি-নকশা ১০: আতিয়া মসজিদ, টাঙ্গাইল।

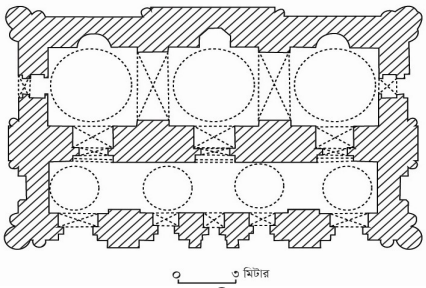

ভূমি-নকশা ১১: ভাঙ্গনী মসজিদ, রংপুর।

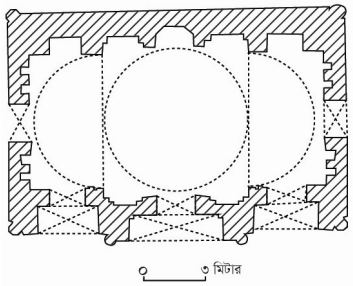

ভূমি নকশা-১২: আজিমপুর মসজিদ, ঢাকা।

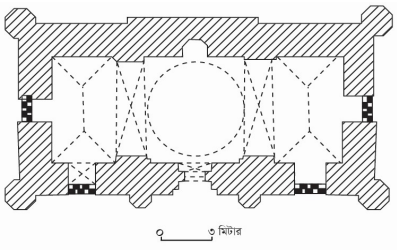

ভূমি নকশা-১৩: যদুনগর মসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

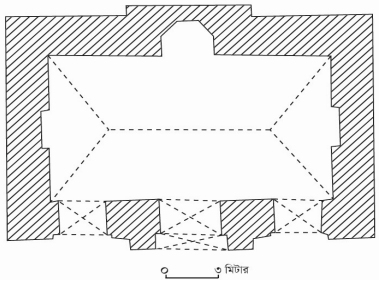

ভূমি নকশা-১৪: আরমানিটোলা মসজিদ, ঢাকা।

আলোকচিত্র

আলোকচিত্র-১: সাদীর মসজিদ, এগারসিন্ধুর, কিশোরগঞ্জ।

আলোকচিত্র-২: লালদীঘি মসজিদ, বদরগঞ্জ, রংপুর।

আলোকচিত্র-৩: লালবাগ দুর্গ মসজিদ, ঢাকা।

আলোকচিত্র-৪: সাতগম্বুজ মসজিদ, ঢাকা।

আলোকচিত্র-৫: খেরুয়া মসজিদ, শেরপুর, বগুড়া।

আলোকচিত্র-৬: করতলব খান মসজিদ, ঢাকা।

আলোকচিত্র-৭: ওয়ালীখান মসজিদ, চট্টগ্রাম।

আলোকচিত্র-৮: কুতুবশাহী মসজিদ, মালদহ।

আলোকচিত্র-৯: আতিয়া মসজিদ, টাঙ্গাইল।

আলোকচিত্র-১০: ভাঙ্গনী মসজিদ, মিঠাপুকুর, রংপুর।

আলোকচিত্র-১১: মালদহ মসজিদ, মুর্শিদাবাদ।

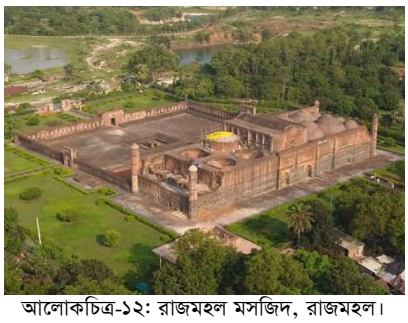

আলোকচিত্র-১২: রাজমহল মসজিদ, রাজমহল।

তথ্যনির্দেশ

১ ১৫৩৮ সালে সম্রাট হুমায়ূন বাংলার সমকালীন শাসক শেরখানকে পরাজিত করে রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। অতঃপর তিনি জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে (১৫৩৮-১৫৩৯) বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে গৌড়ের নামকরণ করেছিলেন জান্নাতাবাদ (স্বর্গীয় শহর)। দেখুন: Ghulam Hussain Salim, *Riyazu-s-Salatin* (Eng. Translation), (Delhi: Idarahi Adabiyati, 1975), p. 142; Abul Fazal, *Akbarnama* (Eng. tran), vol. 1 (Calcutta: Asiatic Society, 1992), p. 34; C. Stewart, *History of Bengal* (Calcutta: The Bangabasi Office, 1910), p. 147

২ A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961) p. 176, fig-16; A. B. M. Hussian (ed.), *Architecture : A Cultural Survey Series*-2 (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2012), p. 266

৩ G. Michell (ed.), *The Islamic Heritage of Bengal* (Paris: UNESCO, 1984), pp. 41 & 113

৪ M. A. Bari, *Khalifatabad : A Study of Its History and Monuments* (Mphil. Thesis, Rajshahi University, 1980), p. 89; A. U. Pope, *Persian Architecture* (New York: George Braziller, 1965), p. 71; Andre Godard, *The Art of Iran* (London: George Allen & Unwin Ltd, 1965), p. 183, fig-157 & 167; Barbara Brend, *Islamic Art* (London: British Museum Press, 1991), p. 73

৫ S. M. Hasan, *Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal* (Dacca: University Press Ltd., 1979), p. 177; মোহাম্মদ শামসুল হক, "ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের অবস্থান", *আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১), পৃ. ২৯৪।

৬ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, pp. 170 & 174 (according to the ground plan).

৭ A. H. Dani, *op. cit.*, p.177; *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, June,1885, p. 105.

৮ Sirajul Islam (ed.), *Banglapedia*, vol. 2 (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2003), p. 67.

৯ M. A. Bari, *Mughal Mosque Types in Bangladesh : Origin and Development* (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1989), pp. 348-50

১০ W. Haig (ed.), *The Cambridge History of India*, vol. III (Delhi: Chand & Co. 1958), pp. 592-93; P. Brown, *Indian Architecture (Islamic Period)*, (Bombay: Taraporevala Sons & Co. Ltd., 1975), p. 24. pl. XI, no.1; R. Nath, *History of Sultanate Architecture* (New Delhi: Abhinav Publications, 1978), p. 70, fig-37

১১ M. A. Bari, *op. cit.*, pp. 351 & 352; A. Papadopoulo, *Islam and Muslim Art* (London: Thames & Hudson, 1980), pp. 263-64, fig-903; S. M. Hasan, *op. cit.*, p. 43, fn-21

১২ D. Hill, *Islamic Architecture in North Africa* (London: Faber & Faber Ltd., 1976), p. 100; O. Aslanapa, *Turkish Art and Architecture* (London: Faber & Faber Ltd., 1971), pp. 114-15; K. A. C. Creswell, *The Muslim Architecture in Egypt*, vol. 1 (Oxford: The Clarendon Press, 1951), pp. 11-15

১৩ A. Papadopoulo, *op. cit.*, pp. 263-64 & 504, fig-1114; B. Unsal, *Turkish Islamic Architecture* (London: Alec Tiranti, 1959), pp. 20-21, fig-4(b); A. Kuran, *The Mosque in Early Ottoman Architecture* (Chicago: University Press, 1968), p. 154, fig-167; O. Aslanapa, *op. cit.*, p. 544

১৪ P. Brown, *op. cit.*, pl. 86, fig-1 & 2; R. Nath, *op. cit.*, p. 109; S. Grover, *Architecture of India : Islamic* (727-1707), (New Delhi: Vikas Publishing House, 1981), p. 146, fig-6.09.

১৫ Andre Godard, *p. cit.*, p. 285

১৬ *Banglapedia*, vol. 7, p. 385

১৭ M. A. Bari, *op. cit.*, p. 142, fig-15; p. 204, fig-44; p. 224, fig-50

১৮ G. Michell (ed.), *Architecture of the Islamic World* (London: Thames & Hudson, 1978), p. 269; P. Brown, *op. cit.*, p. 30

১৯ Samsuddin Ahmed, *Inscriptions of Bengal,* vol. IV (Rajshahi: Varendra Research Society, 1960), pp. 259-60

২০ *Architecture : Series*-2, p. 266

২১ Samsuddin Ahmed, *op. cit.*, pp. 261-66; Abul Fazal, *Ain-i-Akbari*, vol. I (Eng. Tr. by H. Blochman), (Calcutta: Royal Asiatic Society, 1873), p. 621; *Epigraphia Indo-Muslemica*, 1937-38, p. 19; *Epigraphia Indica*, vol. II, pp. 288-89; *Protected Monuments and Mounds of Bangladesh* (Dacca: Department of Archaeology, 1975), p. 1. তুর্কিদের প্রদেয় ঘোড়াঘাট অঞ্চলের জায়গীরদারদের উপাধি ছিল কাকশাল।

২২ R. E. M. Wheeler, *Five Thousand Year of Pakistan* (London: Royal India and Pakistan Society, 1950), p. 127

২৩ *Architecture : Series*-2, p. 248

২৪ M. A. Bari, *op. cit.*, p. 163

২৫ *Architecture : Series*-2, p. 267

২৬ M. A. Bari, *op. cit.*, p. 113

২৭ A. H. Dani, *Dacca : A Record of Its Changing Fortunes* (Dacca: Mrs. S. S. Dani, 1962), pp. 101-02

২৮ M. A. Bari, *op. cit.*, p. Appendix-B, p. 367

২৯ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, p.39; *Banglapedia*, vol. 12, p. 409

৩০ C. Stephen, *Archaeology and Monumental Remains of Delhi* (Allahabad: Kitab Mahal, 1967), pp. 111-12; R. Nath, *op. cit*, pp. 49, 89

৩১ Perween Hasan, *Sultans and Mosques* (London: I.B. TAURIS, 2007), p. 201

৩২ A. Husain, 'Alamgir Mosque at Walipur', *The Concept of Pakistan*, November, 1965, pp. 26-27

৩৩ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, p. 91

৩৪ M. A. Bari, *op. cit.*, p. 128

৩৫ C. Stephen, *op. cit.*, pp. 111-12; মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলের মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ* (রাজশাহী: প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, রা.বি, ১৯৯৬), পৃ. ৭৯, রেখাচিত্র-১৯; *Architecture : Series*-2, p. 294; G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, p. 39

৩৬ *Banglapedia,* vol. 14, p. 383

৩৭ M. A. Bari, *op. cit.*, p. 110

৩৮ A. H. Dani, *op. cit.,* p.169

৩৯ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage, op. cit.*, p. 40; *Bangladesh Archaeology,* vol. I (Dacca: Department of Archaeology & Museums, 1979), p. 103

৪০ Sultan Ahmad, *Archaeology of the Muslim Towns of Gujrat* (Phd Thesis, M.S. University of Boroda, 1982), pp. 140-43, pl. 4.32; A. B. M. Husain, "Mosque Plan - An Outline History", *Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* vol. VI, Rajshahi, 1982-83, p. 9; M. A. Bari, *op. cit.*, p. 77; G. Goodwin, *A History of Ottoman Architecture* (London: Thames & Hudson, 1971), p. 56 (according to the ground plan).

৪১ এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, *সরকার ঘোড়াঘাট : ইতিহাস ও স্থাপত্যকীর্তি* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২৩), পৃ. ২৩৪

৪২ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, p. 40; A. H. Dani, *op. cit.*, pp. 210-12

৪৩ A. B. M. Husain (ed.), *Gawr-Lakhnawti* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997), pp. 67-75

৪৪ এম. আর. আলী তাইস, *তারিখ-ই-ঢাকা* (বাংলা অনূদিত), (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃ. ২২৬-২৭

৪৫ O. Aslanapa, *op. cit.*, pp. 213-15, plan-45; G. Goodwin, *op. cit.*, p. 169, plan-163

৪৬ M. Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* vol. IB (Dhaka: Islamic Foundation of Bangladesh, 2003), p. 770
৪৭ *Banglapedia*, vol. 13, p. 191
৪৮ M. A. Bari, *op. cit.*, pp. 284-85
৪৯ *Architecture : Series*-2, p. 294
৫০ S. A. Hasan, *Notes on the Antiquities of Dacca* (Dacca: University Press Ltd., 1904), p. 11.
৫১ A. B. M. Husain, *Fathpur-Sikri and Its Architecture* (Dacca: Bureau of National Reconstruction, 1970), p.92
৫২ S. A. Hasan, *Antiquities of Dacca*, *op. cit.*, pp. 30-32; M. A. Karim, 'Some Inscriptions of Dacca', *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, vol. XII, 1967, pp. 296-99
৫৩ M. A. Bari, *Khalifatabad*, *op. cit.*, pp. 218-21
৫৪ O. Aslanapa, *op. cit.*, p. 464; A. H. Dani, *op. cit.*, p. 181; S. M. Hasan, *op. cit.*, p. 179; Barbara Brend, *Islamic Art* (London: British Museum Press, 1991), p. 209; P. Brown, *op. cit.*, pl. LI
৫৫ কাজী মো: মোস্তাফিজুর রহমান, "বাংলার মন্দির স্থাপত্যের ক্রমবিকাশ : একটি সমীক্ষা", *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্যাডিজ*, খণ্ড ৩১, ২০০৩, পৃ. ১৮৫
৫৬ *Architecture : Series*-2, p. 268
৫৭ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, p. 106
৫৮ এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২
৫৯ A. U. Pope, *op. cit.*, p. 78; Marks Hattsein (ed.), *Islam : Art and Architecture*, (German: h.f.ullaman publishing GmbH, 2013), pp. 109 & 114; O. Aslanapa, *op. cit.*, pp. 109 & 114
৬০ A. H. Dani, *op. cit.*, p. 15
৬১ *Encyclopedia Brittanica*, vol. 2 (London: William Benton Publisher, 1973), p. 283, fig-6
৬২ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, pp. 106-07
৬৩ Ebba Koch, *Mughal Architecture* (Germany: Prestel-Verlag, 1991), p. 65
৬৪ *Architecture : Series*-2, p. 269
৬৫ A. B. M. Husain, *op. cit.*, p. 104; G. Michell (ed.), *op. cit.*, p. 271

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.002

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতা : কৃষক-শ্রমিক প্রসঙ্গ

ইসমাইল সাদী*

সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময় বাংলা কবিতার গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন শাসনে-ত্রাসনে ইতিহাসের বাঁকবদল কবিতার গতিপথকেও নতুন শপথে দীক্ষিত করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা কবিতার মহাসড়কে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়, আঙ্গিক, শিল্পচিন্তা, স্বকীয় চিত্রকল্প-ভাবনা এবং শব্দ-ছন্দের নবমাত্রিক মর্যাদা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর শাসক হিসেবে আবির্ভাবে সমাজে-সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কবিগণও। বর্তমানকালের মতো প্রাচীন ও মধ্যযুগেও কৃষক-শ্রমিকই ছিল খাদ্য উৎপাদন ও রাজস্ব বৃদ্ধির মূল কারিগর। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অসহায়ত্ব বিলোপ কিংবা অধিকার-ভাবনা নিয়ে উদাসীন থেকেছেন বেশির ভাগ শাসক। ফলে তাদের অর্থনৈতিক সংকট বেড়েছে বইকি কমেনি। যেহেতু একসময় খাদ্যের জোগানদাতা হিসেবে কৃষক-শ্রমিকের ওপর অবিকল্প নির্ভরতা ছিল, সেহেতু ধরে নেয়া হয়, কবিদের কবিতাশিল্পে বিচিত্র বিষয়, উপাদান ও প্রবণতার পাশাপাশি কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ উপাদান এবং বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তারাও কি তৎকালীন কৃষক-শ্রমিককে দেখেছেন শাসকের চোখ দিয়ে? নাকি তাদের কাব্য রচনায় প্রভাব ফেলেছে কৃষক-শ্রমিক কিংবা অন্যান্য পেশাজীবীদের জীবনচিত্র? এসব জিজ্ঞাসার মীমাংসা-সন্ধানই এ-প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

চাবি শব্দ: প্রাচীন ও মধ্যযুগ, বাংলা কবিতা, কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী।

প্রাচীনকালে পৃথিবীর বড় বড় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে। বিশেষ করে চাষবাস, পশুপালন, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি প্রকৃতি ও আবহাওয়া-নির্ভর শ্রমসাধ্য কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। নদীর প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষত মাছ মানুষের খাদ্যতালিকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর পাশাপাশি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নদীবন্দর কিংবা জলপথ ছিল মানুষের যোগাযোগ বা যাতায়াতের অপরিহার্য অবলম্বন। নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলোতে কৃষিই ছিল মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও সাধারণ এই প্রবণতা বিরাজমান।[১] নদীকে কেন্দ্র করে কেবল গ্রামীণ সভ্যতা নয়, নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠার দৃষ্টান্তও প্রচুর। অর্থাৎ কৃষিকেন্দ্রিক শ্রমবিকাশ কিংবা আধুনিক সময়ে শিল্পকেন্দ্রিক শ্রমের বিস্তার— সবই ঘটেছে নদী-তীরবর্তী এলাকাকে ঘিরে। প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, সিন্ধুসভ্যতা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত উন্নত সভ্যতার পত্তন হয়েছিল সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের প্রধান নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ নদীমাতৃক। নিচু সমতল ভূমির কারণে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষির পক্ষে অনুকূল।[২]

* সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ নামক যে ভূখণ্ডটি ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে, তার অবস্থানও ব্যতিক্রম নয়। কেননা, 'অখণ্ড বাঙলা গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা আর তারই শতশত শাখা-নদীর অবদান। সভ্যতা, সংস্কৃতি, জনপদ, রাষ্ট্রকেন্দ্র, বিদ্যাপীঠ—সবকিছুই গড়ে উঠেছে এ-সকল নদনদীর তীরে। রাঢ়-পুণ্ড্র আর বঙ্গজনপদের মানসিক, রাষ্ট্রিক ও ইতিহাস প্রবাহের বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য (sic) এবং পরিণতির প্রশ্নে গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা অমোঘ ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সক্রিয়।'[৩] তাই জাতিগত স্বকীয়তা, সাংস্কৃতিক বিকাশ, জীবনযাপনের ধরন, বহুবিধ পেশাজীবনের চারিত্র্য নির্ধারিত হয়েছে নদী-তীরবর্তী এসব শহরকে ঘিরে। বর্তমান বাংলাদেশ অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তর অংশ এবং পৃথিবীর বৃহত্তর বদ্বীপগুলোর একটি। বাংলাদেশ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রের মতো নদীবিধৌত পলিমাটিতে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে ওরাওঁ, সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া, চাকমা, ম্রো প্রভৃতি আদিবাসীর[৪] বসবাস। এ ছাড়াও বসবাস করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাঙালি জনগোষ্ঠীর লোকজন।[৫]

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন ধারায় এবং আধুনিক সাহিত্যে মানুষের বৃত্তি তথা শ্রমিকশ্রেণির পেশা এবং তাদের জীবনের নানা সংক্ষিপ্ত অনুষঙ্গ মাত্রাগত তারতম্যে ভিন্নভাবে রূপায়িত হয়েছে। তবে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কাব্য-উপাদানে সুনির্দিষ্টভাবে একটি বা দুটি পেশাজীবন নয়, বিভিন্ন পেশাজীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিম্নে উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে জানা যায়:

> রাজা, রাজবংশ ও রাজধানীর উত্থানপতন যতই হোক না কেন বাঙলার সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন সে-অনুপাতে তেমন একটা হয়নি। কার্ল মার্কস এশিয়াটিক সমাজের যুগব্যাপী নিশ্চলতার কথা বলেছেন। সেই কথা বাংলার সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। একই পদ্ধতির চাষাবাদ, একই রকম কৃষি-যন্ত্রপাতি, একই পদ্ধতির মাছ-ধরার ব্যবস্থা, একই ধরনের পেশাভিত্তিক গ্রামীণ বন্দোবস্ত দীর্ঘদিন চলে আসছে। বাঙালি কৃষকের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঋতুচক্রে বাঁধা। প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য এখানে পাশাপাশি অবস্থান করেছে। অপচয় ও কৃচ্ছ্রতা কোনোটাই চোখ এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। হাজার বছর আগে চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যরা যখন পদ রচনা করেছেন, তখন 'হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী' বলে দুঃখ-জাগানিয়া শ্লোক তৈরি করেছেন।[৬]

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যার কোনো পদে পেশা হিসেবে কৃষিজীবীর সরাসরি উল্লেখ না পাওয়া গেলেও কৃষিজাত খাবার হিসেবে ভাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাতের উপস্থিতি মানেই ধান-চাল-কৃষি-চাষবাস-কৃষক ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কারণ, গুপ্তযুগ (স্থিতিকাল আনু. খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষ থেকে চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধ), পালযুগ (আনু. ৭৫৬-১১০০), সেনযুগে (আনু. ১০৯৭-১২০৪) বাংলায় কৃষিকে কেন্দ্রকরেই বিভিন্ন শাসনকাঠামো গড়ে উঠেছিল। শাসন পরিচালনার কেন্দ্রীয় ভাবনায় থাকত কৃষি। আর চাষাবাদ হতো ধানসহ বিভিন্ন খাদ্যশস্যের। অথচ চর্যাপদ শুধু নয়, সমাজে কৃষি ও কৃষকের সরাসরি প্রভাব সত্ত্বেও মধ্যযুগব্যাপী বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের অনেক নিদর্শনেই সরাসরি কৃষি বা কৃষক প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়নি। ইতিহাসবিদ গোপাল হালদার লিখেছেন:

> বাঙলার যে সামাজিক অবস্থায় প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্য উদ্ভূত (sic) হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে সে-অবস্থার প্রামাণিক তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না।...ভারতের অন্যত্র যেমন বাঙলা দেশেও তেমনি এই পল্লীসমাজ ছিল কৃষি-প্রধান সমাজ; আর কৃষির যন্ত্রপাতি ও কৃষি-পদ্ধতি ছিল গতানুগতিক; এখনো প্রায় তা-ই রয়েছে।[৭]

কৃষিভিত্তিক জীবন, কৃষিশ্রম, চাষবাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আজকের আধুনিকতার ভিত্তি রচিত হয়েছিল। যার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়। হয়তো এই কারণেই নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্যে সেই নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন:

> প্রাচীন বাঙলার কৃষি যে ধানোৎপাদনের এক প্রধান ও প্রথম উপায় ছিল তাহার প্রমাণ লেখমালায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লেখমালাগুলিতে ক্ষেত্রকরাণ্, কর্ষকান্, কৃষকান্ ইত্যাদি কথার তো বারবার উল্লেখ আছেই। জনসাধারণ যে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে ক্ষেত্রকর বা কৃষকেরাও ছিল বিশেষ একটি শ্রেণী...মহত্তর ও ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদেরও দান বিক্রয়ের ব্যাপারে বিজ্ঞাপিত করিতে হইত।[৮]

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূ-গঠন বৈশিষ্ট্য, ঘন ঘন রাজধানীর পরিবর্তন ইত্যাদি এবং সামন্ত সমাজের অচলায়তন-বৈশিষ্ট্যও এই নগরায়ণ বিস্তৃত না-হওয়ার হয়তো অন্যতম কারণ। তবে ইরফান হাবিব *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস : একটি সমীক্ষা* গ্রন্থে বাংলার বাইরে নগর-সভ্যতার বিকাশের চিত্র তুলে ধরেছেন। এ-গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ শহরের নামও উল্লেখ করেছেন।[৯] চর্যাপদে কৃষি ও কৃষকের অনুপস্থিতি নিয়ে আনিসুজ্জামানের বক্তব্য ইরফান হাবিবের বিশ্লেষণের সঙ্গে অনেকাংশে সাযুজ্যপূর্ণ:

> পাণিনির সময় থেকে বাংলাদেশে নগরের স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত; টলেমির সময়ে তম্রলিপ্তি এবং য়ুয়ান চোয়াঙের সময়ে মহাস্থান সমৃদ্ধ নগর ছিল। সুতরাং চর্যাগীতিতে গ্রামের অনুল্লেখের কারণ অন্যত্র নিহিত। আমাদের বিশ্বাস, চর্যাগীতিতে গ্রামজীবনের কোনো পরিচয় নেই এবং সেজন্যই এখানে গ্রামের নাম নেওয়া হয়নি। এই ধারণা শুধু অনুমাননির্ভর নয়। লক্ষ করা যাবে যে, চর্যাগানে কৃষির উল্লেখ প্রায় নেই বললে চলে।...টিলায় বসবাসকারী ব্যাধদের জীবনচিত্র বাদ দিলে চর্যাগীতির সবটাই নগরজীবনের চিত্র। অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ডোমদের বাস নগরের বাইরে হলেও নগর-সন্নিহিত স্থানেই।[১০]

আমাদের অন্বিষ্ট প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতার উপাদান ও শব্দবন্ধে কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ কীভাবে বিধৃত হয়েছে, তা অনুসন্ধান করা।

চর্যাকারদের রচিত পদ বা সাধন-গীতির মধ্যে ওই সময়ের (আনু. ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ) শ্রমজীবী মানুষের কথা বিধৃত হয়েছে। সে সময়ে এই অঞ্চলের সাধারণ বা খেটেখাওয়া অধিবাসীদের সংযুক্তি ছিল গুটিকয়েক পেশার সঙ্গে। চর্যাপদের সমাজচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁত তৈরি, চাঙারি বোনা, মাছ আহরণ, নৌকা চালানো, মদ চোলাই করা[১১] প্রভৃতি বৃত্তিকে ঘিরে আবর্তিত হতো মানুষের দৈনন্দিন জীবন। এমনকি ডোমনির[১২] মতো শ্রমজীবী মানুষের কথাও চর্যাকারদের লেখায় এসেছে।

এরই মাঝে সমাজজীবনের কিছু চিহ্ন বা সংকেত পাওয়া যায়। তাঁদের সেই সৃজন-প্রয়াসের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন পেশাজীবনের কথা উঠে আসে; চিত্রিত হয় সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার বাস্তবতা। সমাজের নিচু শ্রেণির পেশাজীবীর সঙ্গে সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের পার্থক্য, তাদের বাসস্থান যে নগর থেকে দূরবর্তী এলাকায় প্রভৃতি বিষয় উল্লেখের পাশাপাশি এই সমাজসত্যও উল্লেখিত হয়েছে যে, 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।/ ছোই ছোই জাসি বাম্হণ নাড়িআ।।'[১৩] অর্থাৎ ডোমজাতীয় পেশাজীবী নারী অস্পৃশ্য, তাই নগরের বাইরে তাদের বসবাস।

ডোম্বি আসা-যাওয়া করত নৌকায় এবং বাঁশের তাঁত, চুপড়ি ও চাঙাড়ি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত। 'রূপমুগ্ধ কামান্ধ' ব্রাহ্মণ তাদের কুঁড়েঘরের পাশে ঘোরাঘুরি করে। ডোমদের প্রধান পেশা ছিল চাঙাড়ি বোনা, নৌকা চালানো। আর তাদের প্রধান খাবার ছিল ভাত। অবশ্য অতি প্রাচীনকাল থেকে ভাতই এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এর বাইরে নিম্নে উদ্ধৃত চর্যায় তৎকালীন সমাজের একটা বিশেষ চিত্রও উঠে আসে, যা বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গেও সাদৃশ্যপূর্ণ:

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।। [১৪]

চর্যাকার শবরপা 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহি বসই সবরী বালী।/ মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী'[১৫] পঙ্‌ক্তিতে 'সবরী বালী' বলে এক শ্রেণির পেশাজীবী প্রতিনিধির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'শবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ ব্যাধ; যাদের পেশা ছিল পশু শিকার করা। তারা মূলত উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিল। যাযাবর জীবন ছিল তাদের। আদিকালে বেশির ভাগ সময় শিকারই ছিল তাদের প্রধান পেশা। অনেকের মতে, বর্তমানে আমাদের সমাজের যে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীটি বেদে বা বাদিয়া বলে পরিচিত, যাদের প্রধান পেশা সাপ ধরা, তাবিজ-কবজ বিক্রি করা, পাখি শিকার করা বা সাপের খেলা দেখিয়ে উপার্জন করা, তারাই সম্ভবত চর্যাপদের শবর-শবরী। *বাংলাপিডিয়ার* বৈদ্যুতিন সংস্করণে 'শবর' নামক ভুক্তিতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> ব্রিটিশ শাসনের মাঝামাঝি শবররা উত্তর ভারত থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তারা যাযাবর ও শিকারী ছিল। পরে তারা চা শ্রমিক হিসাবে মৌলভীবাজার জেলার হরিণছড়া, রাজঘাট ও নন্দরাণী এলাকায় বসবাস করতে থাকে। বর্তমানে এ দেশে শবরদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার।[১৬]

চর্যাকাররা সেই সময়ের সমাজের যেসব পেশাজীবীর প্রসঙ্গ তাঁদের সৃষ্ট পদগুলোতে উপস্থাপন করেছেন, তাতে তাদের সামাজিক অবস্থান বা পেশাজীবন কেমন ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়।

নদীমাতৃক এই অঞ্চলে নৌকা পরিচালনা বা নৌপথকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির শ্রমজীবী মানুষের জীবন আবর্তিত হতো। কেননা, বিভিন্ন পদে সিদ্ধাচার্যরা নৌকা, দাঁড়, কাছি সেঁউতি, ভেলা, চকা, নৌবন্দর, নৌবাণিজ্য, পারাপার, পাটনি প্রভৃতি নৌ-সংশ্লিষ্ট শব্দ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। নৌবন্দর, বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে গোপাল হালদারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> শুধু কৃষক নয়,...বাঙলায় বণিক শ্রেণীও উদ্ভূত হচ্ছিল, ছোট ছোট নদী-বন্দরও ছিল। অর্থাৎ কৃষি ও পণ্য উৎপাদন খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে; এমন নয় কৃষি নেই, বণিকই বাংলা দেশে প্রথম পত্তন স্থাপন করেছে। সহজেই বোঝা যায়, এরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজে বণিক-শক্তির বিকাশের সুযোগ আসলে বেশি ছিল না।[১৭]

চর্যাপদ বিশ্লেষণে সমাজের বর্ণবিন্যাস অনুযায়ী যেসব জনগোষ্ঠীর পরিচয় বেশি পাওয়া যায়, তারা ছিল সেই সময়ের সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী। সেই কারণেই চর্যাগীতিগুলোতে তন্তুবায়, শৌণ্ডিক, ডোম, চণ্ডাল, শবর, কাপালিক, কামলি, চণ্ডাল, শুঁড়ি, ব্যাধ, মাঝি, তাঁতি, ধুনুরি, কাঠুরে, জেলে, পতিতা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায় ও জীবিকার মানুষের উল্লেখ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে।[১৮] আর গৃহস্থ জীবনে নিত্যব্যবহার্য উপকরণের মধ্যে খাট, পিঁড়ি,

ঘড়া, হাঁড়ি প্রভৃতি এবং খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পাওয়া যায় ভাত, মাংস, দুধ, মাখন, লাউ, তেঁতুল, পান প্রভৃতি। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গাভি ও বলদের কথা উল্লেখ আছে।[১৯]

তবে চর্যাপদ তৎকালীন সমাজের পুরো শ্রমজীবনের চিত্রকে ধারণ করে কি না কিংবা চর্যাকারদের কৃষি বা কৃষিকাজে সম্পৃক্ত মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব ছিল কি না অথবা কৃষিজীবীদের কোনো কারণে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে কি না, কিংবা অন্য কোনো পেশাজীবীর কথা বাদ পড়েছে কি না, সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। তবে সেই সময়ে কৃষি ও কৃষকের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। কেননা, ভাত, চাল, ধান, কৃষক, কৃষিজীবন একে অপরের পরিপূরক। যেহেতু চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন, তাই তাতে বাঙালি সমাজের কৃষিভিত্তিক বৃত্তিকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতকেও অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবেই মেনে নিতে হয়।

দুই

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের পর প্রাচীনত্বের দিক থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যকে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। সময়ের বিস্তৃতি বা দূরত্বের দিক থেকে চর্যাপদ রচনার সময়সীমার শেষ থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য রচনার সম্ভাব্য সময়ের পার্থক্য দেড় শ থেকে আড়াই শ বছর (১৩৫০-১৪৫০ খ্রি.)। কিন্তু তারও আগে খনার বচনের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। খনা ছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্রে নিপুণা ও বচন রচয়িতা বিদুষী নারী। খনার প্রকৃত নাম লীলাবতী বলে জানা যায়। তাঁকে নিয়ে রয়েছে অনেক কিংবদন্তি।[২০] তাঁর আবির্ভাব অনুমান করা হয় ৮০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।[২১] খনা ও তাঁর বচনের ভাষা সম্পর্কে নীহারঞ্জন রায় বলেছেন:

> ডাক ও খনার বচনগুলিও প্রাচীন বাঙলার কৃষিপ্রধান সমাজের অন্যতম প্রমাণ। যে ভাষায় এখন আমরা এই বচনগুলি পাই তাহা অর্বাচীন, সন্দেহ নাই। এগুলি ছিল জনসাধারণের মুখে মুখে বংশপরম্পরায়। ভাষার অদলবদল হইয়া বর্তমানে তাহা যে রূপ লইয়াছে তাহা মধ্যযুগীয়। তবু এই বচনগুলি যে খুব প্রাচীন স্মৃতি বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ ঋতুতে কী শস্য বুনিতে হইবে, কোন্ শস্যের জন্য কী প্রকার ভূমি, কী পরিমাণের বারিপাত প্রয়োজন, বারিপাত ও খরাতপ নির্দেশ, বিভিন্ন শস্যের নাম ও রূপ...ইত্যাদি নানা খবর এই বচনগুলিতে পাওয়া যায়।[২২]

খনার বচনগুলোতে কৃষি ও কৃষক সম্পর্কে, চাষবাস ও ফসলাদি সম্পর্কে, জলবায়ু, আবহাওয়া, এমনকি যাপিত জীবন, ঘরবাড়ি নির্মাণ ও শ্রমজীবন সম্পর্কে যেসব উক্তি পাওয়া যায়, তা আজও বাঙালি সমাজের গ্রামীণ জনসাধারণ অনুসরণ করে আসছে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে।[২৩]

তিন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনির সঙ্গে পুরাণের কাহিনির মিল খোঁজেন অনেক সমালোচক। আবার অনেক সমালোচকের মতে, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর কাহিনি যতটা না পৌরাণিক, তার চেয়ে বেশি লৌকিক, তত বেশি সামাজিক। আহমদ শরীফ (১৯২১-৯৯) বলেছেন, 'এটি লোকগীতি-নাট্য-ভিত্তিক রচনা—বড় জোর রতি সম্ভোগ কাব্য। কথকতাভিত্তিক কাঠামো রয়েছে বলেই এতে মাত্র কয়েক দিনের কয়েকটি ঘটনাই বিবৃত।[২৪]

মূলত রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এর কাহিনি এগিয়ে গেছে; উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজচিত্র এবং কয়েক ধরনের শ্রমজীবী মানুষের পরিচয়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের চরিত্রগুলো মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের, যাদের বসবাস মূলত নগর থেকে দূরবর্তী এলাকায়। স্বভাবতই তা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে সমাজজীবন বিধৃত হয়েছে, তার দুটি ধারা রয়েছে। এক. পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা; দুই. লোকায়ত সংস্কৃতির সমাজসংস্কার—যেখানে গোপপল্লি প্রধান হয়ে উঠলেও শ্রমনির্ভর অন্যান্য গোষ্ঠীরও উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।[২৫]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর শ্রমজীবী হিসেবে এ-কাব্যে কুমার, তেলী, নাপিত, বৈদ্য, দৈবজ্ঞ, বণিক, ঐন্দ্রজালিক, সাপুড়ে, মাঝি, বাগদি, ব্যাধ, কাঠুরিয়া, যোগিনী, ডোম প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট পেশাজীবীর কথা জানা যায়। পেশাভিত্তিক বর্ণগোষ্ঠীর মধ্যে কাব্যে উঠে আসা অস্পৃশ্যতাবোধের চিত্রও লক্ষণীয়; যা চর্যাপদে ছিল নিচুস্তরের প্রতি উঁচুস্তরের। এগুলো হয়তো তৎকালীন সমাজের লোকবিশ্বাস। যেখানে দুটি নিম্নবর্ণ সম্প্রদায়বিশেষের পেশা অন্য বর্ণের দ্বারা উপেক্ষিত বা নিচু বলে ভাবা হয়েছে। যেমন: তেলীর তেল বিক্রি করার জন্যে হাঁক শোনা রাধার কাছে যাত্রাকালের অশুভ সংকেত বলে মনে হয়েছে। অথচ রাধা ছিলেন একজন গোপবধূ; হাটে-গঞ্জে দুগ্ধজাত পসরার বিক্রয়িত্রী, নিতান্তই এক শ্রমজীবী।[২৬]

উল্লেখ্য, চর্যাপদের শ্রমজীবী মানুষের কাজের ধরনের মধ্যে যেমন সরাসরি কৃষক বা কৃষিজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না, তেমনি *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যেও কৃষিজীবী বর্গের সরাসরি উপস্থিতি পাওয়া যায় না। তবে রাধার দুধ-দই বিক্রি করা আর কৃষ্ণকে রাখালরূপে উপস্থাপন এবং তার গরু চরানোর মধ্যে কৃষকজীবনের সামান্য সংকেত পাওয়া যায়। অথচ ইতিহাস ভিন্নকথা বলে। সুলতানী আমলের কৃষকদের ভূমিকর ও জীবনধারণ প্রসঙ্গে ইরফান হাবিব লিখেছেন:

> সুলতানী আমলের প্রথম যুগে অভিবাসন ও দাসত্ব শহরাঞ্চলের শিল্পের বিকাশ ঘটালেও শহুরে জনগণ যার ওপর প্রধানত ভিত্তি করত তা আসত গ্রামাঞ্চল থেকে সুলতানী শাসক শ্রেণীকর্তৃক আহরিত রাজস্বের বৃদ্ধি থেকে।...এই আদায়ের মুখ্য রূপটি ছিল খরাজ, যা একধরনের ভূমিকর হিসাবে কৃষকের জীবনধারণে ন্যূনতম চাহিদার অতিরিক্ত উদ্বৃত্তের সিংহভাগের উপর রাজার দাবী সূচিত করত।[২৭]

চার

মধ্যযুগের আদি নিদর্শন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর সমসাময়িক কাব্য শাহ মুহম্মদ সগীর (আনু. ১৪-১৫ শতক) রচিত *ইউসুফ জোলেখা*। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০) আমলে আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে এটি রচিত। ইউসুফ-জোলেখাকে নিয়ে কোরআনের কাহিনী অবলম্বনে ফারসি, এমনকি বাংলাতেও বিভিন্ন সময়ে কাব্য রচিত হয়েছে। সগীরের কাব্যের মূল আখ্যান অভিন্ন হলেও এখানে বড় হয়ে উঠেছে মানবপ্রেম। বলা যায়, 'কাব্যটিতে কোন বিদেশী আবহ নাই বলিলেও চলে। বাংলার পরিবেশ এই কাব্যের রক্তমাংস ও বাংলার আবহ ইহার প্রাণ বলিয়া

কাব্যখানি পাঠ করিতে মনেই হয় না যে, ইহা কোন বিদেশীর পুস্তকের অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ।'[২৮] আর সে-কারণেই কাব্যে বর্ণিত দুর্ভিক্ষের সময় মিসর-রাজ শস্যের ভাণ্ডার খুলে দিলে অন্যান্য শস্যের নাম সরাসরি না এলেও বাংলার প্রধান খাদ্যশস্য ধানের প্রসঙ্গ আসে। এমনকি ইউসুফ তাঁর আপন ভাইকে কাছে রাখতে যে কৌশলের আশ্রয় নেন, সে-বিষয়ে আগে থেকে তাকে বলে রাখেন:

ভাই সব সঙ্গে জাইতে তোহ্মাক ন দিমু।
সঙ্কেত সন্ধান করি তোহ্মাক রাখিমু।।
কনকের এক কাটা ধান্য মাপি দিতে।
তোহ্মার গুণির মাঝে রাখিব গোপতে।।[২৯]

ইউসুফ-জোলেখা কাব্যে 'বাংলার আবহ ইহার প্রাণ বলিয়া'ই মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য ধানের প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলার কৃষিজাত প্রধান খাদ্যশস্য ধানের উপস্থিতি কৃষিকেন্দ্রিক শ্রমজীবনেরই ইঙ্গিত দেয়। প্রাচীনত্বের দিক থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও *ইউসুফ-জোলেখা*র অব্যবহিত পর মধ্যযুগের সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্য ধারার আখ্যানকাব্যসমূহ। সমগ্র মধ্যযুগে দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। মধ্যযুগে কেমন ছিল মানুষের শ্রমজীবন, সে-সম্পর্কে পূর্বাপর ধারণা পেতে এবং সেই সময়ের সমাজ ও সমাজের মানুষের জীবন ও পেশা সম্পর্কে জানতে মধ্যযুগে অব্যাহতভাবে চর্চিত মঙ্গলকাব্যের শরণ নেয়ার বিকল্প নেই। এ-সময়ে দেখা যায়, কৃষিকাজ মানুষের অন্যতম পেশা হিসেবে গণ্য হলেও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের জীবনমান ভালো ছিল না। কারণ এ সময় ভূমিকর, বাসস্থান, কৃষিপণ্য, এমনকি গবাদি পশুর ওপরও কর চাপিয়েছিলেন শাসকগণ। এমন চাপে পড়ে কৃষকেরা কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। আর ব্যবসায়ীরা তা শহরে সরবরাহ করেছেন।[৩০] এর বিকল্প হিসেবে শিল্প-কারাখানায় যুক্ত থেকে মানুষের শ্রম বিনিয়োগ করার কোনো সুযোগ ছিল বলে মনে হয় না। বরং ধর্মীয় অবস্থান বা ধর্ম দ্বারা নির্ধারিত সামাজিক স্তর অনুযায়ী পেশাগত পার্থক্য এ সময় প্রকট ছিল। যে-কারণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা হতো পেশা-পরিচয়ের মাধ্যমেই। যারা ব্রাহ্মণ, তাদের কাজের ধরনের সঙ্গে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের কাজ ছিল আলাদা। অর্থাৎ বর্ণ যেমন পেশা নির্ধারণ করে দিত, তেমনি পেশা দিয়েও সেই সময় মানুষের বর্ণ বা 'জাত' চেনা যেত। সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই শ্রেণিকরণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ওই সময়ের মানুষের পেশা-পরিচয়।[৩১]

বাংলা মঙ্গলকাব্যেই মধ্যযুগের সমাজ ও মানুষের অবস্থার কথা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য ধারার প্রথম রচনা বিজয় গুপ্তের (আনু. পঞ্চদশ শতাব্দী) *মনসামঙ্গল* (১৪৯৪) কাব্য *পদ্মাপুরাণ* নামেও পরিচিত। এতে উল্লেখ রয়েছে সমাজের উচ্চ-নিম্ন বর্ণের নানা জাতির মানুষের পরিচয়। কৃষকের উপস্থিতি ছিল অবশ্যম্ভাবী। এ সময় জমিদার শ্রেণি যেমন ছিল, তেমনি ছিল কৃষক শ্রেণি। তাই 'বাংলা দেশে অপরের জমিতে চাষ করে এমন কৃষকের কথা ফারসি দলিলেও পাওয়া যায়। অনেকে গ্রামের সম্পন্ন চাষীদের দ্বারা নিয়োজিত হতো। তার প্রমাণ আছে পদ্মা-

পুরাণ-এ। সেখানে চাঁদ সদাগর মজুরের কাজ করেছিল এবং নিয়োগকর্তা কিষাণ লাগিয়ে চাষ করাত।'[৩২] যেমন:

ক্ষেতে আসিয়া চাষা ধরিলেক তারে।
ক্রোধ করি তারে লাথি চাপড় মারে।
গৃহস্থেরে বলে চান্দ মের নারে ভাই।
তোমার বাপের পুণ্যে কলাই শাক খাই।[৩৩]

বিভিন্ন পেশার শত শত লোকের উপস্থিতি দেখা যায় বেহুলার 'বিরহযাত্রা'র সময়ে। এর বাইরে মনসামঙ্গল কাব্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মুসলমান, মোল্লা, কাজি, জোলা, ডোম-ডোমনী, দাসী, বাদী, চাষি, নাপিত, ওঝা, গোয়ালা, ধোপা, যুগী, কামার, কুমার, বাজিকর, ইত্যাদি শ্রেণির মানুষের বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঁচ

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (আনু. ১৫৪০-১৬০০) রচিত মধ্যযুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য নিদর্শন *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের সব চরিত্রই সাধারণ। তারা আজকের সমাজের সাধারণ মানুষকেও প্রতিনিধিত্ব করে। *চণ্ডীমঙ্গলের* দুটি কাহিনি; একটি কালকেতু উপাখ্যান, অন্যটি ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। (আশুতোষ; ১৯৯৮: ৪৫৯) এ-কাব্যের কাহিনি দুটি কালকেতু-ফুল্লরা এবং ধনপতি-খুল্লনা আখ্যান হিসেবে বেশি পরিচিত। *চণ্ডীমঙ্গলে* সমাজের উঁচু শ্রেণির ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের উপস্থিতি রয়েছে। এর বাইরে পেশাজীবীদের মধ্যে গোপ, তেলি, বারুই, নাপিত, মোদক, কামার, মালী, কুম্ভকার, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক, শঙ্খবণিক, সুবর্ণবণিক, কাঁসারি, সাপুড়ে, কৈবর্ত, ধীবর, ধোপা, দরজি, শিউলি, ছুতার, মাঝি, চণ্ডাল, শুঁড়ি, চামার, ডোম, যাজক, জ্যোতিষী, ময়রা, বারবণিতা প্রভৃতি শ্রমজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

এ-কাব্যে অন্যতম চরিত্র কালকেতুর মাধ্যমে গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠার কথা এসেছে। আমরা জানি, সময়টি ছিল মুঘল শাসনামলের। এ-সময় কৃষিব্যবস্থা খুব ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ছিল কৃষকদের ওপর আরোপিত করারোপের নানা পদ্ধতি। এ-সত্ত্বেও 'কৃষকদের শ্রমই ছিল মুঘলযুগের শোষকশ্রেণির বিপুল ঐশ্বর্যের উৎস। এই শ্রমজাত উদ্বৃত্ত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট আইনানুগ রাজস্বের মাধ্যমেই সংগৃহীত হতো না, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নানা ধরনের "আবওয়াব" বা বেআইনি কর। কৃষক তার সংবৎসরের শস্যের একটি বিরাট অংশ আবওয়াব মেটাবার জন্যে দিয়ে দিত। মুঘল সম্রাটরা এই আবওয়াব সংগ্রহ বারবার নিষিদ্ধ করলেও কার্যত এগুলো কোনো সময় বাতিল হয়নি।'[৩৪] সাধারণ মানুষের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী হয়তো সে-কারণেই তাঁর চরিত্র দ্বারা পরিকল্পিত নগরে এই 'আবওয়াব' বাতিল করেছিলেন। তাই কৃষকদের গুজরাট নগরে বসবাসে উৎসাহিত করতে কবি নানান সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করেছেন। এ-প্রসঙ্গে 'বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু' অংশে কবির বক্তব্য:

শুন ভায়া বুলান মণ্ডল।
সন্তাপ করিব দূর আস্যই আমার পুর
কানে দিব কনক কুন্তল।।

মনে না ভাবিবে আন মূলে তোরে দিব ধান
গরু দিব লাঙ্গল বাহনে।
যার যেবা নাহি থাকে সেই ধন দিব তাকে
কোন চিন্তা না করিহ মনে।।
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর।
হাল প্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর।।[৩৫]

এর আগে কাব্যে কৃষি বা কৃষকের উল্লেখ যেখানে ছিল সীমিত, সেখানে চণ্ডীমঙ্গলে এসে আমরা তা পাচ্ছি অত্যন্ত সাবলীল ও স্পষ্টভাবে। কৃষি ও কৃষকের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে এখানে পাওয়া যায় ধান, গরু, লাঙল, চাষের কথা। কৃষিভিত্তিক সমাজে যে ধরনের অর্থনৈতিক সংকট উপস্থিত হয়, সেগুলোর সমাধানের ইঙ্গিতও লক্ষ করা যায়। কৃষকের ধান বিক্রিতে কর কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, ব্রাহ্মণের জন্যও থাকবে বিশেষ সুবিধা। একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন এবং বিশেষত কৃষকের বিশেষায়িত সুবিধার কথা কালকেতুর গুজরাট নগরে প্রতিষ্ঠাকল্পে পাওয়া যায়।[৩৬] এ-কাব্যের বিভিন্ন অংশে খাদ্যশস্য বা খাবার-দাবারের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা যায় কৃষিজীবীর কথা।

কালকেতুর গুজরাট নগরে সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণাশ্রম বা বর্ণভেদ প্রথা অধিক ক্রিয়াশীল ছিল। এ-কাব্যের প্রধান চরিত্র কালকেতুর পেশা ছিল শিকার করা। সে-সময়ের অর্থনীতিতে এই পেশাজীবীদের উৎপাদিত কাঠ, জ্বালানি কাঠ, কাঠকয়লা, লাক্ষা, বুনো রেশন, পশুচর্ম, মধু, ভেষজ উদ্ভিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এ-সময়ের অরণ্য ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই অধিকতর সুফলা জমিগুলোকে প্রথমে কৃষির আওতায় আনা হয়েছিল।

মুঘলদের শাসনাধীন কালে রচিত *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে উঠে আসে কৃষক ও সাধারণ মানুষের সংকটের প্রসঙ্গ। এ-সময়ের কৃষক তথা সাধারণ মানুষ যে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে ছিল, তার চিত্র ইরফান হাবিবের অন্য গ্রন্থসূত্রে প্রাপ্ত ওলন্দাজ এক পর্যবেক্ষকের মন্তব্য থেকে পাওয়া যায়। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ এমনই প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে যে তাদের জীবনের ছবি বা নিখুঁত বিবরণ দিলে বলতে হয় এই জীবন শুধু এক তীব্র অভাব ও নিদারুণ দুঃখের বাসভূমি। আলোচ্যপর্বে চাষিদের সাধারণ ভোগ্য ও ব্যবহৃত জিনিসপত্রের বিবরণ দিতে গেলে সেটি আসলে কোনোমতে টিকে থাকার জন্য সম্ভাব্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় স্তরের রূপরেখা হয়ে দাঁড়াবে। তবে বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য যে ভাত-মাছ ছিল, সে বিষয়েও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়।[৩৭] নিজের ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো সাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট লাঘবের মানসেই *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের স্রষ্টা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কালকেতু চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বপ্নের নগর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের (১৭১২-১৭৬০) *অন্নদামঙ্গল* (১৭৫২) কাব্যকে বলা হয় মধ্যযুগের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ভাষাশৈলীর কাব্য। এ-কাব্যে কায়িক শ্রমভিত্তিক যেসব পেশাজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেসব হলো কুমার, পাল, ঘোষ, গোপ, নাপিত, পসারি, কৈবর্ত, ছুতার, স্বর্ণকার, শুঁড়ি, কোটাল, চূড়িদার, ডোম, মিরজাদা, বেনে, কাঁসারি, শাঁখারি, গোয়ালা, চাষা-ধোবা, চাষা-কৈবর্ত, বেদে, মাল, বাজিকর, মালাকর, রাজবংশী, পাটনি প্রভৃতির। ঈশ্বরী পাটুনী *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের খুব পরিচিত এক নাম, যিনি পেশায় ছিলেন খেয়াঘাটের মাঝি। শ্রমজীবী এই চরিত্রের একটি উক্তি এখনো জনপ্রিয় এবং বাঙালি সমাজে আজও প্রাসঙ্গিক।—

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কূলবধূ কে বট আপনি।।...
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে।।...
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।[৩৮]

এ-কাব্যের 'রন্ধন' অংশে পাওয়া যায় কৃষিপণ্য ও বিপুল খাদ্যশস্যের নাম। তাতে বোঝা যায়, তৎকালীন সমাজে কৃষি ও কৃষক ছিল অপরিহার্য অংশীদার। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যগুলোতে যে ধরনের পেশাজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে অনেক শব্দের অর্থ অভিন্ন। অনেক পেশা বিলুপ্তও হয়ে গেছে।

ছয়

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত *শিবমঙ্গল* বা *শিবায়ন* বা *শিব-সঙ্কীর্ত্তন*ও মঙ্গলকাব্য ধারার একটি কাব্য। কবির সঠিক জন্মসাল জানা যায় না। তবে কাব্য রচনায় ভাষার ব্যবহার দেখে অনুমান করা যায় তিনি ভারতচন্দ্রের সমসময়ের কবি। *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের মতো *শিবমঙ্গল* কাব্যও বেশ কয়েকজন কবি রচনা করেছেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিব-সঙ্কীর্ত্তন* (আনু. ১৭৫০) নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তিনি শিব-কাহিনিতে পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এখানে শিব প্রধানত কৃষক; তবে কৃষক শুধু নন, নায়ক এবং কৃষকদরদিও। সে-কারণেই আহমদ শরীফের পর্যবেক্ষণ এ রকম:

> বাঙলা ও বাঙালীর লৌকিক শিব নামে দেবতা, ভাবে-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে আবহমান বাঙালী, তাঁর দাম্পত্যে, তাঁর বৈষয়িক জীবনে, তাঁর সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, লাভ-ক্ষতিতে তিনি অভাবক্লিষ্ট নিঃস্ব নিরন্ন ভ্রষ্টচরিত্র বাঙালী গৃহস্থ। তাই দেবতা থাকেন নি তিনি, নিত্যদেখা, নিত্যজানা আত্মীয় বন্ধু পরিজন তিনি, সেজন্যেই তিনি এতো আপন, এতো প্রিয়। তাঁর সঙ্গে গ্রামীণ গৃহী বাঙালীর ধন-মান ও শ্রেণীগত কোন ব্যবধান নেই।[৩৯]

এভাবেই প্রথমবারের মতো বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কোনো কাব্যে কৃষকের নায়ক হয়ে ওঠা; আর তা সম্ভব হয়েছে *শিবায়ন*-এর মধ্য দিয়ে। তবে এখানে 'শিব কেন্দ্রের হয়েও প্রান্তের, দেবতা হয়েও গার্হস্থ্য, কৈলাসে বসবাস করেও শ্মশানচারী, পিশাচেরা তাঁর অনুসারী অসুরেরা তাঁর ভক্ত; তিনি কিরাতরূপে আবির্ভূত হন, তিনি ভিক্ষা করেন, আবার কৃষির সূচনাও করেন।'[৪০]

ধারণা করা হয়, একসময় কৃষকের কল্যাণকর দেবতা হিসেবে কোচ সমাজে যে শিব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, সেটাই সম্ভবত *শিবায়ন* রচনায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকবে। মঙ্গলকাব্যগুলোতে শিবকে দেবতা হিসেবেই নানা ভূমিকায় দেখা যায়। দেশের সাধারণ মানুষ কৃষক। একমাত্র *শিবায়নে*ই শিবকে সাধারণ কৃষক হিসেবে ফসল উৎপাদনে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। অবশ্য, কৃষকের উৎপাদন-বৃদ্ধির আদি দেবতাও ছিলেন কৃষকরূপে কল্পিত। *শিবায়ন*-এর সামাজিক আপস-রফার সূত্রে পৌরাণিক হিন্দুর সেই দেবাদিদেব এই কৃষক-দেবতার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। কৃষকের বাস্তব জীবনের মতোই গড়ে ওঠে *শিবায়নের* কৃষকের সংস্কার ও পরিকল্পনা। কৃষক-শিবের চরিত্র তা-ই নির্মিত হয় বাংলার প্রাকৃতজনের জীবনাদর্শে।[৪১] লোকসমাজে একটি প্রবাদ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত 'ধান ভানতে শিবের গীত'। এই শিবের গীতের শিবকে *শিবায়ন*-এ অলস কৃষক, কৃষিকাজে উদাসীন ও অভাবী হিসেবেও দেখা যায়। এমনকি তাকে একসময় ভিক্ষাবৃত্তি করতেও দেখা যায়। এই অবস্থায় পুরাণোক্ত সতী যখন পুনর্জন্ম লাভ করে গৌরী নাম ধারণ করেন, তখনই তাকে কৃষিকাজে মনোযোগী হতে পরামর্শ দেন। শিব পরামর্শ মেনে ইন্দ্রের কাছ থেকে 'চাষ-ভূমির পাট্টা' গ্রহণ করেন; যদিও ইন্দ্র প্রথমে রাজি ছিলেন না। যখন দেখেন শিব চাষ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন, তখন রাজি হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

এরপর ভৃত্য ভীমের সাহায্যে কুবেরের কাছ থেকে ধানের বীজ সংগ্রহ করেন শিব: 'কল্পতরু কেবল কুবের পায়্যা ঘরে।/ ভীমের সহিতে শিবে সমাদর করে।।/ শিবের সংবাদ শুন্যা সুখী হৈল মনে।'[৪২] এরপর চাষের জন্য জমিও প্রস্তুত করেন শিব। কৃষিকাজের সঙ্গে গবাদি পশুপালনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বিশেষত, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের দিকে কৃষিকাজকে অত্যন্ত সম্মানজনক হিসেবে গণ্য করা হতো। অভিজাত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের গৃহস্থরা স্বয়ং কৃষিজমিতে অস্থায়ীভাবে বসবাস করতেন এবং ফসল সংগ্রহ করে ফিরতেন। এর জন্য সবাইকে ছেড়ে ছয় থেকে আট মাস কৃষিজমিতে থাকতে হতো। সেই সময় কৃষিকাজকে 'দেবকার্য্য' বলে বিবেচনা করা হতো।[৪৩] অবশ্য সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজ সর্বজনীনতা লাভ করেছে। তাই কৃষিকাজ আর কেবল 'দেবকার্য' হিসেবে নেই; বরং শিল্প-কারখানা কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে কৃষিকাজ অবহেলিত পেশা এবং কৃষকেরা প্রান্তিক শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। তবে বর্তমান সময়ের মতো প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস করে নয়, সুরক্ষিত করার চেষ্টা করত মানুষ। ফলে প্রকৃতি ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল চাষবাসের সমস্ত পরিকল্পনা। শুভক্ষণ কী, কখন চাষ করলে ফসল ভালো হবে, কী করলে গরু সুস্থ থাকবে, কোন সময় চাষবাস ক্ষতিকর বা নিষিদ্ধ প্রভৃতি জ্ঞান ছিল কৃষকদের, যা *শিবায়নে*ও পাওয়া যায়। যেমন মাঘমাসের শেষ ভাগে বৃষ্টি হলে তাকে শুভক্ষণ গণ্য করা হতো যেমন:

> মনে জান্যা মঘবান্ মহেশের লীলা।
> মহীতলে মাঘশেষে মেঘ বরিষিলা।।
> দিন সাত বরষিয়া দিলেক ঈশানে।
> হৈল হাল-প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে।।[৪৪]

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোর তাৎপর্য তুলনা করা যায় বহুল প্রচলিত খনার বচন 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ/ ধন্য রাজা পুণ্যি দেশ'-এর সঙ্গে। তবে নিষিদ্ধ দিনে আবার প্রকৃতির নিয়মমাফিক কৃষিকাজের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কে তৎকালীন কৃষকদের সচেতন থাকতে হালচাষ বন্ধ থাকলেও অন্যান্য কৃষিকাজ বন্ধ থাকত না। এ সময়গুলো কৃষকেরা ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করতেন।

সাত

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিচিত্র বিষয় ও ধারায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে শাক্ত পদাবলির বিষয় ও উপস্থাপন কৌশল অনেক বাস্তবসম্মত হওয়ায় কারও কারও রচিত কাব্যগীতিতে কৃষিজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। শাক্ত পদাবলি মধ্যযুগের অন্যতম শক্তিশালী কাব্যধারার নাম।

শাক্ত পদাবলিতে নারী শক্তি দুটি ধারায় মূল্যায়িত— উমা ও শ্যামা। এর মধ্যে পার্বতী, সতী, দুর্গা, উমা, চণ্ডিকা প্রভৃতি নাম ধারণ করে এই দেবীরূপ আবার মিলিতভাবে কালিকা বা কালী নামে বিবর্তিত হয়। বাংলাদেশে শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে এই কালী বা কালিকাই প্রধান।[৪৫] তবে প্রাচীন অনার্য সমাজে তিনি শতাধিক নামে পূজিত হতেন। দশমহাবিদ্যায় তার দশটি রূপ সুচিহ্নিত। তার উদ্দেশে নিবেদিত কাব্যগীতি এবং এর সঙ্গে বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজের দারুণ সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ কৃষিভিত্তিক সমাজ সাধারণত মাতৃতান্ত্রিক। বাংলাদেশের সমাজের ক্ষেত্রেও তা-ই সত্য বলে মনে হয়। কেননা, বাঙালির ধর্মীয় জীবনে দেব অপেক্ষা দেবীর স্থান যে উঁচুস্থানে, তা থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃষিভিত্তিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজে যত সহজে একটি পরিবার এবং তা থেকে এক-একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চল গড়ে ওঠার সুযোগ পায়, যাযাবর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তা সহজে সম্ভব হয় না।[৪৬]

শাক্ত পদাবলির কবিদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রজনীকান্ত সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দাশরথি রায়, নরচন্দ্র রায় প্রমুখ বেশি পরিচিত। তাঁদের মধ্যে আবার রামপ্রসাদ সেনের পদাবলিতে যতটা মাটি ও মানুষের পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, অন্য কবিদের ক্ষেত্রে ততটা নয়। গান হিসেবেও রামপ্রসাদের পদগুলো যতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছে, অন্যান্য কবির গান ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি। রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১) বয়সের দিক থেকে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সমসাময়িক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিভার দিক থেকে ভারতচন্দ্রের পরই রামপ্রসাদকে গণ্য করা হয়। তিনি সাধক কবি হিসেবেও সর্বজনবিদিত। কারণ, তাঁর গান সম্পর্কে গোপাল হালদার বলেছেন, 'বাংলার মাটির গন্ধ আছে, মানুষের প্রাণকেও সেই অষ্টাদশ শতকে সে গীত স্পর্শ করেছিল। কোনো কোনো পদে এমন একটা ঘরোয়া ভাবের সরল শ্রী ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা আছে, যা লোকগীতে ছাড়া সাধারণত পাওয়া যায় না।'[৪৭]

এই যে জনচিত্ত, তাতে উপমা বা রূপকের মধ্য দিয়ে তিনি প্রবেশ করান বাংলার ঐতিহ্যকে, শ্রমজীবনকে, কৃষি-সংশ্লিষ্ট উপাদানকে। যেহেতু মাতৃশক্তিকে খুশি করার প্রয়াস থাকে শাক্ত পদাবলিতে, তাই রামপ্রসাদের শব্দচয়নও খুবই আকর্ষণীয় এবং মায়াময়। তিনি রূপকের আশ্রয় নিয়ে এমনভাবে কৃষি ও কৃষি-জমির কথা উপস্থাপন করেছেন, সহজে তার গূঢ়ার্থ বোঝা কঠিন

হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমরা অনুধাবন করতে পারি, কবিসত্তা কৃষি বা কৃষকের সঙ্গে সম্পর্কহীন হলে কখনোই এভাবে কারও লেখা সম্ভব নয়:

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।।
কালীর নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হইবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।।...
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।।[৪৮]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য-কবিতা আলোচনার নিরিখে বলা যায়, চর্যাপদে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র অঙ্কিত হলেও 'মঙ্গলকাব্যগুলোতেই প্রথম প্রান্তিক মানুষ অরণ্য বা পর্বত থেকে সমতলে এসে পৌঁছেছে।... পর্বতবাসী শিব নেমে এসেছে কৃষিজীবী কোচ-বাগদিপাড়ায়; অরণ্যচারী শিকারি জীবন ছেড়ে কিরাতনন্দন কালকেতু হয়েছে কোনো এক কৃষিনির্ভর জনপদের রাজা।'[৪৯] যেমন শাক্তপদাবলিসমূহে মাতৃ-মাহাত্ম্যের বাণী ধরা পড়লেও অনেক গীতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে কৃষি ও কৃষকের প্রসঙ্গ।

উপসংহার

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিভিন্ন শাষক গোষ্ঠীর কারণে নানাভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছে এ-অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। ওই কালপর্বের সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজচিত্রের নানা অনুষঙ্গ। কবিদের অনবদ্য সৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের পেশাগত জীবন, জীবিকা নির্বাহের জন্য ধারাবাহিক সংগ্রামের চিত্র চর্যাপদ থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হয়ে বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাব্য, শাক্তপদাবলি প্রভৃতিতে ভাস্বর হতে দেখা যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কবিদের শেকড় গ্রাম এবং কৃষিভিত্তিক সমাজ। তবে তাঁরাও ছিলেন ক্রমশ শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হওয়া জনগোষ্ঠীর একাংশ। প্রাচীনযুগ থেকে শুরু করে এখনো বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যের জোগানদাতা হিসেবে কৃষক এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে শ্রমিকের ওপর নির্ভরতা রয়েছে। ইতিহাসের আর্থসামাজিক পর্বগুলোতে লক্ষ করলে পাওয়া যায় অবিকল্প এই নির্ভরতা অতীতে আরও বেশি ছিল। তা সত্ত্বেও চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে তৎকালীন সমাজের বেশ কিছু পেশা-পরিচয় তথা শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গ এলেও সরাসরি কৃষকের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। মঙ্গলধারার কাব্যগুলোর আগে সরাসরি কৃষকের প্রসঙ্গ 'যেন সচেতনভাবে' অবহেলিত থেকে গেছে। পরবর্তী সময়ে রচিত *শিবায়নে* কৃষককে প্রথম নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। এই স্বাভাবিকতা অন্য সব ক্ষেত্রে যে হলো না, তার মধ্যে নিশ্চয়ই রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। সে-বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার প্রয়োজন। কারণ, শত শত বছর ধরে যেমন কৃষক এখানকার প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী, তেমনি প্রধান রাজস্ব জোগানদাতাও। আবারও কৃষকই সবচেয়ে বেশি শোষিত-বঞ্চিত। তাই আশা করা যেতেই পারত, বাঙালির মৃত্তিকাসংলগ্ন কবিগণ কৃষকশ্রেণিকে অতি আপনজন হিসেবে সব সময় প্রাধান্য দেবেন এবং কবিতাশিল্পকে

মহিমান্বিত করে তুলবেন। একইভাবে আধুনিক যুগের কবিতায় বিচিত্র বিষয়, উপাদান ও প্রবণতার পাশাপাশি কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গও বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাওয়া ছিল প্রত্যাশিত। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে রাজনৈতিক নানা আন্দোলনের পাশাপাশি আলাদাভাবে নানকার বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলনসহ বেশ কয়েকটি কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনও সংঘটিত হয়েছে। এ-সময়গুলোতে অনেক কবিকেই কলমের শক্তি নিয়ে কৃষক-শ্রমিকের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়। তবে কৃষক-শ্রমিকের প্রতি তাঁদের এই হার্দিক অবস্থান বেশিদিন স্থায়ী হতে দেখা যায় না। কৃষক ও শ্রমিকের রক্তে-ঘামে সমৃদ্ধ এই সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষদের এমন উদাসীনতা যেন সর্বযুগেই বিরাজমান। রাষ্ট্র তথা সমাজপরিচালনাকারী সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি যে কবিদের ওপরও আরোপিত হয় এবং হয়তো অজান্তেই রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই কবিগণ পাঠ করেন কৃষক-শ্রমিকের চিরায়ত বঞ্চনাকে, উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার লক্ষণ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হতে দেখা যায়। ফলে এ-বিষয়ও উন্মোচিত হয় যে, সব শ্রেণির মানুষের ভাগ্যের উন্নতি ঘটলেও কৃষক-শ্রমিক থেকে যায় তাদের 'চিরবঞ্চিত' এবং 'অপরিবর্তনশীল' অবস্থানে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ এমন শহরও আছে, যেগুলো বিখ্যাত এবং সেগুলো নদী-তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত নয়। তবে প্রাচীনকালে নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা শহরকে কেন্দ্র করে যতটা কর্মচাঞ্চল্য বিরাজ করত, তেমনটা নদীবিহীন শহরে দেখা যায় না।

২ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২, পৃ. ১৩৭

৩ সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাঙলাদেশ', *বাঙলাদেশ* (সম্পা. মনসুর মুসা), ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ২২

৪ বর্তমানে আদিবাসী শব্দ ব্যবহৃত হলেও একসময় 'উপজাতি' ব্যবহৃত হতো। লেখকও তা-ই ব্যবহার করেছেন। তবে শব্দটি বর্তমানে বাংলা ভাষায় তুচ্ছার্থ-নির্দেশক শব্দে পরিণত হয়েছে। যে-কোনো অঞ্চলের আদি বাসিন্দারা নানা কারণে ক্রমশ সংখ্যায় কমে যেতে পারে। তাই বলে জাতিত্বের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায় না। সে-কারণে উপজাতি নয়, তাদের আদিবাসী বা আদি নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করা উচিত।

৫ রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ১৬

৬ মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙলাদেশ*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ১১

৭ গোপাল হালদার, *বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৪০০, পৃ. ১১

৮ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, ১৩৫-১৩৬

৯ ইরফান হাবিব তাঁর এক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কুৎব, দিল্লি, কিলোখ্‌রি, সিরি, তুঘলকাবাদ, ফিরোজাবাদ প্রভৃতি স্থানে বহুল পরিমাণে জনবসতি ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে পাথর, ধ্বংসস্তূপ ও ইট থেকে যেসব চিহ্ন পাওয়া যায়, তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৩৩০ সালে ইবনে বতুতা দিল্লি শহরের সুবিশাল বিস্তার ও এর জনসংখ্যার বর্ণনা করেছিলেন। এ-গ্রন্থে এর বাইরেও লাহোর, মুলতান, লক্ষ্ণৌ, অনহিলওয়াড়া প্রভৃতি শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। [সূত্র: ইরফান হাবিব, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস: একটি সমীক্ষা* (অনু. সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪]

১০ আনিসুজ্জামান, *স্বরূপের সন্ধানে*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯, পৃ. ২৬-২৭

১১ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পা.], *চর্যাগীতিকা*, ঢাকা, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০২, পৃ. ৬৭

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

১৩ প্রাগুক্ত পৃ. ৮৫

১৪ প্রাগুক্ত পৃ. ১৪২
১৫ প্রাগুক্ত পৃ. ১২৮
১৬ https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%B0
১৭ গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
১৮ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১৯ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
২০ একটি কিংবদন্তি অনুসারে খনার নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাতের দেউলি গ্রামে। পিতার নাম অনাচার্য। চন্দ্রকেতু রাজার আশ্রম চন্দ্রপুরে তিনি বহুকাল বাস করেন। অপর কিংবদন্তি অনুসারে তিনি ছিলেন সিংহলরাজের কন্যা। শুভক্ষণে জন্মলাভ করায় তাঁর নাম রাখা হয় ক্ষণা বা খনা। (সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৩, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩)
২১ খনার বচনগুলো আমাদের লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। শস্য উৎপাদন, গৃহনির্মাণ, বৃক্ষরোপণ, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে খনার বচন রয়েছে। যেমন কয়েকটি শস্যের চাষপদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'ষোলো চাষে মূলা। তার অর্ধেক তুলা।/তার আর্ধেক ধান। বিনা চাষে পান।' এ ছাড়া খনার বচন শুধু আমাদের ভাষায় প্রচলিত নয়। বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, বিহার, নেপাল, তিব্বতসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজে খনার বচন পরিচিত ও আদৃত। [সূত্র: সিরাজুল ইসলাম সম্পা., *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ২১]
২২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
২৩ পূরবী বসু, *কিংবদন্তির খনা ও খনার বচন*, ঢাকা, অন্যপ্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১-২
২৪ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (প্রথম খণ্ড), ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০১৮, পৃ. ১৯৯
২৫ নরেশচন্দ্র জানা (সম্পা.), *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনচর্চা*, কলকাতা, দে পাবলিকেশনস, ১৯৯৩, পৃ. ২৫৫
২৬ *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যে যেমন প্রায় সমগোত্রীয় বা সমমর্যাদার এক পেশার শ্রমজীবীর অন্য পেশার শ্রমজীবীকে অবজ্ঞা করতে দেখা যায়, তেমনি কালো কাককে কুলক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।। যেমন: 'ঘরের বাহির হৈতেঁ/তেলিনি তেল বিচিতেঁ/ কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।/ আগেঁ সুনা ঘটে নারী/ হাঁছী জিঠিহো না বারী/ চলিলোঁ তাহার উচিত পাঁও ফলে।। (অমিত্রসূদন; ১৯৯৬: ২৫১)
২৭ ইরফান হাবিব, প্রাগুক্ত, ৮
২৮ মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা.), *শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩, পৃ. ৭২
২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
৩০ ইরফান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৩১ ভীষ্মদেব চৌধুরী, *বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা ও অন্যান্য*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯১, পৃ. ১৯৫
৩২ গৌতম ভদ্র, *মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ*, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৭
৩৩ অমৃতলাল বালা [সম্পা.], *বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা গবেষণা সংসদ, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৪
৩৪ গৌতম ভদ্র, প্রাগুক্ত, ৫১
৩৫ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পা.], *কালকেতু উপাখ্যান*, ঢাকা, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০২, পৃ. ৮৮
৩৬ সিরাজ সালেকীন, *কবিতায় নৃগোষ্ঠী: মূলত কেন্দ্র থেকে দেখা*, ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ২০২০, পৃ. ৪৯
৩৭ ইরফান হাবিব, *মুঘল ভারতের কৃষিব্যবস্থা* (১৫৫৬-১৭০৭), কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৯, পৃ. ৯৬-৯৭
৩৮ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পা.], *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*, ঢাকা, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০৫, পৃ. ১৪-১৫
৩৯ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ৪২৯
৪০ সিরাজ সালেকীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৪১ গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
৪২ যোগিলাল হালদার [সম্পা.], *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন*, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ. ২৩০
৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; আশুতোষ, ১৯৯৮, পৃ. ৩
৪৫ ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় [সম্পা.], *শাক্ত পদাবলী*, কলকাতা, রত্নাবলী, ১৯৯৪, পৃ. ৩
৪৬ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮, পৃ. ৩
৪৭ গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, ২১৮
৪৮ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পা.], *মধ্যযুগের বাঙলা কবিতা*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮, পৃ. ২২১
৪৯ সিরাজ সালেকীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.003

ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন সংবাদপত্র : একটি সাধারণ পর্যালোচনা

মোঃ মনিরুজ্জামান*

সারসংক্ষেপ

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পূর্বেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে একপ্রকার বিরোধের সূত্রপাত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও অনেকটা জোরপূর্বক পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে তাদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করাতে চায়। রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত এসব খবরাখবর তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক *আজাদ* পত্রিকা ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। শুরুতে পত্রিকাটি রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে রহস্যজনক অবস্থান গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে বাংলাভাষার প্রশ্নে তা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বর্তমান নিবন্ধে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় প্রতিফলিত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন-বিষয়ক জনমত বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: ভাষা আন্দোলন, সংবাদপত্র, পর্যালোচনা।

ভূমিকা

ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। এ আন্দোলনকে দেশের জাতিসত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রথম গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রাদায়িক ঘটনা বলে অভিহিত করা যায়। পরবর্তী সময়ে তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ভারতীয় উপমহাদেশ ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। ধর্মগতভাবে মুসলমান হওয়ায় এবং পৃথক মুসলমান রাষ্ট্রের সমর্থন করায় আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছিলাম। আমরা জাতিতে বাঙালি কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মগতভাবে মুসলমান। পাকিস্তানের এক বিচ্ছিন্ন অঞ্চল ছিল পূর্ব পাকিস্তান। এ অঞ্চলের ৯০-৯২ শতাংশ মানুষ বাঙালি, আর সমগ্র পাকিস্তানের প্রায় ৬০ শতাংশ লোক বাংলায় কথা বলে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাকে মূল্যায়ন না করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করায় পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ভাষার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনসাধারণ কোনোপ্রকার ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে শুরু করে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক ও ছাত্রসমাজ একাট্টা হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

প্রদান করা হয়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ে বেশকিছু পত্রিকার সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি। এর মধ্যে অন্যতম ছিল মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত ও ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবরে প্রথম প্রকাশিত দৈনিক *আজাদ* পত্রিকা। এ পত্রিকার পাশাপাশি আরও কিছু পত্রিকা যেমন: দৈনিক *ইত্তেহাদ*, সাপ্তাহিক *মিল্লাত*, মাসিক *সওগাত*, মাসিক *কৃষ্টি* প্রভৃতি সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নিয়মিত খবরাখবর প্রচার করা হতো।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রাথমিক উৎস হিসেবে সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ বা তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। অপরদিকে দ্বৈতীয়িক বা মাধ্যমিক উৎস হিসেবে এ সংক্রান্ত যেসকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে গবেষণায় সেখান থেকে তথ্য ও মন্তব্য চয়ন করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রত্যেক গবেষণাকর্মেরই উদ্দেশ্য থাকা বাঞ্ছানীয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। তার কারণ ঢাকা ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রাণকেন্দ্র। ১৯৫০-এর দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে পূর্ণতা অর্জন করে সেটির রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ ঢাকার অন্যতম দৈনিক *আজাদ* পত্রিকাসহ অন্যান্য পত্রিকায় ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত ঘটনাবলি এবং জনমত যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে উল্লিখিত সময়ের ইতিহাস পুনর্গঠনে সচেষ্ট হওয়াই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।

পটভূমি

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের বিবরণ অনুযায়ী বাঙালি লেখকগণ বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে পত্র-পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেছিলেন ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে এবং এ প্রয়াসের সূচনা হয়েছিল ঢাকায়।[১] কিন্তু আবদুল হক এক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, 'এ প্রচেষ্টার শুরু আরো আগে এবং কোলকাতায়। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পরপরই পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত লেখক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিরাট অংশই ছিলেন কোলকাতায় এবং বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিও উঠেছিল তখনই।'[২] মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পরপরই পাকিস্তানের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন। কেননা ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছিল যে, উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা চলছে। সচেতন লেখকবৃন্দ তখনই এ প্রয়াসের বিরোধিতা এবং বাংলার দাবি প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প নিয়েছিলেন।[৩] ১৯৪৭ সালের ৩০ জুন দৈনিক *আজাদ* পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ:

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা এখন স্থির করার সময় এসেছে। যে ভাষাকেই আমরা রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করি, তার আগে আমাদের বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে কোন ভাষায় পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক কথা বলে, পাকিস্তানের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ভাষা কোনটি, কোন ভাষায় সব থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং কোন ভাষা ভাব-প্রকাশের পক্ষে সব থেকে বেশী উপযোগী। যেদিক থেকেই বিবেচনা করা যাক

> না কেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাভাষার দাবিই সবচেয়ে বেশী। এর মধ্যে দ্ব্যর্থক যদিও কিছু নেই, তবু এখানে স্পষ্ট করেই বলা প্রয়োজন বোধ করছি যে, কেবল পূর্ব-পাকিস্তানের জন্যই নয়, পশ্চিম-পাকিস্তানসহ সমগ্র পাকিস্তানেরই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবী এবং যোগ্যতা সবচেয়ে বেশী বাংলা ভাষার।[৪]

বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ভাষা বাংলা হওয়া উচিত না উর্দু তা নিয়ে এই বাংলাদেশেই একদিন প্রশ্ন উঠেছিল এবং এককালে বাংলা পুথি লেখা হয়েছিল আরবি হরফে। উর্দু সমর্থন করার মতো রাষ্ট্রশক্তি সেকালে ছিল না বলে সে প্রশ্ন প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু পাকিস্তানে উর্দু সমর্থক রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ভাষার প্রশ্নে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে *আজাদ* পত্রিকায় যা উল্লেখ করা হয়েছিল তা হলো:

> আমরা স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছি। স্বাধীনতা যদি সবদিক দিয়াই না পাওয়া যায় তবে সে স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলা বলা যায় না। অতএব অন্যান্য স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষাগত স্বাধীনতাও পাওয়া দরকার। যে ভাষাগত স্বাধীনতা পেলে আমরা আমাদের মনোভাব সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করতে পারবো সে স্বাধীনতা যদি আমরা না পাই– তবে আমাদের মুখ আংশিকভাবে বন্ধ রেখেই স্বাধীনতা দেওয়া হইবে না কি?[৫]

ভাষার স্বাধীনতা সম্পর্কে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকার সমসাময়িক পত্রিকা দৈনিক *ইত্তেহাদ*-এ ১৯৪৭ সালের ২৭ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হইলে' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছিল 'ভাষাগত স্বাধীনতা না পাইলে বদ্ধমুখ অবস্থাতেই স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে।'[৬] আসন্ন পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপ কেমন হবে তা আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯৪৭ সালের ২৭ জুন সাপ্তাহিক *মিল্লাত*-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল: 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা ভাষাই হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।' কিন্তু ঐ সময়ে এমন কথাও শোনা যাচ্ছিল যে উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। এরূপ কানাঘুষার তীব্র সমালোচনা করে *সাপ্তাহিক মিল্লাত*-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে যা প্রকাশ করা হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ:

> একটা দেশকে পুরাপুরি দাসত্বে রূপান্তিত করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীর যত রকম অস্ত্র আছে তাহার মধ্যে সবচাইতে ঘৃণ্য ও মারাত্মক অস্ত্র হইতেছে সেই দেশের মাতৃভাষার পরিবর্তে একটি বিদেশীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকিতে পারে না। পূর্ব-পাকিস্তানবাসীকে এই ঘৃণ্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিতে যদি কেহ বাসনা করে তাহা হইলে তাহার সেই উদ্ভট বাসনা বাঙালীর প্রবল জনমতের ঝড়ের তোড়ে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যাইবে।[৭]

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে মাসিক *সওগাত* পত্রিকায় কবি ফররুখ আহমদ 'পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যে কথা উঠেছিল সে সম্পর্কে তিনি বলেন: 'গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত সেখানে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যাঁরা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অসৎ। পূর্ব-পাকিস্তানের সকল অধিবাসীর সাথে আমিও এই প্রকার অসাধু প্রতারকদের বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'[৮] নারায়নগঞ্জ থেকে প্রকাশিত মাসিক *কৃষ্টি* নামক পত্রিকায় ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা' শীর্ষক প্রবন্ধে 'উর্দুকে একটি অপরিচিত বিদেশি ভাষা বলে বর্ণনা করেন এবং এই ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি লিখেন: উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইলে, বাংলা ভাষার সমাধি রচনা

করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরও জাতি হিসাবে 'গোর' দেওয়ার আয়োজন করিতে হইবে।'[৯]

কাজী মোতাহার হোসেন *সওগাত* পত্রিকায় 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেন। যদি তা না করা হয়, যদি উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানেরও রাষ্ট্রভাষা করা হয় তাহলে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ইংরেজ রাজের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের কবলে গিয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন:

> বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের উপর রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশী দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে।[১০]

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ঢাকার মুসলিম লীগের বামপন্থীদের নিয়ে 'গণ-আজাদী লীগ' নামে একটি সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠটির ম্যানিফেস্টোতে বলা হয় 'বাংলা হইবে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।'[১১] তাদের এ প্রস্তাব ছিল গঠনোন্মুখ রাষ্ট্রের প্রাথমিক রূপরেখার একটি অংশ মাত্র। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও বাংলা ভাষার দাবিকে জোরদার করা হয়। 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ভাষার প্রশ্নে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে উক্ত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটি ছাত্র-শিক্ষক মহলে বাংলাভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা– বাংলা না উর্দু' শিরোনামে অধ্যাপক আবুল কাশেম সম্পাদিত একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এ ঐতিহাসিক পুস্তিকায় কতিপয় লেখক বাংলাকে পূর্ববাংলার শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম, অফিস ও আদালতের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিও তুলে ধরেন।[১২] এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি 'বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন: 'উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী চাকরীর অযোগ্য বনিয়া যাইবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী কাজের 'অযোগ্য' করিয়াছিল।'[১৩]

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর থেকেই ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই ভাষা আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বাংলাভাষা ও সাহিত্য অধিকতর উন্নত এবং বাংলাভাষা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ভাষা, সে হিসেবে এই ভাষাই সাধারণ নিয়মে রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, তথাপি পাকিস্তান সরকার এই ভাষাকেই দূরে ঠেলে রাখছেন; তাঁরা উর্দু ভাষা এবং পশ্চিম-পাকিস্তানিদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন; এ নীতি গণতন্ত্রবিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুরূপ। একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে এবং বাংলার দাবী বাতিল হলে ব্রিটিশ

শাসনের অবসানে প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না, বাঙালিরা ইংরেজদের পরিবর্তে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের অধীনে গিয়ে পড়বে মাত্র। গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাংলা ও উর্দু এই উভয়ই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।[১৪] বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত সমাজ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে উর্দু জানার ফলে অবাঙালিরা আগে থেকেই এগিয়ে আছে, অতএব সরকারি চাকুরিতে তারাই প্রাধান্য পাবে এবং বরাবর এ প্রাধান্য চলতে থাকবে। ব্রিটিশ আমলে বাঙালি মুসলমান হিন্দুদের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছে, পাকিস্তান আমলে অবাঙালি মুসলমানদের দ্বারা বঞ্চিত হবে।[১৫]

উর্দু রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম লেখক সম্প্রদায়ই প্রথমে কলকাতা এবং পরে ঢাকা থেকে প্রতিবাদ এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বাঙালি-অবাঙালি-নির্বিশেষে পূর্ব-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিলেন উর্দুর সপক্ষে। সমাজের এ মনোভাবের পরিবর্তন আনতে না পারলে ভাষা আন্দোলনের সাফল্য সম্ভব হতো না; লেখকসমাজ এ মনোভাবের পরিবর্তন আনতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। কলকাতাস্থ পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি পাকিস্তান সৃষ্টির তিন বছর আগে বাংলার জনগণকে বলেছিল পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা।[১৬] একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে পূর্ববাংলার ওপর কিরূপ অবিচার হবে সেদিকে সোসাইটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবির সপক্ষে অগ্রগামীর ভূমিকা রেখেছিল। এভাবেই লেখকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শিক্ষিত ও ছাত্রসমাজ বাংলাভাষার দাবি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন এবং ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পূর্বেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং স্বাধীনতার পরপরই তা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষার এ দাবিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। এতে ঢাকার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল ক্ষুব্ধ হয় এবং ভাষার ব্যাপারে তারা একটি চূড়ান্ত দাবিনামা প্রস্তুত করে; দাবিটি হলো: পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ও সরকারি কার্যাদি পরিচালনার মাধ্যম হবে বাংলা আর কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা ও উর্দু।[১৭] বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি প্রসঙ্গে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক যে বিবরণ দিয়েছিলেন তা হলো:

> পাকিস্তানের বর্ত্তমান কর্ণধারগণের যদি সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও থাকিত তবে তাঁহারা উর্দ্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলিতে চাহিতেন না। তাঁহারা যদি জানিতেন যে, ভাষার ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার নীতি আজ অচল হইয়াছে, তবে তাঁহারা সংখ্যাগুরুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের উপর এই ভাষা চাপাইবার চেষ্টা করিতেন না। ভাষা, ভৌগোলিক সীমা বা রক্তের সম্পর্ক ঐক্যের বন্ধন হইতে পারে না– সাধারণ আদর্শই হইতেছে প্রকৃত ঐক্যের বন্ধন। পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনসাধারণের ভাষা বাংলাই হইবে পাকিস্তানের

রাষ্ট্রভাষা; আর পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ যদি উর্দ্দুকে তাহাদের সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন তবে উর্দ্দুও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হইবে।[১৮]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে প্রথম বিতর্ক শুরু করে বুদ্ধিজীবী মহল। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করলে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ জ্ঞানগর্ভ যুক্তি দিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পাল্টা প্রস্তাব করেন।[১৯] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৪৭ সালের ৩০ জুলাই দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় বাংলাকে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রভাষারূপে এবং উর্দুকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।[২০] এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিতসমাজ ও ছাত্রসমাজের মধ্যে বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে একটি প্রবল জনমত গড়ে ওঠে।

১৯৫১ সালের আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় ৯৭% এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৮০% জনগণ ছিল মুসলমান। কিন্তু অধিকাংশ জনগণের ধর্ম এক হলেও তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন। ১৯৫১ সালে ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তান জনগণের শতকরা হার ছিল নিম্নরূপ:[২১]

বিভিন্ন ভাষার জনসংখ্যা	শতকরা হার
বাংলা ভাষার জনসংখ্যা	৫৬.৪০
পাঞ্জাবি ভাষার জনসংখ্যা	২৮.৫৫
পুশতো ভাষার জনসংখ্যা	৩.৪৮
সিন্ধি ভাষার জনসংখ্যা	৫.৪৭
উর্দু ভাষার জনসংখ্যা	৩.২৭
বেলুচি ভাষার জনসংখ্যা	১.২৯
ইংরেজি ভাষার জনসংখ্যা	০.০২
অন্যান্য ভাষার জনসংখ্যা	১.৫২
মোট:	১০০.০০

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব দেন।[২২] তাঁর মতে যেহেতু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মুখের ভাষা বাংলা, সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। যেহেতু এই প্রস্তাবটি আসে একজন হিন্দু সদস্যের নিকট থেকে তাই মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাবে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পান। গণপরিষদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মন্তব্য করেন যে, একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের যে প্রয়াস চালানো হচ্ছে তা বানচাল করার জন্যই বাংলাভাষার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, যেহেতু পাকিস্তানের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা উর্দু, অতএব উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়।[২৩]

ভাষা আন্দোলকে কেন্দ্র করে পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে মতবিরোধ

বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। গণপরিষদে দেওয়া লিয়াকত আলী খানের ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ববাংলায় ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি এক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্রবৃন্দ ধর্মঘট পালন করেন। ধর্মঘট চলাকালীন ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বাংলাভাষার সমর্থনে মিছিল করে রমনা এলাকায় একত্র হয়। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে শেষ হলে সেখানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন 'তমদ্দুন মজলিশের' সম্পাদক আবুল কাশেম। সভায় বক্তারা বলেন– পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে প্রস্তাব পেশ করেছেন তা কোনো সাম্প্রদায়িক চিন্তা নয়, বরং সমস্ত বাংলা ভাষীর দাবি এই যে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করতে হবে।[২৪]

১৯৪৮ সালের ২ মার্চ বাংলাভাষার সংগ্রামকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। উক্ত দিন ছাত্ররা বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবিতে সচিবালয়ের বাইরে সমবেত হলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং কমপক্ষে ৫০ জন ছাত্র গুরুতর আহত হয়। উক্ত সমাবেশে ছাত্ররা প্রাদেশিক গভর্নর খাজা নাজিমউদ্দীন ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের কড়া সমালোচনা করে এবং গণপরিষদ থেকে পূর্ববাংলার সদস্যদের পদত্যাগের আহ্বান জানায়। এ প্রসঙ্গে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল:

> ছাত্রেরা বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাইয়াছে। এই দাবী জানাইবার তাহাদের পূর্ণ অধিকার আছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। এই যদি এখানকার জনমতের দাবী হয়, তবে পাকিস্তানকে তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। এই গণতান্ত্রিক দাবী অস্বীকার করার ক্ষমতা কাহারো নাই। পূর্ব্ব পাকিস্তানের আইন সভার সদস্যদিগকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যুক্তভাবে জানাইয়া দিয়া বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠা করার ভার তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। দেশকে আজ এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির হাত হইতে তাঁহারা রক্ষা করুন। পাকিস্তানের সংহতি, কল্যাণ এবং উর্দু ও বাংলা ভাষাভাষীদের সম্প্রীতি দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করুন; আজ শোক সন্তপ্ত পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনমত আপোষহীন ভাষায় এই দাবীই জানাইতেছে।[২৫]

এই প্রতিবাদ সভাকে সরকার হিন্দু তথা পাকিস্তানের শত্রুদের দ্বারা আয়োজিত এক গভীর চক্রান্ত বলে প্রচার করে। সরকার ঘোষণা করে যে, বাংলাভাষার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র।[২৬] কিন্তু ছাত্রদের এই আন্দোলন ১১ মার্চ বন্ধ হয়ে যায়নি, বরং পরের দিনগুলিতে এই আন্দোলন আরও জোরদার হতে থাকে এবং সাধারণ জনগণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে ১৫ মার্চ আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। খাজা নাজিমউদ্দীন আলোচনা সভায় স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কোনো স্বদেশবিরোধী চক্রান্ত নয়। আন্দোলনকারীদের দাবি যথার্থ।[২৭]

ইতোমধ্যে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন বসে। উক্ত অধিবেশনে ভাষার বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়। ফলে ছাত্ররা নতুন করে আন্দোলন শুরু করে। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য নাজিমউদ্দীন কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা জানার জন্য ছাত্ররা ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদের সভাকক্ষের দিকে মিছিল সহকারে অগ্রসর হলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও বন্দুকের ফাঁকা গুলি করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ছাত্রদের আন্দোলনে নাজিমউদ্দীন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে যথাশীঘ্র সম্ভব পূর্ববাংলা সফরে আসার আহ্বান জানান।[২৮] সে অনুসারে গভর্নর জেনারেল ১৯ মার্চ পূর্ববাংলা সফরে আসেন। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে তিনি স্বৈরাচারী মনোভাব দেখান। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তি দেখিয়ে বলেন:

> আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদেরকে জানাতে চাই যে আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে এ কথার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। কিন্তু আপনারা এই প্রদেশের অধিবাসীরাই চূড়ান্তভাবে স্থির করবেন আপনাদের প্রদেশের ভাষা কি হবে। কিন্তু এ কথা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু। একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোনো জাতিই এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে কার্যনির্বাহ করতে পারে না। অন্য দেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অতএব, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।[২৯]

জিন্নার এই ঘোষণায় সভার কোনো কোনো অংশ থেকে মৃদু 'নো নো' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। উক্ত সভার তিন দিন পর ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন যে পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন আসলে পাকিস্তানের শত্রুদের কারসাজি। তিনি মন্তব্য করেন যে, বাঙালিরা তাদের প্রদেশের সরকারি ভাষারূপে যেকোনো ভাষা নির্বাচিত করতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানের সরকারি ভাষা অবশ্যই হবে উর্দু। জিন্নাহর এই উক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে উপস্থিত গ্রাজুয়েটবৃন্দ 'না না' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। জিন্নাহর এই অবিবেচক, স্বৈরাচারী মনোভাব পূর্ববাংলায় বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এভাবে ভাষা আন্দোলন ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।[৩০]

ব্যাপক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান

১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান পাকিস্তানের পেশোয়ারে বাংলাভাষাকে ইসলামীকরণ করার উদ্দেশ্যে বাংলাকে আরবি হরফে লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৩১] এর পেছনে যুক্তি ছিল যে, আরবি হরফে বাংলা লেখা হলে পশ্চিম পাকিস্তানের এবং অবশিষ্ট মুসলিম জাহানের অধিবাসীদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের ঐক্য-বন্ধন সহজতর ও দৃঢ়তর হবে। কিন্তু আবদুল হকের মতে, 'ভাষা ও হরফ এক জিনিস নয়। ভাষার মারফতেই সমঝোতা হয়; হরফের মারফত নয়। আসলে আরবি অক্ষরের প্রতি মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে তাদের উর্দুতে দীক্ষিত করে নেওয়াই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বলে

মনে হয়।'[৩২] ১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা কমিটি বাংলা বর্ণমালা আরবিতে লেখার বিরোধিতা করলে সরকারের উক্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গণপরিষদের মূলনীতি কমিটি উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেয়। উক্ত কমিটির বিপরীতে ১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর ঢাকার সংগ্রাম কমিটি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ও বাংলা হবে সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী উক্ত রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নেন। তবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যেনো একেবারে স্তিমিত হয়ে না যায় সে উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। উক্ত পরিষদ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে যে স্মারকলিপি প্রদান করেছিল তার মূলকথা ছিল নিম্নরূপ:

> সবশেষে আমরা সে কথারই পুনরাবৃত্তি করব যে কথা আমরা বারবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে আসছি যদি পাকিস্তানে একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা হয়, তবে সেটা অবশ্যই হবে বাংলা। আর যদি তা একাধিক হয় তাহলে বাংলাকে হতে হবে তার মধ্যে অন্যতম। আমরা কখনই উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেব না। আমরা পূর্ববাংলাকে উপনিবেশে পরিণত করার ষড়যন্ত্র উদঘাটন করে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা তাদের এবং রাষ্ট্র পরিচালনার শীর্ষে অধিষ্ঠিত জনপ্রতিনিধিদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যতদিন বাংলাভাষার ন্যায়সঙ্গত দাবি প্রদেশে এবং কেন্দ্রে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ শান্ত হবে না।[৩৩]

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় আসেন। এসেই পল্টন ময়দানে এক জনসভায় দীর্ঘ ভাষণে বলেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ১৯৪৮ সালে ঢাকায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তৃতা অনুসরণ করে এবং প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন:

> পাকিস্তানকে আমরা এছলামী রাষ্ট্ররূপে গঠন করিতে যাইতেছি। যে এছলামে কোনরূপ কুসংস্কার বা ভেদাভেদ নাই সে রাষ্ট্রে কেমন করিয়া প্রাদেশিকতার বীজ বপন করা চলিতে পারে? মরহুম কায়েদে আজম বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিকতাকে যে বা যাহারা প্রশ্রয় দেয় তাহারা পাকিস্তানের দুশমন। প্রাদেশিক ভাষা কি হইবে, তাহা প্রদেশবাসীই স্থির করিবে কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দ্দু। একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকিলে কোন রাষ্ট্র শক্তিশালী হইতে পারে না।[৩৪]

তাঁর এ ঘোষণায় ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ছাত্র ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। উক্ত সভায় ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার উদ্দেশ্যে '৩১ জানুয়ারি ঢাকায় বার এশোসিয়েশনে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।' সভায় পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।[৩৫] উক্ত পরিষদ ৪

ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সমর্থন করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও সভার কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল। এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। এ প্রসঙ্গে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় 'ভাষানীর মওলানার বিবৃতি' শিরোনামে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল তা হলো:

> কর্তৃপক্ষ কি করিয়া এইরূপ নির্ম্মম ও অমানুষিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন তাহা আমার পক্ষে বুঝা শক্ত। প্রতিবাদ দিবসের প্রাক্কলে ১৪৪ ধারা জারী করার কোনই যৌক্তিকতা ছিল না। এই বিষয়ে আর বেশী কিছু আলোচনা না করিয়া ঘটনার জন্য আমি একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচারের জন্য দাবী করিতেছি।[৩৬]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচির প্রতি প্রাদেশিক সরকার কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে এবং ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে এক মাসের জন্য ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সরকারি ঘোষণায় বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তারা ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ১৪৪ ধারা না ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যাহোক শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা, যুবলীগের নেতা ও কর্মীগণ এবং ছাত্রনেতাদের কয়েকজন পৃথকভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৩৭] ছাত্ররা যখন মিছিল নিয়ে ১৪৪ ধার ভাঙতে পথে নামছিল তখন পুলিশ তাদের প্রথমে গ্রেফতার ও পরে বেপরোয়া লাটিচার্জ ও শত শত কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মেডিকেল হোস্টেলের প্রধান ফটকের কাছে একত্র হয়। উদ্দেশ্য ছিল ঐদিন জগন্নাথ হলের অডিটোরিয়ামে পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদের যে সভা আহ্বান করা হয়েছিল উক্ত সভায় যেনো বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।[৩৮] দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ' শিরোনামে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ:

> স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ও শহরে ১৪৪ ধারা জারীর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণভাবে এক সভার আয়োজন করে। পরিষদে চলতি অধিবেশনে যোগদানকারী সদস্যদিগকে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে পূর্ব্বপাকিস্তানের জনগণের মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করানোই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া সভার উদ্যোক্তাদের নিকট হইতে জানা গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা চলিতে থাকার সময় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার চতুর্দ্দিকে রাইফেলধারী পুলিশ মোতায়েন থাকিতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ও বিভাগীয় ডীনগণ ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে ছাত্রগণ বেলা প্রায় ১১টায় গেটে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া রাস্তায় বাহির হইতে দেখা যায়। এই সময় পাহারারত পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় গেটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে কিছু সংখ্যক ছাত্র দৌড়াইয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রকে দৌড়াইয়া মেডিক্যাল কলেজের দিকে যাইতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সমবেত অবশিষ্ট ছাত্রগণ ঘেরাও করা এলাকার মধ্যে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ প্রকাশ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারের (যিনি এই ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন) নিকট পুলিশের এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।[৩৯]

সরকারি বিবরণ অনুযায়ী ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ও পরে কমপক্ষে ৬ জন শহিদ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম শহিদ হয়েছিলেন রফিকউদ্দীন আহমদ, আবুল বরকত, শফিউর, আবদুল জব্বার, অহিউল্লাহ এবং আবদুস সালাম। ২১ ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ দৈনিক *আজাদের* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। গভর্নর ও স্পিকারের কাছে লেখা পদত্যাগ পত্রে তিনি উল্লেখ করেন:

> বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নূরুল আমিন সরকারের আমিও একজন সমর্থক– এ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে লজ্জাবোধ করিতেছি।[৪০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত ঘটনায় পুলিশি ও মিলিটারি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা প্রবর্তনের জন্য তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। সেই সঙ্গে যেসকল রাজনীতিবিদ এতোদিন ভাষা আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন তাঁরাও আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং সরকারকে বাংলা ভাষার দাবি পূরণের জন্য ৫ মার্চ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেন। উক্ত সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে নতুন আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। এসময় 'তমদ্দুন মজলিশ' কর্তৃক ছাত্র সমাবেশের ওপর যে পুলিশী নিপীড়ন চালানো হয়েছিল তার প্রতি নিন্দা জানিয়ে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা হলো:

> পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের কেন্দ্রীয় দফতর এক বিবৃতিযোগে বলিয়াছেন: '২১ শে ও ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র সমাবেশের উপর যে নৃশংস পুলিশী জুলুম চালানো হইয়াছে, তাহার নিন্দা করার ভাষা আমাদের নাই। আমরা এই দুষ্কার্য্যের সহিত জড়িত প্রতিটি অপরাধীর আশু তদন্ত ও কঠোর শাস্তির দাবী জানাইতেছি। শহীদানের শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ জনসাধারণকে শুধু এই শপথই নিতে হইবে– বাংলা ভাষার দাবীর পূর্ণ স্বীকৃতি এবং পুলিশী নৃশংসতার প্রতিবিধান না হওয়া পর্য্যন্ত আজিকার এই সংগ্রামের বিশ্রাম নাই।'[৪১]

এমন পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারীদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রি নূরুল আমিন ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার একটি সুপারিশ পাকিস্তান গণপরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণের একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নেন।[৪২] তাছাড়া ১৯৫২ সালের ৩ মার্চ এক বেতার ভাষণে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি আসল প্রশ্ন নয়, ইহার পশ্চাতে সরকারকে বানচাল করার জন্য বিদেশি দালাল ও অন্যান্যদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নিহিত আছে।' দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় নূরুল আমিনের বেতার বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন:

> জনাব নুরুল আমীনের সাম্প্রতিক বেতার বক্তৃতা তাঁহার দমননীতি ও তাঁহার মন্ত্রিসভার বিরোধীদের গ্রেফতারের পক্ষে ওকালতী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার মনের ভাবটা এই রকম যে, তিনি যদি স্বেচ্ছায় বা পরিস্থিতির চাপে পদত্যাগ করেন এবং মোছলেম লীগ যদি ক্ষমতাচ্যুত হয় তাহা হইলে এছলাম ও পাকিস্তান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তিনি এবং তাঁহার দলও যেন শুধু এছলামের পতাকা সমুন্নত রাখিয়াছেন এবং পাকিস্তানকে রক্ষা করিয়াছেন এবং করিতে পারেন। তিনি বলেন, জনাব নুরুল আমীন জনসাধারণকে বোকা বানাইবার সেই পুরাতন নীতিই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার অজুহাত এই যে, তিনি যদি সভাসমিতি

> করিতে দেন বা বিরোধী দলকে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে দেন, তাহা হইলে রাষ্ট্র বিপদাপন্ন হইবে, কেবলমাত্র স্বেচ্ছাচারীতায় যাহা সম্ভব তিনি সেই চরমতম দমননীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রবিরোধী লোকেরা পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে, গত কিছুদিন হইতে তাহারা রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্য চালাইতেছে এক্ষণে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও বিক্ষোভের সুযোগ গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়াই এই কথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, খওয়াজা নাজিমুদ্দিন অসময়চিত এবং প্ররোচনামূলক বিবৃতি না দিলে এই ধরনের বিক্ষোভ কোন দিনই দেখা দিত না এবং দেয়ও নাই। জনাব নুরুল আমীন একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করেন এবং ১৪৪ ধারা জারী করেন। উপসংহারে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী বলেন, ব্যাপক ধরপাকড় করিয়া বাংলার অধিবাসী ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করা এবং একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলকে দমন করার যে চেষ্টা চলিতেছে, আমি ন্যায়নীতি, পাকিস্তান ও সরকারের সুনামের দোহাই দিয়া তাহার প্রতিবাদ জানাইতেছি।[৪৩]

পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় গণপরিষদের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করলেও গণপরিষদের অধিবেশনে সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধার সম্মুখীন হয়। পূর্ববাংলা থেকে নির্বাচিত মুসলিম লীগ দলীয় গণপরিষদ সদস্য নূর মোহাম্মদ বাংলাভাষা সংক্রান্ত পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সুপারিশের বিষয়টি গণপরিষদের অধিবেশনে উত্থাপন করলেও পূর্ববাংলার কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রফেসর রাজকুমার চক্রবর্তী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য তা সমর্থন না করায় নূর মোহাম্মদ কর্তৃক আনীত প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।[৪৪]

অতঃপর ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে পূর্ববাংলার জনগণ ভাষা, স্বায়ত্তশাসনসহ বিভিন্ন দাবির প্রশ্নে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' নামক একটি নির্বাচনী জোট গঠিত হয়। উক্ত জোট নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো হিসেবে যে ২১ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে তার অন্যতম ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অঙ্গীকার। নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্টের' জয়লাভ এবং মুসলিম লীগের ভরাডুবির ফলে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভায় বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের আলোকে ১৯৫৪ সালের ৯ মে পাকিস্তান গণপরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু ও বাংলা।[৪৫] গণপরিষদের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং একইভাবে বাংলাভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক অধিকার লাভ করে।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্নও জড়িয়ে পড়েছিল। এ আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠলেও পরবর্তীতে তা রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যে কারণে পূর্ববাংলায় বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলন প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রসমাজের অবদানকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। মূলত তাদের আন্দোলনসমূহই ভাষা আন্দোলনে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। এছাড়া শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী থেকে আরম্ভ করে সকল শ্রেণিপেশার মানুষ

ভাষা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ভাষা আন্দোলন ছিল একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে যেসকল সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল তা পূর্ববাংলার জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের বদৌলতে পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় দলমত নির্বিশেষে সবাই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার জনসাধারণের মধ্যে যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার ঢেউ ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও লেগেছিল। এছাড়া ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রেও ভাষা আন্দোলন যে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যনির্দেশ

১ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, (কলকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন, ১৯৭০), পৃ. ২
২ আবদুল হক, *ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব*, (ঢাকা: অবসর, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭), পৃ. ৩২
৩ প্রাগুক্ত
৪ দৈনিক *আজাদ*, ৩০ জুন, ১৯৪৭
৫ প্রাগুক্ত
৬ দৈনিক *ইত্তেহাদ*, ২৭ জুলাই, ১৯৪৭
৭ সাপ্তাহিক *মিল্লাত*, ২৭ জুন, ১৯৪৭
৮ মাসিক *সওগাত*, আশ্বিন ১৩৫৪
৯ মাসিক *কৃষ্টি*, কার্তিক ১৩৫৪
১০ মাসিক *সওগাত*, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪
১১ কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ১ম ও ২য় খণ্ড (ঢাকা: প্রথমা, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০২১), পৃ. ২৬২
১২ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৫, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০২১), পৃ. ৪২৬-২৭
১৩ আবদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭
১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
১৬ আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (ঢাকা: প্রথমা, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৮), পৃ. ২৬৩
১৭ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১০, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০২১), পৃ. ১৪৬
১৮ দৈনিক *আজাদ*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
১৯ বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ১৭৩।
২০ দৈনিক *আজাদ*, ৩০ জুলাই ১৯৪৭

২১ S. A Akanda, "The Language Issue: Potent force for transformation East Pakistan Regionalism into Bengali Nationalism", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* Vol. 1, 1976, pp. 1-29

২২ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড*, (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৫৪-৫৮

২৩ প্রাগুক্ত

২৪ প্রাগুক্ত

২৫ দৈনিক *আজাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

২৬ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

২৭ S. A. Akanda, *op. cit*., p. 7

২৮ প্রাগুক্ত

২৯ বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৩০ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৮

৩১ বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৩২ আবদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৩৩ আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য*, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫), পৃ. ৭৬

৩৪ দৈনিক *আজাদ*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৫২

৩৫ আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ২৬-২৮

৩৬ দৈনিক *আজাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

৩৭ বশির আল হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯-৩২০

৩৮ ঐ, পৃ. ৩২৩-২৪

৩৯ দৈনিক *আজাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

৪০ দৈনিক *আজাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

৪১ দৈনিক *আজাদ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

৪২ বেতার ভাষণ, দৈনিক *আজাদ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

৪৩ দৈনিক *আজাদ*, ১০ মার্চ ১৯৫২

৪৪ প্রাগুক্ত

৪৫ প্রাগুক্ত

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.004

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলাধীন নতুন আবিষ্কৃত ভালাইপুর গণহত্যা: একটি জরিপ প্রতিবেদন

পারভীনা খাতুন*

সারসংক্ষেপ

বৃহত্তর যশোর জেলার অবস্থিতি ভারতের সীমান্ত-নিকটবর্তী হওয়ায় ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এ অঞ্চলের মুক্তিকামী সাধারণ জনগণের পাশাপাশি একই পথ দিয়ে ভারতগামী বাঙালি শরণার্থীরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন ধরনের নিষ্ঠুর আচার-আচরণ ও পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে রয়েছে হত্যা, গণহত্যা, মৃত বা অর্ধমৃত ব্যক্তিদের গণকবর দেওয়া, নারীর ওপর পাশবিক নির্যাতন, অবাধ লুণ্ঠন, আগুন দিয়ে মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করা ইত্যাদি। সম্ভবত, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এখানে পাকিস্তানি শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে অধিক মাত্রায় প্রতিরোধযুদ্ধ, গেরিলা আক্রমণ, যুদ্ধ, ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনাস্থল হচ্ছে ঝিনাইদহ জেলাধীন (যুদ্ধকালে মহকুমা) মহেশপুর ও ভালাইপুর। অনেক স্পট এখনো অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেছে। ভালাইপুর গণহত্যা ও গণকবর স্থল মহেশপুরের অতি সন্নিকটে। একটি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অপরটি অবিচ্ছেদ্যভাবে এসে যায়। এ প্রবন্ধটিও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ভালাইপুর গণহত্যা ও গণকবরের বিষয়টি এ পর্যন্ত সকলেরই অজানা ছিল। এটি বর্তমান গবেষক কর্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত। এখানে মুক্তিযুদ্ধকালে প্রায় নিয়মিত গণহত্যা সংঘটিত হয় এবং এর যারা নির্মম শিকার তাদের গণকবরে মাটিচাপা দেওয়া হতো। বর্তমান প্রবন্ধে শুধু একদিন (২০ মে) সংঘটিত গণহত্যা ও গণকবরের লোমহর্ষক বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গণকবরে মাটিচাপা দেওয়া অর্ধ-মৃত এক ব্যক্তির অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া এবং ঐ দিনের নির্মম ঘটনা সম্বন্ধে তার মুখের বয়ান। পাশাপাশি, এখানকার গণহত্যায় যেসব পরিবার তাদের প্রিয়জন হারিয়েছে, ঐ সব পরিবারে প্রাণে বেঁচে থাকা সদস্যদের করুণ জীবন-যাপন ও বেঁচে থাকার সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধের শেষাংশে সংযুক্ত ৪টি সংযোজনী এবং বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কতিপয় আলোকচিত্র পাঠককে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে, আশা করি, সহায়ক হবে।

চাবি শব্দ: মহেশপুর, ভালাইপুর, গণহত্যা, গণকবর, পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী, মুক্তিযুদ্ধ, কপোতাক্ষ নদ, সৃষ্টিপদ হালদার।

প্রারম্ভিক বক্তব্য

১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস ব্যাপী মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা বাংলাদেশের মানুষের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা-নির্যাতন, ধর্ষণ-নিপীড়ন, অগ্নিকাণ্ড, লুটপাট ইত্যাদি চালায়। এ সময় তাদের হাতে ৩০ লক্ষ লোক শহিদ হন। প্রায় পৌনে ৫ লক্ষ মা বোন লাঞ্ছিত হন।[১] এক কোটি মানুষ প্রাণভয়ে ভিটেমাটি, ঘর-বাড়ি ছেড়ে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃহত্তর যশোর বাংলাদেশের একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়ায় বহুসংখ্যক শরণার্থী ভারতের শরণার্থী শিবিরে এবং এর বাইরে যত্রতত্র আশ্রয় নেয়। পথিমধ্যে তারা হানাদার বাহিনী দ্বারা নানাভাবে নির্মম নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছে। এ কারণে এখানে গণহত্যা-বধ্যভূমি ও নারী নির্যাতনের সংখ্যা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অধিক।[২] বৃহত্তর যশোরের ওপর ইতোমধ্যে যে সকল গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে,[৩] তাতে দেখা যায় এখানে

* শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক, যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর।

হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অসংখ্য যুদ্ধ ও প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়েছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস হানাদার বাহিনীর গণহত্যার ফলে সৃষ্টি হয় অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর।

মুক্তিযুদ্ধকালীন ঝিনাইদহ মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) বহু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এখানে অনেক নির্যাতন কেন্দ্র, বধ্যভূমি ও গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য দুটি গণহত্যা হচ্ছে মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড ও ভালাইপুরে সংঘটিত গণহত্যা। মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড গণহত্যার ওপর বর্তমান গবেষকের একটি মাঠ পর্যায়ে জরিপভিত্তিক গবেষণাকর্ম অতি সম্প্রতি প্রবন্ধ আকারে খুলনাস্থ **১৯৭১:** গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৪] কিন্তু মহেশপুর সংলগ্ন ভালাইপুরে একইসময়ে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়, তা এখনো অপ্রকাশিত এবং অজানা। মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড ও ভালাইপুর যেহেতু পরস্পর সংলগ্ন এবং মহেশপুর গণহত্যা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য-বিবরণীসহ বর্তমান গবেষকের পূর্বে উল্লেখিত প্রবন্ধই প্রথম, সেহেতু পাঠক-গবেষকদের সুবিধার্থে উভয় গণহত্যার যারা শিকার হয়েছেন, তাঁদের তালিকা, ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতদের তালিকা পরিশিষ্ট ১-৪ এ দেওয়া হয়েছে।

এ পর্যন্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রকাশিত অন্যতম গ্রন্থগুলোর মধ্যে হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ, ১০ খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০২০; মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ, দ্বাদশ খণ্ড* (২০১৩); হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল পত্র, ১৫ খণ্ড* (১৯৮২); সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর* (২০০০); বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, *মুক্তিযুদ্ধে সামরিক অভিযান, ৭ খণ্ড* (২০১৫) এসব গ্রন্থে মহেশপুর কপোতাক্ষ নদের তীরে বাসস্ট্যান্ড গণহত্যা ও ভালাইপুরের গণহত্যা, বধ্যভূমি বা গণকবরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ নেই। আসাদুজ্জামান আসাদের *মুক্তিযুদ্ধে যশোর* গ্রন্থেও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ না থাকলেও, মহেশপুরে পাকিস্তানি বাহিনীর তাণ্ডবলীলা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায় ।

ভালাইপুরের ভৌগোলিক অবস্থান

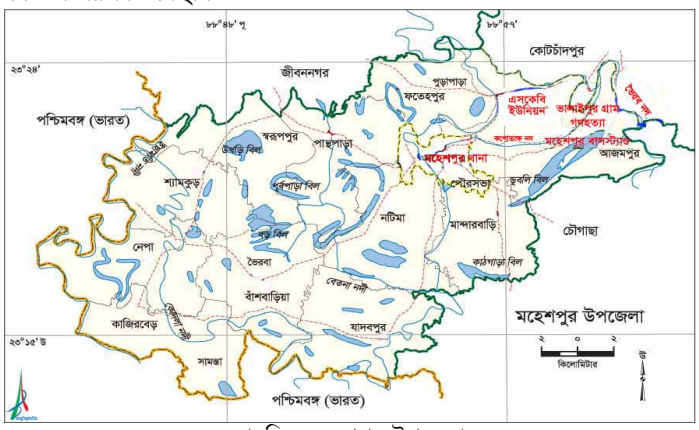

মানচিত্র: মহেশপুর উপজেলা

ঝিনাইদহ জেলার অন্তর্গত মহেশপুর উপজেলা ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। ইউনিয়নগুলি হচ্ছে– এসবিকে ইউনিয়ন, ফতেপুর ইউনিয়ন, পান্তাপাড়া ইউনিয়ন, স্বরূপপুর ইউনিয়ন, শ্যামকুড় ইউনিয়ন, নেপা ইউনিয়ন, কাজিরবেড ইউনিয়ন, বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন, যাদবপুর ইউনিয়ন, নাটিমা ইউনিয়ন, মান্দারবাড়ীয়া ইউনিয়ন ও আজমপুর ইউনিয়ন। ভালাইপুর গ্রামটি এসবিকে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম। মহেশপুর উপজেলা সদর থেকে ভালাইপুরের দূরত্ব দেড় কিলোমিটার পূর্বে।

যেভাবে এই গবেষণাকর্ম শুরু

বর্তমান গবেষক ১৫ই মে ২০২২ স্থানীয় একাধিক পত্রিকায় দেখতে পান মহেশপুর উপজেলার উত্তর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভৈরব নদের একটি শাখা কপোতাক্ষ নদ (যা বর্তমানে একটি ক্ষীণধারা) খনন করতে গিয়ে ভেকুরের মাথায় (খনন যন্ত্র) অসংখ্য মানুষের মাথার খুলি ও হাড় উঠে আসার ঘটনা। এ নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কপোতাক্ষ নদের তীরে দেহাবশেষ পাওয়ার খবরে মানুষ দলে দলে কপোতাক্ষ নদের পাড়ে ভিড় করেন। মুক্তিযোদ্ধা পৌর কমান্ডার আব্দুস সাত্তার এবং মহেশপুর উপজেলা প্রধান নির্বাহী অফিসার নয়ন কুমার রাজবংশী সেদিন (১৫ মে) বিকেলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। মহেশপুর থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে হাড় ও মাথার খুলি উদ্ধার করেন এবং ডিএনএ টেস্টের জন্য পাঠান। বর্তমানে উদ্ধারকৃত হাড় ও খুলিগুলো খুলনাস্থ ১৯৭১: গণহত্যা জাদুঘরে সংরক্ষিত। পরবর্তীকালে স্থানীয় কিছু সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে লেখা প্রকাশিত হয়। এভাবেই বর্তমান গবেষক বৃহত্তর যশোরের ঝিনাইদহের মহেশপুর ইউনিয়নে অবস্থিত মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড বধ্যভূমিটির সন্ধান পান। এই বধ্যভূমির ওপর গবেষণা করে ভয়াবহ এক চিত্র তুলে আনেন। মহেশপুরের নিকটবর্তী আর একটি স্থান হলো ভালাইপুর। মুক্তিযুদ্ধকালীন সেখানেও একাধিকবার ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়। এই ভালাইপুরের গণহত্যা সম্পর্কে কেউ কখনো অনুসন্ধান করেনি। বর্তমান গবেষক খুলনাস্থ ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্টের পরামর্শ ও সহযোগিতায় মহেশপুর বাসস্ট্যান্ডের গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করার সময় ভালাইপুরের গণহত্যা সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে লোকজনের কাছে অবহিত হন। এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমান গবেষণাকর্মটি হাতে নেয়া হয়। দেখা যায়, এখানকার গণহত্যার ভয়াবহতা, যা এ পর্যন্ত সকলেরই অজানা ছিল।

প্রবন্ধকার প্রথমে যান মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নয়ন কুমার রাজবংশীর অফিসে। সেখানে অনেক প্রবীণ লোক, শহিদ পরিবারের সদস্য, প্রত্যক্ষদর্শী, নির্যাতিত নারী-পুরুষদের জড়ো করা হয়েছিল এবং এদের অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে গ্রামে-গ্রামে সরেজমিনে স্থানীয়দের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ শুরু করা হয়। মহেশপুর বাসস্ট্যাণ্ড গণহত্যা ও ভালাইপুর গণহত্যা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বধ্যভূমি এবং গণকবর সম্পর্কে সর্বমোট ৪০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

মহেশপুর বাসস্ট্যান্ডের পাশেই মহেশপুর প্রেসক্লাবের অফিস। মানবাধিকার কর্মী ও প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ আব্দুর রহমানের সহযোগিতায় ভালাইপুর গণহত্যার শিকার পরিবারের সদস্যদের

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও গণহত্যার হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া একজনের কাছ থেকে ঘটনার লোমহর্ষ বিবরণ রেকর্ড করা হয়। এইভাবে নতুন এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে।

তথ্য-উৎস

বর্তমান গবেষণাকর্মে যেসব উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, তা হলো– মাঠ-পর্যায়ে জরিপ, সরেজমিনে সাক্ষাৎকার, গণহত্যার স্পট বা স্থান পরিদর্শন, গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী, স্থানীয় প্রশাসন, সাংবাদিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, ভালাইপুর গণহত্যায় যাদের গণকবর দেওয়া হয় তাদের মধ্যে ঘটনাক্রমে বেঁচে যাওয়া একজন–এদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ভুক্তভোগী শহিদ পরিবারের সদস্য, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা প্রমুখেরও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

ভালাইপুর গণহত্যার বিবরণ

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা মহেশপুরের হাসপাতাল, থানা এবং কলেজে ক্যাম্প স্থাপন করে বাংলার নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর নৃশংস গণহত্যা-নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত থেকে গণহত্যা শুরু হয় এবং মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত তা চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৫ই এপ্রিল যশোর সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মহেশপুরের বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল মহেশপুর হাসপাতালে। এর পূর্বে ভালাইপুর গ্রাম, উত্তরে কপোতাক্ষ নদ, পশ্চিমে মহেশপুর শহর। ফরিদপুর, মাগুরা, নড়াইল, যশোর অঞ্চল থেকে শরণার্থীরা খুব সহজেই মহেশপুর ও যাদবপুরের রাস্তা দিয়ে ভারতে যেতে পারত। ২০শে মে অসংখ্য শরণার্থী হেঁটে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে যাত্রা করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদেরকে ধরে ভালাইপুর কপোতাক্ষ নদের ধারে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। লাশ যত্রতত্র পড়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মহেশপুর হাসপাতাল পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিল মেজর আব্বাস[৫] ও প্লাটুন কমান্ডার মেজর আনিস খান।[৬] এদের নির্দেশে বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষজন ধরে এনে মহেশপুরের ভালাইপুর, হাসপাতালের পেছন, কলেজ মোড় ও বর্তমান বাসস্ট্যান্ড ইত্যাদি স্থানে হত্যা করা হতো। পরে তাদের গণকবর দিত। আবার কপোতাক্ষ নদের ধারে বা ক্যাম্পে হত্যা করে লাশ নদে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। কিংবা নদের তীরে অসংখ্য গর্ত করা ছিল আর সেই গর্তে মাটি চাপা দেওয়া হতো। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রাণভয়ে অধিকাংশ লোক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করায় মহেশপুর ও ভালাইপুরসহ সমগ্র উপজেলা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিভিন্ন গ্রাম থেকে কিশোরী, যুবতী ও গৃহবধূদের ক্যাম্পে ধরে এনে পাশবিক অত্যাচার চালাত। যুবতী মেয়েদেরকে তাদের পরনের কাপড় খুলে উলঙ্গ অবস্থায় হাসপাতালের একটি কক্ষে আটক রেখে যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত ধর্ষণ করে। স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের বা তাঁদের সহযোগী হিসেবে যারা কাজ করত তাদেরও ধরতে পারলে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা

করত। হত্যা করার পূর্বে দীর্ঘদিন ধরে এইসব যুবকের ওপর নির্যাতন করা হতো। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে আশ্রয়দাতাদেরকে নির্যাতন বা হত্যা করত।

জানা যায় যে, ১৫ই এপ্রিল থেকে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩৪ দিনে এক হাজারেরও বেশি মানুষকে মহেশপুর ও ভালাইপুরে হত্যা করা হয়। ভালাইপুর গণহত্যা একাধিকবার সংঘটিত হলেও, বর্তমান প্রবন্ধে একই দিনে (২০শে মে) সংঘটিত দু'বারের গণহত্যার শিকার, গণহত্যার শিকার শহিদ পরিবারের কথা ও ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০শে মে ১৯৭১ মহেশপুরের ফতেপুরের সৃষ্টিপদ হালদার ও তাঁর মামাতো দুই ভাই শিবু হালদার ও দেবেন হালদার এবং এদের দুই ভগ্নিপতি অবনিশ হালদার ও সন্তোষ হালদার পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু হলে ভারতে চলে যান। এ সময় বনগাঁ মুক্তি বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পে দেড়মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে ১২ জনের একটি দল মহেশপুরে মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য জলিলপুরে একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। জলিলপুরের সোরাব নামে একজন টের পেয়ে মহেশপুর হাসপাতালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে খবর দেয়। ঠিক সন্ধ্যার আগে ২টি গাড়িতে পাকিস্তানি সেনারা এসে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে নিয়ে যায় আর বাকি ৫ জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাঁদের ওপর নির্মম নির্যাতন শেষে গর্তের মধ্যে ফেলে উপর্যুপরি বেয়োনেট চার্জ করা হয়। তাঁদের সকলকে মৃত ভেবে এবং হঠাৎ বৃষ্টি আসায় সামান্য মাটি চাপা দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করে। উল্লিখিত ৭ জনের মধ্যে ১ জন ছিলেন সৃষ্টিপদ হালদার (পরিচিতি তথ্য-নির্দেশে অন্তর্ভুক্ত সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য)। তিনি বেয়োনেটের খোঁচায় আহত হলেও জীবিত ছিলেন এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর চলে যাওয়ার কিছু সময় পর গণকবর থেকে কোন ক্রমে উঠে পার্শ্ববর্তী একটি বাঁওড় অতিক্রম করে বাড়িতে পৌঁছেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ক্রমান্বয়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন (বিস্তারিত, এই প্রবন্ধে প্রদত্ত তাঁর সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য)।

একইদিন (২০শে মে) দুপুর বেলা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা মহেশপুরের অরবিন্দু কুমার প্রামাণিক ও সন্ন্যাসী কুমার প্রামাণিককে এদের বাবা, জেঠাসহ ৬ জনকে ভালাইপুর বাঁশবাগানে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ঐদিন হিন্দু সম্প্রদায়ের একই পরিবারের সদস্য ও নিকট আত্মীয় ৭ জনকে ধরে নিয়ে গেলেও, ভাগ্যক্রমে বিনয় কৃষ্ণ দত্ত ওরফে দুলাল (মহেশপুর) প্রাণে বেঁচে যান (বর্তমানে মৃত)। ঘটনা পরবর্তী নিজ পরিবারের সদস্যদের নিকট সেদিনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা তিনি বর্ণনা করেন। সেদিন সেখানে ১৪-১৫ জনকে বেয়োনেটের খোঁচায় রক্তাক্ত করে গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়। পরে স্থানীয়রা একই গর্তে গণকবরে তাঁদের শায়িত করে।

গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারদান কালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নির্যাতিতের সন্তান সন্তোষ কুমার, শহিদের সন্তান অরবিন্দু প্রামাণিক, গণহত্যায় শহিদের স্ত্রী মহারাণী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোশারফ হোসেন প্রমুখ উপরিল্লিখিত বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন, যা গবেষকের নিকট সংরক্ষিত। তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ প্রবন্ধের শেষাংশে দেওয়া হয়েছে।

ভালাইপুর কপোতাক্ষ নদের তীরে হানাদার বাহিনী কত মানুষকে গণকবর দিয়েছিল আর কত লাশ ভাসিয়ে দিয়েছিল তার কোন পরিসংখ্যান নেই। অনেককে বস্তা বন্দি করে নদে ফেলে দিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেশ মুক্ত হওয়ার পরও পচা লাশ এই নদে ভাসতে দেখেছেন। এলাকাবাসীর মতে, এখানে ৫-৬শ'র বেশি মানুষ গণহত্যার শিকার হন।

২০শে মে ১৯৭১ সালে ভালাইপুরে সংঘটিত উল্লিখিত গণহত্যায় যারা শহিদ ও চরম নির্যাতনের শিকার হন, তাঁদের সকলের নাম ও পরিচয় স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তবে, যাঁদের পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে, তা পরিশিষ্ট-১ ও ২ এ তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধে তাদের পরাজয় অত্যাসন্ন দেখে ৫ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনারা মহেশপুর হাসপাতাল ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

সাক্ষাৎকার

গণহত্যার হাত থেকে প্রাণে বেঁচে আসা সৃষ্টিপদ হালদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার[৭]

সৃষ্টিপদ হালদারের শরীরে বেয়োনেটের খোঁচার দাগ

সৃষ্টিপদ হালদার (৭৩)

মৎস্যজীবী; গণকবর থেকে প্রাণে বেঁচে আসা মুক্তিযোদ্ধা। গ্রাম: ফতেপুর, ইউনিয়ন ও থানা: মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

বর্তমান গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সৃষ্টিপদ হালদার বলেন:

মুক্তিযুদ্ধকালীন আমরা ভারতের বনগাঁ অস্থায়ী ক্যাম্পে প্রশিক্ষণে ছিলাম। প্রশিক্ষণ শেষে ঐ স্থান থেকে আমাদের একই গ্রুপের ১২ জনকে পাঠানো হয় মহেশপুরে। মহেশপুরের জলিলপুর হালদারপাড়ায় আমরা অবস্থান করি। আমাদের গ্রুপের একজন কমান্ডার ছিল। আমাদের অবস্থানের সংবাদটা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে জানিয়েছিল স্থানীয় একদল পাকিস্তানপন্থি। তার মধ্যে জলিলপুরের সোরাব অন্যতম। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২০শে মে বিকেল ৫ টায় দুটি জীপ গাড়িতে করে এই গ্রামে প্রবেশ করে। হানাদার বাহিনীর সদস্য ছিল ১৫ জন। আমাদের গ্রুপের ৫ জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও, আমি সহ ৭ জন ধরা পড়ে যাই। ওরা আমাদেরকে

গাড়িতে উঠিয়ে বলছিল, 'মুক্তি হ্যায়'। আর কোনো কথা নয়। তারপর ভালাইপুর কপোতাক্ষ নদের তীরে নিয়ে যায়। চারিদিকে অনেক লাশ দেখতে পাই। পরে জেনেছি, ভারতগামী শরণার্থীদের হত্যা করে লাশ যত্রতত্র ফেলে রেখেছে। ঐ স্থানে আগে থেকেই গর্ত খোঁড়া ছিল। বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করছিল 'মুক্তি হ্যায়'! আর বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মম নির্যাতন করে গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়। প্রথমে একজনকে গর্তে ফেলার পর আমাকে ফেলল। আমার ওপরে আরও পাঁচ জনের লাশ ফেলল। আমি মারা যাইনি কিন্তু শত কষ্টেও নড়াচড়া করছিলাম না। আমার নিঃশ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। যাঁদের নাম মনে আছে সেই শহিদরা হলেন– শিবে, দেবেন, অবনিশ ও সন্তোষ হালদার (পরিচিতি পরিশিষ্ট ১-এ দ্রষ্টব্য)। আর দুজনের নাম মনে করতে পারছি না। এরপরও ওরা বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ওই ৫ জন আমার শরীরের উপরে থাকায় আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু বেয়োনেটের খোঁচা অতটা বেশি লাগছিল না। এক-দুই কোদাল মাটি চাপা দেয়ার পরপরই হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হলো। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দ্রুত গাড়িতে উঠে ঐ স্থান ত্যাগ করল। ওরা চলে যাওয়ার প্রায় ১৫ মিনিট পর আমি আস্তে আস্তে লাশগুলো ঠেলে গর্ত থেকে বের হয়ে আসলাম। তখন সন্ধ্যা ৭টা বাজে। বেশ জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। ক্রোলিং করতে করতে বাঁওড়ের অপর পাড়ে বেড়ের মাঠে সারারাত লুকিয়ে থাকলাম। পরদিন সকালবেলা বাড়ি আসলাম। মহেশপুর বাজারে অবস্থানরত আব্দুল আজিজ নামে এক ম্যাজিস্ট্রেট প্রাণভয়ে আমাদের বাড়ির পাশে আত্মগোপন করেছিলেন। উনি আমাকে উনার কাছে থাকা ওষুধপত্র দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। আস্তে আস্তে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। ঐদিন বৃষ্টি হওয়ার কারণেই আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ভালাইপুর ব্রিজ পর্যন্ত পুরোটাই বধ্যভূমি। আমার কমান্ডারসহ গ্রুপের সবাইকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যা করে। আমার এই অবস্থার কথা আমার এলাকার সবাই জানেন। অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর আমি আর যুদ্ধে যাইনি, মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতিও পাইনি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী মো: আজিজুর রহমানের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার[৮]

মোঃ আজিজুর রহমান (৭৫), পেশা: ব্যবসা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী। গ্রাম: ভালাইপুর, ইউনিয়ন: এসবিকে (সুন্দরপুর), থানা: মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

তিনি বর্তমান গবেষকের সাথে সাক্ষাৎকারে বলেন:

ভালাইপুরের দুটি স্থানে গণকবর দেওয়া হয়। এই দুটি স্থান সম্পর্কে শুধু আমি না, আমাদের বয়সী এবং ভালাইপুরের প্রবীণ লোকজন জানেন। ফতেপুরের সৃষ্টিপদ হালদারসহ কয়েকজনকে পাকিস্তানি হানাদাররা বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে গণকবরে ফেলে দেয়। তাদের মধ্যে সৃষ্টিপদ হালদার ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। আমি নিজে তাঁকে বাওড় পার করে বাড়ি পৌছে দিতে সাহায্য করি। আবার, মহেশপুরের অনেককে ধরে এনে আমাদের ভালাইপুরে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গর্তে ফেলে। সেখান থেকে দুলাল নামে একজন ২৯টি বেয়োনেটের খোঁচা খেয়েও বেঁচে যায়। তারপর দুলাল ভারতে যেয়ে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ হন। অন্যরা সবাই মারা যান। তাঁদেরকে আমরাই মাটি দিয়েছি। একদিন বিকেলে ৫/৭ জনকে হত্যা করে আমাদের সামনে কপোতাক্ষ নদে ফেলে দিল। পরের দিন দেখি তাঁদের লাশগুলো নদীতে ভাসছে। তারা সবাই বাইরের লোক ছিল; তাই নাম জানি না। শুধুমাত্র একজনের নাম শুনেছিলাম। তার নাম ছিল মন্টু। তার বাড়ি কোটচাঁদপুরের হাকিমপুরে। তাকে হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। ১৫ই এপ্রিল থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিদিন আমাদের গ্রামে বহিরাগত মানুষকে ধরে এনে হত্যা করত। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত হত্যা, নির্যাতন চলেছে। লাশগুলোকে নদে ভাসিয়ে দিত, কখনো পুঁতে রাখতো, কখনো নদের কচুরির মধ্যে ফেলে দিত। আমাদের গ্রামের একজন নারীকে ৬/৭ জন পাকিস্তানি সেনা ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে। তারপর সে অসুস্থ হয়ে যায়। কত মানুষকে যে নির্মমভাবে নির্যাতন করতে দেখেছি, তা ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে। তাঁদের আর্তনাদ শুনে সহ্য করতে পারতাম না। গণকবরের দুটি স্থানে এখন ধান চাষ করা হচ্ছে।

গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারদান কালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ, শহিদের স্ত্রী কালিদাসী, শহিদ পরিবারের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ হালদার, শহিদের সন্তান বিমল হালদার, শহিদের স্ত্রী যমুনা প্রমুখ সৃষ্টিপদ হালদার ও মোঃ আজিজুর রহমানের ন্যায় ঘটনার প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দেন, যা বর্তমান গবেষকের নিকট সংরক্ষিত। তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ প্রবন্ধের শেষাংশে দেওয়া হয়েছে।

গণহত্যার শিকার পরিবারগুলোর জীবনযাপনের হালচিত্র

মহেশপুরের ভালাইপুরে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়, সেখানে ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন শ্রেণি, পেশার মানুষ। তবে, যারা স্থানীয় অর্থাৎ ফতেপুর ও অন্যান্য গ্রামের ছিল, তাদের দেখে মর্মাহত হয়েছি। সেখানকার ৫ জন নারীর কেউ ২০, কেউ ২২ কেউ ২৫ এমন বয়সে বিধবা হয়েছেন। তাঁদেরকে পরে আর বিয়ে দেওয়া হয়নি। এরা অন্যের সংসারের সন্তান লালন-পালন সহ গৃহকর্মীর কাজ করে কোনক্রমে জীবনধারণ করেন। মহেশপুরের মহারাণী ৩ সন্তান নিয়ে ২৩ বছর বয়সে বিধবা হন। সেভাবেই অনেক কষ্টে সন্তানদের বড় করেছেন। ফতেপুরের একই পরিবারের ৪ জন শহিদ হন । তার মধ্যে শহিদ অবনিশ হালদারের স্ত্রী কালীদাসী দুই শিশু সন্তান নিয়ে মাত্র ২৩ বছর বয়সে বিধবা হন। শহিদ সন্তোষ হালদারের স্ত্রী যমুনা অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে

মাত্র ৪ মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলেন। তারপর এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তিনি। অনেক কষ্টে এই শহিদ পরিবারগুলো জীবন অতিবাহিত করছে। পুরো একটি হিন্দু পরিবারকে হানাদাররা অভিভাবকশূন্য করেছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি নারীকেও পরবর্তীতে বিয়ে দেওয়া হয়নি। তারা সেই বয়স থেকে সাদা ধুতি পরিধান করে যাচ্ছেন। এ পরিবারগুলো শুধু তাদের স্বজনদের হারায়নি, হারিয়েছে ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ। এক স্থান থেকে আরেক স্থানে আশ্রয় নিয়ে অন্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়েছে। শহিদদের সন্তান ও তাদের বর্তমান অবস্থা দেখলে কেউ অশ্রুসিক্ত না হয়ে পারবে না। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই বাবাকে হারিয়েছে সন্তান। অবার শিশু-সন্তানেরা বাবা ডাকা শেখার আগেই বাবাকে হারিয়েছে। তারা লেখাপড়া শিখতে পারেনি। বাঁওড়ে মাছ ধরে কোনভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে শহিদদের সন্তানেরা। মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে গণহত্যার শিকার পরিবারগুলোর সদস্যরা তাদের অভিজ্ঞতা হুবহু বর্ণনা করে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, স্মৃতিগুলো যেন এখনো তাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। ভুক্তভোগীরা নিদারুণ কষ্টে এত বছর পরও স্মৃতিগুলো স্মরণ করে ডুঁকরে ডুঁকরে কেঁদে উঠছেন। অল্প বয়সে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিধবা হওয়া একাধিক নারীর কান্না থামছিল না। তবে, যারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাদের বেশিরভাগ মৃত্যুবরণ করেছেন।

গণহত্যার পর বেশিরভাগ পরিবারের সদস্যরা অভিভাবকহীন অবস্থায় খুব কষ্টে বড় হয়েছে। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করে পরিবারের বোঝা টানতে কাজে ছুটতে হয়েছে। শহিদ পরিবারের সন্তানেরা জানায় যে, বাবা মারা যাওয়ার পর তাদের অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কেটেছে। কখনো সারাদিনে একবেলা খাবার জুটেছে। কত কষ্টে তারা যে বড় হয়েছে, তা বর্ণনাতীত। অনেক বিধবা নারী অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পাগলের মত ঘুরেছেন। যুদ্ধের সময় যেমন সংগ্রাম করে বেঁচেছিলেন, এখনো তারা সংগ্রাম করে যাচ্ছেন; তাদের যুদ্ধ শেষ হয়নি, অব্যাহত আছে। তারা প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন এই ভেবে–কীভাবে বেঁচে থাকবেন, পরিবারের মুখে অন্ন জোটাবেন। এক কথায়, অনেক কষ্টে কোনোভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে শহিদদের সন্তানেরা। তাদের জীবন-জীবিকার সংগ্রামের যেন কোনো শেষ নেই। কোনো কর্তৃপক্ষ থেকে তারা আজ পর্যন্ত কোন সহায়তা লাভ করেনি। কেউ এই পরিবারগুলোর কোনো খোঁজও রাখেনি। মুক্তিযুদ্ধের পর অর্থকষ্ট, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, একমাত্র অভিভাবককে হারিয়ে শহিদ পরিবারের জীবন হয়ে পড়েছে চরম দুর্বিষহ।

গণহত্যা স্থল ও গণকবরের বর্তমান অবস্থা

ভালাইপুর ব্রিজ থেকে মহেশপুর ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকা জুড়েই বধ্যভূমি। এই বধ্যভূমির কথা এলাকাবাসী জানে। আর ভালাইপুরের যে দুই জায়গায় গণকবর আছে, সেখানে কোনো শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ বা স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়নি। শহিদদের নামের তালিকা বা নামফলকও নেই। সেখানে বাগান ছিল। বাইরের গ্রাম থেকে ধরে এনে এই গ্রামে লোকজনকে

হত্যা করা হয়। সরকারি, বেসরকারি, স্থানীয় বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে কোনো স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়নি। করার কোন পরিকল্পনাও নেই। এখন সেখানে ধান চাষ হচ্ছে।

বর্তমান প্রজন্ম তথা এলাকাবাসীও এখানকার গণহত্যা সম্পর্কে তেমন অবহিত নন। তাছাড়া, বর্তমান অবস্থায় শহিদদের স্মৃতি সংরক্ষণে নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এখানে গণহত্যা দিবস পালন করা হয় না। শুধুমাত্র মহেশপুরের দুলাল আর ফতেপুরের সৃষ্টিপদ, যাঁরা সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন, তাদের মাধ্যমে এখানকার গণহত্যার নির্মমতা সম্পর্কে শহিদদের স্বজনেরা ও এলাকাবাসী জানতে পারে। গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি, দেশের অনেক বধ্যভূমি ও গণকবরের মতো ভালাইপুর গণহত্যা স্থলও উপেক্ষিত। ভালাইপুর কপোতাক্ষ নদের পাড় ও মাঠের মধ্যে বাঁশবাগানে দুটি স্থানে গণহত্যা সংঘটিত হলেও, গণমাধ্যমে এর তেমন কোনো প্রকাশ-প্রচার নেই। আবার মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে নিয়ে গিয়ে গণকবর দেওয়া হয়। সেসব মুক্তিযোদ্ধা কোনো স্বীকৃতি পাননি।

ভালাইপুর গণকবর দুটি বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা দরকার। এখানে একটি স্মৃতিফলক নির্মাণ করে তার গায়ে শহিদদের নাম লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। তাহলে মানুষ জানতে পারবে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতা ও শহিদদের আত্মদানের কথা।

সারসংক্ষেপ

কপোতাক্ষ নদ খননের পর মহেশপুর ও ভালাইপুর গণহত্যার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, আওয়ামী লীগ, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক বিশেষ করে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করাই ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মূল লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য অঞ্চল থেকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা শেষে ভালাইপুরে গণকবর দেওয়া হয়। আবার জলিলপুর থেকে ধরে এনে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গর্তে মানুষজন স্তূপ করে রেখে বর্বর হানাদাররা চলে যায়। মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার কারণে অনেক সময় মাটি চাপা দিতে পারেনি।

তৃতীয়ত, এই গণহত্যায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, এর পক্ষের বা সমর্থক বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসররা, আল-বদর ও তথাকথিত শান্তি কমিটির সদস্যরা ধরিয়ে দিতে ও তাদের বাড়ি-ঘর শনাক্ত করতে সহায়তা করে।

চতুর্থত, বাড়ি বাড়ি গিয়ে আইডি কার্ড ('ডান্ডি কার্ড' নামে পরিচিত) দেওয়া বা ভিন্ন মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নিরীহ মানুষকে ধরে এনে হত্যা করা হয়।

পঞ্চমত, কপোতাক্ষ নদের পাশে ভালাইপুর গ্রাম হওয়ায় অধিকাংশ সময় এখানে মানুষ হত্যা করে নদে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে বলে ভালাইপুর-ফতেপুরের যাঁরা ঘর ছেড়েছিলেন, তাঁদের দলের একজন বাদে সবাই গণহত্যার শিকার হন।

ষষ্ঠত, দেশকে মুক্ত করতে গিয়ে শহিদ হওয়ার পর শহিদদের পরিবারগুলো চরম দরিদ্রতার সাথে লড়াই করে বেঁচে আছে। শহিদরা পাননি মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি। মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ রাজনীতি এবং নীতি নির্ধারকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদদের স্বীকৃতি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

উপসংহার

যশোর সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ার কারণে এখানে অনেক যুদ্ধ ও প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়েছে। শরণার্থীরা এখান থেকে যাওয়ার সময় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এখানে অসংখ্য বধ্যভূমি-নির্যাতনকেন্দ্র ও গণকবর রয়েছে। তারমধ্যে মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড ও ভালাইপুরের পাশাপাশি অবস্থান হওয়ায় পুরো এলাকাজুড়ে হত্যাকাণ্ড হয়েছে। পাশাপাশি হলেও দুটি আলাদা স্পট। একটি মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড অপরটি ভালাইপুর গণহত্যাস্থল। প্রথমটি সম্বন্ধে বর্তমান গবেষকের লেখা একটি প্রবন্ধ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ভালাইপুর গ্রাম গণহত্যা এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। এই বধ্যভূমি সম্পর্কে কেউ কোনো লেখালেখি বা গবেষণাকর্ম করেননি। বর্তমান গবেষক এখানকার গণহত্যা ও গণকবরের সর্বপ্রথম সন্ধান পান।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কারো সন্তান, কারো বাবা, কারো ভাই, কারো বোনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তারা আর ফিরে আসেনি। মুক্তিযুদ্ধের ৫৪ বছর পরও শহিদ পরিবারগুলো জানে না কীভাবে, কোথায়, কেমন করে তাদের আপনজনদের হত্যা করা হয়েছে। স্বজন হারানো পরিবারগুলো আজও মনে করে, হয়তো তাঁরা বেঁচে আছেন এবং ফিরে আসবেন। নদী খনন করার সময় ভেকুরের মাথায় (খনন যন্ত্র) উঠে আসা হাড় ও খুলিগুলোর সংবাদ পেয়ে এই পরিবারগুলো ছুটে এসেছিল দেখতে। হয়তো তাদের সেই প্রিয় স্বজনকে এখানেই পুঁতে রাখা হয়েছিল। এটাই হয়তো তাদের প্রিয় বাবা, ভাই, বোন, স্বামী বা সন্তানের খুলি ও হাড়। তারা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। স্বজন হারানোর বেদনা যে কতটা বেদনাদায়ক, যিনি হারিয়েছেন তিনিই তা উপলব্ধি করতে পারেন।

ভালাইপুর বধ্যভূমি, গণহত্যা, গণকবর এতকাল অনাবিষ্কৃত ছিল। এই প্রথমবার বর্তমান গবেষক তার গবেষণাকর্মের মধ্য দিয়ে এ সম্পর্কে জানতে সক্ষম হন। পাঠকবর্গ গবেষণাকর্মটি সম্বন্ধে জানতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে যারা গবেষণা করবেন, তাদের জন্য এই গবেষণাকর্মটি সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস। বিশেষ করে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণাকর্মটি একটি নতুন সংযোজন।

পরিশিষ্ট ১

ভালাইপুর গণহত্যায় শহিদদের শনাক্তকরণ

ভালাইপুর গণহত্যার শহিদদের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা সম্ভব নয়। তবে, অসংখ্য মানুষ এখানে হত্যার শিকার হন বলে জানা যায়। তাঁদের পরিচয়ও অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞাত। অনেকে ছিলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভারতগামী শরণার্থী। স্থানীয় শহিদ পরিবারের সদস্যরা মনে করেন যে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা তাদের স্বজন ও অন্যান্যকে ধরে এনে হত্যা করার পর ভালাইপুর কপোতাক্ষ নদে ভাসিয়ে দেয়। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে তুলে এনে নির্মম নির্যাতনের পর এখানে গণকবর দিয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী ও শহিদ পরিবারের বয়ানে জানা যায়। শুধুমাত্র সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে যেসব শহিদের নাম-পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, নিচে তা প্রদত্ত হলো:

ক্রম	নাম	পিতার নাম	গ্রাম
১	অজিৎ কুমার প্রামানিক	কার্তিক চন্দ্র প্রামানিক	মহেশপুর
২	গোবিন্দ কুমার প্রামানিক	কার্তিক চন্দ্র প্রামানিক	মহেশপুর
৩	অবনিশ চন্দ্র হালদার	অজ্ঞাত	ফতেপুর
৪	দুলাল চন্দ্র বনিক	অজ্ঞাত	মহেশপুর
৫	মন্টু	অজ্ঞাত	হাকিমপুর
৬	শিবে	বসন্ত	ফতেপুর
৭	দেবেন	বসন্ত	ফতেপুর
৮	অবনিশ	অমূল্য	জলিলপুর
৯	সন্তোষ হালদার	সুরিন হালদার	কোটচাঁদপুর

পরিশিষ্ট ২

ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতদের তালিকা

ভালাইপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নির্যাতিত ব্যক্তি ও ভুক্তভোগীদের অনেকে বেঁচে আছেন এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও অনেকে জীবিত আছেন। নির্যাতিত কিছু ব্যক্তি ও ভুক্তভোগীদের তালিকা নিচে প্রদান করা হলো:

ক্রম	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	বিবরণ
১.	সৃষ্টিপদ হালদার	গোবতীপদ হালদার	ফতেপুর	তাঁর শরীরের ঘাড়, উরু এবং বিভিন্ন জায়গায় বেয়োনেটের খোঁচা আছে। তাঁর ভাষ্য প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে।
২.	বিনয় কৃষ্ণ দত্ত (দুলাল)	ইশ্বর নন্দলাল দত্ত	মহেশপুর	তাঁর শরীরে ২৯ জায়গায় বেয়োনেটের খোঁচা ছিল।
৩.	মফিজউদ্দীন ফকির	তাজউদ্দিন ফকির	যোগীহুদা	তার বাবাকে ধরে এনে কপোতাক্ষ নদের তীরে হত্যা করা হয়। যখন তার

				বাবাকে হানাদাররা ধরে আনে, তখন সে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করায় তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে তার শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় এবং তা নিয়েই সে বেঁচে আছে।
৪.	বুলি	অজ্ঞাত	ভালাইপুর	তিনি রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। ৭/৮ জন পাকিস্তানি সেনা রান্নাঘরে ঢুকে তাঁর উপর নির্মম পাশবিক নির্যাতন চালায়।

পরিশিষ্ট ৩

মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড গণহত্যায় শহিদদের শনাক্তকরণ

মহেশপুরের বধ্যভূমির শহিদদের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না। তবে এক হাজারের অধিক মানুষ এখানে হত্যার শিকার হয় বলে জানা গেছে। তাদের অধিকাংশের পরিচয় অজ্ঞাত। সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে যাদের নাম-পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, নিম্নে ছক আকারে তা প্রদত্ত হলো:

ক্রম	নাম	পিতার নাম	গ্রাম
১	আবুল হোসেন বিশ্বাস	ফজলুর রহমান বিশ্বাস	যাদবপুর
২	নুরুল ইসলাম বিশ্বাস	আবুল হোসেন বিশ্বাস	যাদবপুর
৩	মফেজ উদ্দিন	বাবর আলী	গয়েশপুর
৪	সিরাজুল ইসলাম	মফেজ উদ্দিন	গয়েশপুর
৫	তোফাজ্জেল হোসেন	মফেজ উদ্দিন	গয়েশপুর
৬	শামসুল হক মোল্লা	জমির হোসেন মোল্লা	ধান্যহাড়িয়া
৭	দাউদ হোসেন	মফিজ উদ্দিন	কৃষ্ণপুর
৮	আনিচ উদ্দিন	কাবিল হোসেন মন্ডল	কৃষ্ণপুর
৯	নুর আলী	কদম আলী	কৃষ্ণপুর
১০	মোজাম্মেল হক	কাঠু মোল্লা	কৃষ্ণপুর
১১	শাহেদ আলী ব্যাপারী	রজব আলী ব্যাপারী	কৃষ্ণপুর
১২	লুৎফর রহমান	অজ্ঞাত	কৃষ্ণপুর
১৩	নাজিম উদ্দিন	পরশ মন্ডল	মহেশপুর ক্যাম্প
১৪	শেখ জালাল উদ্দিন	-	মহেশপুর
১৫	মোংলা বিশ্বাস	রামলাল বিশ্বাস	জলিলপুর
১৬	গণি হাজি	কলিমদ্দিন ব্যাপারী	পান্তা পাড়া
১৭	লালু দেওয়ান	উসমান দেওয়ান	পান্তা পাড়া
১৮	জালাল	রিয়াজউদ্দীন	জলিলপুর
১৯	মুলা ছুতর	অজ্ঞাত	জলিলপুর

২০	মঈন উদ্দীন	দীন মোহাম্মদ	উড়বাড়ি
২১	রওশন আলী	মোবারেক বিশ্বাস	ভালাইপুর
২২	তোফাজ্জেল হোসেন	ফজলুল করিম	পান্তাপাড়া
২৩	শাজাহান	ইদবার মন্ডল	সাড়াতলা
২৪	মফিজুর রহমান	রাজা মিয়া	ফতেপুর
২৫	বাচ্চু মিয়া	আকবার আলী	ঘুগরি
২৬	সেকেন্দার আলী	জাফর আলী	পান্তাপাড়া
২৭	তবদিন হোসেন	আক্কল আলী	পীরগাছা
২৮	আইউব হোসেন	কেনু মদ্দিন শেখ	সেজিয়া
২৯	হাবিবুল্লাহ সরকার	আঃ লতিফ সরকার	রঘুনাথপুর
৩০	সানোয়ার রহমান	কালু মন্ডল	মান্দারবাড়িয়া
৩১	খোকা	অজ্ঞাত	মহেশপুর
৩২	মোঃ মফিজউদ্দিন	মোবারক মন্ডল	ভবনগর
৩৩	অহেদ আলী	কালুপাচু	জলিলপুর
৩৪	হেমন্ত মিস্ত্রি	অজ্ঞাত	মহেশপুর
৩৫	আহম্মদ আলী	হাসান আলী	যোগীহুদা
৩৬	আঃ আজিজ	জনাব আলী	যোগীহুদা
৩৭	আঃ হাই	হাফিজ মৌলবী	যোগীহুদা
৩৮	শামসুর রহমান	আহম্মদ আলী	যোগীহুদা
৩৯	হাসমত আলী	ঈমান আলী	যোগীহুদা
৪০	তাজউদ্দিন ফকির	আফাজউদ্দিন ফকির	যোগীহুদা

পরিশিষ্ট ৪

মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড গণহত্যার ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতদের তালিকা

মহেশপুর বাসস্ট্যান্ডের পার্শ্ববর্তী হাসপাতাল ক্যাম্পে হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের ভুক্তভোগীদের অনেকে এখনো বেঁচে আছে এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাও অনেকে জীবিত রয়েছে। আবার, অনেকে ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। নিচে নির্যাতিত ব্যক্তি ও ভুক্তভোগীদের তালিকা (অসম্পূর্ণ) প্রদত্ত হলো:

ক্রম	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	বিবরণ
১	কাজী আব্দুল জলিল	কাজী আব্দুল আলিম	মহেশপুর	তাঁর ছেলে যুদ্ধে যাওয়ার কারণে ৪দিন তাঁকে ক্যাম্পে আটকে রেখে নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। পরবর্তীতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সে যন্ত্রণা বয়ে বেড়িয়েছেন। ছেলেকে হানাদারদের হাতে যে-কোনো সময় তুলে দেবেন মর্মে লিখিত দিলে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়।

২	মোহাঃ সিদ্দিক মাস্টার	অজ্ঞাত	উজ্জলপুর	পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাকে হাসপাতালের ক্যাম্পে আটক রেখে নির্যাতন করে। একদিন রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ায় ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ওখানকার পাহারারত সৈনিকরা ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের তিন জনকে যে কক্ষে আটকে রেখেছিল তার জানালাগুলো ছিল দুর্বল। তাই, তারা বৃষ্টির মধ্যে জানালা ভেঙে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
৩	মোছাঃ আকলিমা খাতুন	আঃ রশিদ মিয়া	উজ্জলপুর	বর্ণির আব্দুল মান্নান রাজাকার তাকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পে দেয়। ক্যাম্পে হানাদার বাহিনী কর্তৃক ৪দিন পাশবিক নির্যাতন শেষে ছাড়া পান।
৪	রোকেয়া খাতুন	জুলহাস	উজ্জলপুর	বর্ণির আব্দুল মান্নান রাজাকার তাকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানি ক্যাম্পে দেয়। ক্যাম্পে রেখে ৪ দিন পাশবিক নির্যাতনের পর ছাড়া পান।
৫	আবুল কাশেম			হানাদারদের ক্যাম্পে রেখে তার ওপর নির্মম নির্যাতন করা হয়।
৬	ঝড়ু			ক্যাম্পে রেখে নির্মম নির্যাতন করা হয়। তৎকালীন ইউনিয়ন পরিষদ সভাপতি মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।
৭	সামছুল ফকির	তাজউদ্দিন ফকির	যোগীহুদা	তার পায়ে বন্দুকের বাট দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা প্রচণ্ড নির্যাতন করে। এখনও তাঁর পা বাঁকা হয়ে আছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

সৃষ্টিপদ হালদার (৭০)

পেশা: মৎস্যজীবী, গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধা। পিতা: গোবতীপদ হালদার, গ্রাম: ফতেপুর, ডাকঘর: মহেশপুর, থানা: মহেশপুর, জেলা ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৮জুন ২০২২

বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ (৭০)

পেশা: কৃষি। পিতা: জবেদ আলী বেপারী, গ্রাম: ফতেপুর (বেড়ের মাঠ), ডাকঘর: কানাইডাঙ্গা, থানা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষ, ৬ জুন ২০২২

কালিদাসী (৭৫)
পেশা: গৃহকর্মী ও শহিদের স্ত্রী। পিতা: বসন্ত হালদার, গ্রাম: ফতেপুর, ডাকঘর: কানাইডাঙ্গা থানা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১১ জুন ২০২২

গোবিন্দ (৬৩)
পেশা: মৎস্যজীবী। পিতা: ভূপতি কুমার হালদার, গ্রাম: ফতেপুর, ডাকঘর: কানাইডাঙ্গা থানা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১১ জুন ২০২২

ধীরেন্দ্রনাথ হালদার (৬৮)
পেশা: মৎস্যজীবী, শহিদ পরিবারের সদস্য। পিতা: বসন্ত হালদার, গ্রাম: ফতেপুর, ডাকঘর: কানাইডাঙ্গা থানা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১১ জুন ২০২২

বিমল হালদার (৫৫)
পেশা: মৎস্যজীবী, শহিদের সন্তান। পিতা: অবনিশ হালদার, গ্রাম: ফতেপুর, ডাকঘর: কানাইডাঙ্গা থানা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১১ জুন ২০২২

যমুনা (৭১)
পেশা: গৃহকর্মী, শহিদের স্ত্রী। পিতা: বসন্ত হালদার, গ্রাম: ফতেপুর, ডাকঘর: কানাইডাঙ্গা থানা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১১ জুন ২০২২

সন্তোষ কুমার (৬০)
পেশা: অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, নির্যাতিতের সন্তান। পিতা: বিনয় কৃষ্ণ দত্ত, গ্রাম: মহেশপুর পোস্ট অফিসপাড়া, ডাকঘর: মহেশপুর, থানা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১১ জুন ২০২২

অরবিন্দু প্রামানিক (৬৫)
পেশা: কৃষি, শহিদের সন্তান। পিতা: শহিদ অজিত কুমার প্রামাণিক, গ্রাম: মহেশপুর, ডাকঘর ও থানা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, মহেশপুর ৬ জুন ২০২২

মহারাণী (৭৫)
পেশা: গৃহিণী, গণহত্যায় শহিদের স্ত্রী। পিতা: ননি প্রামাণিক, গ্রাম: মহেশপুর, ডাকঘর: মহেশপুর, থানা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, মহেশপুর, ৬ জুন ২০২২

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোশারফ হোসেন (৬৭)
পেশা: চাকরি (অবসরপ্রাপ্ত), পিতা: মৃত নূর-বকসো দফাদার, গ্রাম: মহেশপুর, ডাকঘর: মহেশপুর, থানা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষ, মহেশপুর, ৬ জুন ২০২২

মোঃ আব্দুর রহমান (৬০)
পেশা: মানবাধিকার কর্মী ও সভাপতি, মহেশপুর প্রেসক্লাব। পিতা: ইমান আলী ধাবক, গ্রাম: ফতেপুর, ডাকঘর: কানাইডাঙ্গা, থানা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ অফিস, ১১ জুন ২০২২

মোঃ আজিজুর রহমান (৭০)
পেশা: ব্যবসা, মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী। পিতা: হানেফ আলী বিশ্বাস, গ্রাম: ভালাইপুর, ইউনিয়ন: এস কে বি (সুন্দরপুর), থানা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৩ জুলাই ২০২২

বই ও গবেষণাকর্ম

আলোকচিত্র

(পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের ক্যাম্প, গণহত্যাস্থল, উদ্ধারকৃত হাড়-গোড়)

১. মহেশপুরের এই হাসপাতালে ছিল পাকিস্তানি সেনাক্যাম্প। এখানে ১৫০ জনের মতো পাকিস্তানি সেনা অবস্থান করত

২. মুক্তিযুদ্ধকালে মহেশপুর হাইস্কুলে রাজাকার ক্যাম্প

৩. মুক্তিযুদ্ধকালে মহেশপুর থানায় রাজাকার ক্যাম্প

৪. ভালাইপুরে কপোতাক্ষ নদের তীর থেকে উদ্ধারকৃত খুলি ও হাড়।
খুলনাস্থ ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন জাদুঘর ও আর্কাইভস-এ সংরক্ষিত

৫. ভালাইপুর গণকবর স্থল (বর্তমানে চাষের জমি)

৬. মহেশপুর বাসস্ট্যান্ডে কপোতাক্ষ নদের তীর থেকে প্রাপ্ত খুলি ও হাড়

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ দ্রষ্টব্য, 'মুক্তিযুদ্ধে নারী', হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ৮ম খণ্ড, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০২০, পৃ. ১৫৪; আরও দ্রষ্টব্য, সুরমা জাহিদ, জান্নাত-এ ফেরদৌসী ও হারুন-অর-রশিদ, 'মুক্তিযুদ্ধে বীরাঙ্গনা', হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ৮ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮-১৭৬

২ দ্রষ্টব্য, পারভীনা খাতুন, 'মুক্তিযুদ্ধে যশোরে গণহত্যা ও নির্যাতন', জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভের উপসংহার।

৩ আসাদুজ্জামান আসাদ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, আগামী প্রকাশনী ১৯৯৪; সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী ২০০০; *বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*, *মুক্তিযুদ্ধে সামরিক অভিযান*, ৭ম খণ্ড, এশিয়া পাবলিকেশন ২০১৫; সুকুমার বিশ্বাস, *অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও তার দোসরদের তৎপরতা*, ঢাকা: সুবর্ণ ২০০১; রুকুনউদ্দৌল্লাহ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী ২০১৭; সাজেদ রহমান, *রণাঙ্গনে যশোর*, ঢাকা: আজকের বই পাবলিকেশন ২০২২; আরও দ্রষ্টব্য, হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ১০ খণ্ড; মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বাদশ খণ্ড, ঢাকা, সময় প্রকাশন ২০১৩; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল পত্র*, ১৫ খণ্ড, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২

৪ মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড গণহত্যার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে বর্তমান গবেষক প্রত্যক্ষদর্শী, নির্যাতিত, গণহত্যায় শহিদ পরিবারের স্বজন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় লোকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। দ্রষ্টব্য, পারভীনা খাতুন, 'মহেশপুর বাসস্ট্যাণ্ড গণহত্যা'. গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ ৫; ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, ২০২২, পৃ. ৭৮-১২৫

৫ মহেশপুরে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্লাটুন কমান্ডার ছিল কুখ্যাত মেজর আনিছ খান। তার নির্দেশে সৈন্যরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন ধরে আনত। এনে নির্যাতন কক্ষে বন্দি করে রাখতো। সেখান থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কয়েকজনকে বের করে নিয়ে কপোতাক্ষ নদের তীরে তাদের দিয়ে গর্ত খুঁড়ে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার মধ্যে তাদেরকে ফেলে দিত। কেউ কেউ মারা যেত, আবার কাউকে অর্ধমৃত অবস্থায় মাটিচাপা দিত।

৬ মেজর আব্বাস ছিল মহেশপুর হাসপাতাল পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পের দায়িত্বে। নিষ্ঠুর-নির্দয় হিসেবে তার কুখ্যাতি ছিল। স্থানীয় রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসদের সহযোগিতায় সে নিরীহ মানুষদের ধরে এনে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করত, হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালাত। শুরুতে হিন্দুদের দেখলেই মেরে ফেলত। পরে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাঁদের পরিবারের লোকদের হত্যা ও নির্যাতন শুরু করে।

৭ সৃষ্টিপদ হালদার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: তাঁর নিজ বাড়ি, ৮ই জুন ২০২২

৮ মোঃ আজিজুর রহমান-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: তাঁর নিজ বাড়ি, ৩রা জুলাই ২০২২

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.005

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মানুষের অন্বয়

মোঃ মোকাদ্দেস-উল-ইসলাম*

সারসংক্ষেপ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) বাংলা কথাসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ নাম। কল্লোল (১৯২৩) পত্রিকার কালের তরুণ লেখকদের রচনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের অস্থিরতা, সংশয়, নাস্তিক্য মনোভঙ্গি, রোমান্টিক বিদ্রোহ ও লোকজ সংস্কৃতির প্রতি অস্বীকৃতিমূলক মনোভাব প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রায় সমকালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের মতো তিনি পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুগামী ছিলেন না। প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীরযোগ। একান্ত পরিচিত বিষয়, চরিত্র এবং প্রকৃতির মিশেলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প অসামান্যতা অর্জন করেছে। সাধারণের ভেতরেই তিনি দেখেছেন সৌম্য, শাশ্বত ও পরিপূর্ণ জীবন। প্রায় ঊনত্রিশ বছর (১৯২২-১৯৫০) তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে সমগ্ররূপে দেখেছেন। মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই তিন মিলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যলোক গড়ে উঠেছে। তিনি যে সামগ্রিক জীবনের শিল্পী তার পরিচয় তাঁর ছোটগল্পেই পাওয়া যায়। বর্তমান আলোচনায় তাঁর ছোটগল্পে প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মানুষের অন্বয়সূত্রের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: প্রকৃতি, মানুষ, ঈশ্বর, ছোটগল্প, সমগ্র জীবনবোধ।

১. ভূমিকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতিসংলগ্নতা থাকলেও মূলত তিনি তন্বিষ্ঠ মানবপ্রেমিক। তাঁর ছোটগল্পে আড়ম্বরহীন বিচিত্র মানুষের সংযোজনা লক্ষণীয়। তাঁর উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পে মানুষ প্রাধান্য পেয়েছে কারণ ছোটগল্পে 'বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর দর্শন' সম্ভব হলেও উপন্যাসের দাবি বিশদ জীবনাভিজ্ঞতা। বিচিত্র মানুষের কাহিনিতে সাজানো তাঁর ছোটগল্পের পরিসর নিতান্ত ছোট নয়। প্রকৃতির সমান্তরালে মানুষের প্রতি তাঁর হৃদয়ের উদ্বেল আকুতি, মমতাপূর্ণ ভালোবাসা সর্বোপরি জীবনের প্রতি তাঁর সূক্ষ্ম অভিনিবেশ প্রণিধানযোগ্য। মানুষ ও প্রকৃতির প্রাণপ্রাচুর্যে অবগাহন করতে এবং নিজেকে নবতর জীবনরসে অভিসিঞ্চিত করতেই তিনি নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর দিনলিপি ও ভ্রমণবৃত্তান্ত তারই স্বাক্ষর বহন করে। মানুষ ও প্রকৃতিকে জানার অদম্য আগ্রহ নিয়ে 'গোরক্ষা প্রচারণী সংস্থা'র ভ্রাম্যমাণ প্রচারক হিসেবে পূর্ববাংলা (কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, মাদারিপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, মংডু, সীতাকুণ্ড, আগরতলা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালি প্রভৃতি) ও আরাকান অঞ্চল এবং উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলার 'বিক্রমখোল' ভ্রমণের বৃত্তান্ত তাঁর *অভিযাত্রিক* (১৯৪১) গ্রন্থে পাওয়া

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।

যায়। এছাড়া *বনে পাহাড়ে* (১৯৪৫) দিনলিপিতে ছোটনাগপুর অঞ্চলের সিংভূম, রাঁচি জেলার সারাণ্ডা, কোলাহান প্রভৃতি ভ্রমণ করে অরণ্যের শোভার পাশাপাশি অরণ্যবাসী মানুষের জীবনপ্রণালিও তুলে এনেছেন। তিনি মানুষের সত্যিকার ইতিহাস লিখতে চান। ইতিহাস সাধারণত বিজয়ী বীরদের নিয়ে লেখা হয়। জীবনযুদ্ধে ধ্বস্ত ও বিজিত নিতান্ত সাধারণ মানুষের জীবনের ইতিহাস কোথাও লেখা হয় না, ফলে জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এদের জীবনগাথাও মহাকালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, এইসব জীবন সাহিত্যে ধারণ করলে সামাজিক ইতিহাস হিসেবে খুব সূক্ষ্ম খাঁটি বিস্তৃত এবং পাকা দলিল হিসেবে মূল্যায়িত হবে। তিনি তাঁর দিনলিপি *অভিযাত্রিক*-এ বলেন: '[...] কিন্তু আরো সূক্ষ্ম আরো তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চাই। আজকের তুচ্ছতা হাজার বছর পরের মহাসম্পদ। মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়। কাবুল যুদ্ধ কি করে জয় করা হয়েছিল, সেসবের চেয়েও খাঁটি ইতিহাস।'[১] এসব তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস লেখা হলে ইতিহাসের যে অপূর্ণতা ও সুগভীর ফাঁক তা পূর্ণতা পাবে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন তাদের জীবনের তুচ্ছ ও সূক্ষ্ম আনন্দ-বেদনার পরিচয় সম্যকরূপে আত্মস্থ করে তাঁর সাহিত্যে ধারণ করার প্রয়াসে। যেসব মানুষের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগেনি, আপাতদৃষ্টিতে যারা তুচ্ছ, অকৃতার্থ, অসফল তাদের প্রত্যেকের বিচিত্র জীবনানুভূতির সন্ধান করেছেন গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান গবেষণায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সম্পর্কের অন্বয় এবং বিধৃত মানুষের বৈচিত্র্যের করণকৌশল অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

২. প্রকৃতি ও ঈশ্বর

ইংরেজি সাহিত্যে প্রকৃতির কবি হিসেবে জর্জ গর্ডন বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪), জন কিটস (১৭৯৫-১৮২১), স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪), পার্শি বিশি শেলী (১৭৯২-১৮২২), টমাস স্টেয়ার্নস এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫), উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের কবিতায় প্রকৃতি পরিচর্যার ভিন্নতার মধ্যে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। জর্জ গর্ডন বায়রন যিনি 'লর্ড বায়রন' নামে সমধিক পরিচিত তাঁর কবিতায় প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ উঠে এসেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো 'Don Juan', 'Childe Harold's Pilgrimage', 'She Walks in Beauty'. জন কিটসকে 'সৌন্দর্যের কবি' ও 'ইন্দ্রিয়পরায়ণ কবি' বলা হয়। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির সাধারণ রূপ এমন অসাধারণ চিত্ররূপময়তায় উদ্ভাসিত হয় যেন তা পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। 'Ode to a Nightingale', 'To Autumn', 'Ode on a Gracian Urn' তাঁর বিখ্যাত কবিতা। জন কিটসের কবিতার চিত্ররূপময়তার সঙ্গে বাংলার নির্জনতার কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কবিতার গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ তাঁর কবিতায় সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্ব খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর *The Rime of the Ancient Mariner*-এ আলবাট্রস পাখিকে হত্যা করার ফলে গভীর সমুদ্রে নৌকায় অবস্থানকালে এনসিয়েন্ট ম্যারিনারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া পাপ (Crime), শাস্তি (Punishment) ও মুক্তির (Salvation) প্রতীকায়িত বহিঃপ্রকাশ অসাধারণত্বের মহিমা বহন করে। পার্শি বিশি শেলী

তাঁর কবিতায় বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা সহযোগে প্রকৃতির প্রবহমানতার রূপের ব্যাখ্যানে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর 'The Cloud' কবিতায় পানি থেকে মেঘের সৃষ্টি, সেটা ঘনীভূত হয়ে আবার বৃষ্টির পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার বর্ণনা কবির বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচায়ক। টমাস স্টেয়ার্নস এলিয়টের কবিতায় প্রকৃতির ধূসর রূপটি উঠে এসেছে। তাঁর বিখ্যাত রচনা *The Waste Land*। তিনি ১৯৪৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রকৃতি-মনস্কতার জন্য ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচিত কবিতাগুলো স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর এবং স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ-এর সম্মিলিত প্রয়াসে প্রকাশিত হয় *Lyrical Ballads* (1798). এছাড়া তাঁর 'The prelude', 'Tintern Abbey', 'Three years she grew', 'Immortality Ode' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতির প্রাণবন্ত উপস্থাপনা পাঠকের মর্মমূলে ভাস্বর হয়ে আছে। ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি-চেতনার সাদৃশ্য বিদ্যমান। সমালোচক রামজি লাল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার পরিচর্যা সম্পর্কে বলেছেন:

> In *Tintern Abbey* also Wordsworth traces the development of his love for Nature. In his boyhood Nature was simply a playground for him. At the second stage he began to love and seek Nature but he was attracted purely by its sensuas or aesthetic appeal. Finally, his love for Nature aquired a spiritual and intellectual character and he realized Nature's role as a teacher and educator.[২]

তাঁর কবিতার মধ্যে চারটি পরিচর্যা আছে– প্রথমত, শৈশবের স্মৃতিসমৃদ্ধ প্রকৃতির রূপ তিনি এঁকেছেন তাঁর কবিতায়। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর 'লুসি' ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* উপন্যাসের 'অপু' সমগোত্রীয়। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভেতরে তিনি বিশ্বশিল্পীকে দেখেছেন, তাঁর কবিতায় সর্বেশ্বরবাদের প্রভাব পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণের 'বিশ্বশিল্পী', 'মাকাল-লতার কাহিনী', 'কুশল পাহাড়ী' গল্পে প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভেতরে বিশ্বস্রষ্টার উপস্থিতির অনুভব সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) প্রভাবের বিষয়টি স্পষ্ট করে। তাঁর 'মড়িঘাটের মেলা' ছোটগল্পে কথকের প্রশ্নের উত্তরে বুনো সাধুর স্পষ্ট উচ্চারণ সর্বেশ্বরবাদের প্রমাণ– '[...] এখানকার গরীব লোকে পয়সা খরচ করে গঙ্গায় নাইতে যেতে পারে না মাঘী পূর্ণিমায়। তাই রটিয়ে দিয়েছি মা গঙ্গা এই মড়িঘাটের গাঙে আসবেন বলেচেন আমার কাছে পূর্ণিমার যোগের দিন। মন শুদ্ধ করে নাইলে এখানেই গঙ্গা! তিনি নেই কোন্ জায়গায়?'[৩] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপিগুলোতেও তাঁর সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মনের পরিচয় পাওয়া যায় :

ক. 'নদীজলে বিকেলে নাইতে নেমে ইছামতীর কালো জলে দেখি ভগবানের আর একটি রূপসৃষ্টি।

যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে
যিনি শোভন এ ক্ষিতিতলেতে

উপনিষদের ঋষিরা শুধু দার্শনিক ছিলেন না, দ্রষ্টা ছিলেন, কবি ছিলেন।'[৪]

খ. 'আমি ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই। তাঁর এই লক্ষ বিরাট রূপের মধ্য দিয়ে।'[৫] তৃতীয়ত, প্রকৃতির মধ্যে তিনি শুশ্রূষার শক্তি দেখেছেন; ধ্বস্ত, আহত ও ক্লান্ত প্রাণে নিবিড় প্রকৃতির সান্নিধ্যে

এর অন্তর্নিহিত শক্তি আত্মস্থ করলে প্রশান্তি অর্জনের সম্ভাব্যতার কথা বলেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির মাঝে অবগাহনের মাধ্যমে 'Tranquil Restoration' বা 'প্রশান্তি পুনরুদ্ধারে'র কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রকৃতির মাঝে যে প্রশান্তি আছে তা প্রকৃতির সান্নিধ্যে না গেলে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শহুরে যান্ত্রিক জীবন ও সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলেছেন: 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।' এ যেন প্রকৃতির বুকে আশ্রয়ের জন্য লালায়িত ও দুর্বিষহ নাগরিক জীবনের প্রতি সংক্ষুব্ধ প্রাণের মর্মান্তিক আত্ম-চিৎকার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতির মাঝে প্রতিনিয়ত বিচরণের আপ্রাণ আকাঙ্ক্ষা না থাকলেও 'কবি' গল্পে রঘুনাথ দাসের সাহিত্যচর্চার কুটির দেখে জায়গাটি কিনে সেখানে বসবাসের ইচ্ছাপোষণ করেন। কিন্তু গ্রামে নাগরিক সুবিধার অভাবহেতু পরবর্তী সময়ে দমে যান। গ্রামে প্রকৃতি থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নগরকে গ্রামে রূপান্তরিত করার অলীক আশাবাদ ব্যক্ত করেননি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দিনলিপিতে ক্লান্ত মনের শুশ্রূষার জন্য একা প্রকৃতির মাঝে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। দিনলিপি *অভিযাত্রিক*-এ তিনি বলেন:

> প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের যেতে হয় একাকী, তবেই প্রকৃতির রানী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন দর্শকের সামনে, নতুবা নয়। চুপ করে বসে থাকতে হয়, একমনে ভাবতে হয়, মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে দেখলে মনে আপনিই কত ভাবনা এসে পড়ে। [...] এমন কি সঙ্গে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি থাকলেও প্রকৃতির সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না।[৬]

চতুর্থত, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর কবিতায় প্রকৃতিকে নৈতিক শিক্ষক হিসেবে আবিষ্কার করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রকৃতিকে শিক্ষকরূপেই দেখেছেন। তিনি তাঁর দিনলিপি *অভিযাত্রিক*-এ বলেন– 'আমার এই দৃঢ় ধারণা, যে দেশভ্রমণ করেনি, প্রকৃতিকে বিভিন্নরূপে দেখেনি, কোথাও বা মোহন, কোথাও বিরাট বা কোথাও রুক্ষ ও বর্বর–তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে অনেক বাকি।'[৭] উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতই তিনি প্রকৃতির ভেতর সাধারণ সৌন্দর্য, ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, শুশ্রূষার গুণ ও শিক্ষার উপকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি-চেতনার সঙ্গে উইলিয়াম হেনরি হাডসন-এর *Green Mansion's* (1904), নাট হামসন-এর *Pan* (1894), হেনরি ফ্রেডরিখ এমিল-এর *Amiel's Journal* (1913), বিখ্যাত শিকারী জিম করবেটের *Jungle Lore* (1935) উপন্যাসের মূলগত চেতনার সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে মানুষের সমান্তরালে প্রকৃতি-চেতনার প্রয়োগ অর্বাচীন নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে প্রকৃতির উপস্থাপনা দুষ্প্রাপ্য নয়, কিন্তু তা শিল্পীর সচেতন সত্তায় জারিত না হওয়ায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোমান্টিক প্রকৃতি-চেতনার দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) কথাসাহিত্যে প্রকৃতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাঁর *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *আনন্দমঠ* (১৮৮২) ও *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪) উপন্যাসে প্রকৃতির প্রক্ষেপণ ঘটেছে। পটভূমি ও প্রতিবেশ তৈরিতে প্রকৃতির ব্যবহার দেখা যায় *আনন্দমঠ* ও *দেবী চৌধুরাণী* উপন্যাসে। *কপালকুণ্ডলায়* মানুষ ও প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এখানে কপালকুণ্ডলা মূলত প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে বেড়ে উঠেছে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) কাব্যেও প্রকৃতি-চেতনা আছে, কিন্তু তা অস্বচ্ছতার বেড়াজালে আবদ্ধ। প্রকৃতি তার সর্বৈব সত্তা নিয়ে আবির্ভূত

হয়েছে, মুক্তি পেয়েছে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) কাব্য ও ছোটগল্পে। বিশেষত তাঁর পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত ছোটগল্পগুলোতে প্রকৃতি বিচিত্র সত্তায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কাব্যেও প্রকৃতি তার ফুল-দল মেলে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থে যুগপৎভাবে ধূসর এবং সজীব ও প্রাণবন্ত প্রকৃতির সহাবস্থান প্রকৃতিভাবনায় নবতর মাত্রা যোগ করেছে। প্রকৃতিপ্রীতি ও প্রকৃতির প্রতি দুর্বার মোহনীয় আকর্ষণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত ও প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে পরিপুষ্ট বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিপ্রীতিই তাঁর শিল্পী মানসকে কল্লোল গোষ্ঠী থেকে বিচ্যুত করে রবীন্দ্রানুসারী হিসেবে গড়ে উঠতে প্রণোদিত করেছে। তাঁর প্রকৃতি মানব-বর্জিত নয়। আদিবাসী ও অরণ্যচারী সরল মানুষ, শিশু ও গ্রামীণ মানুষ প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ। বাংলার মানুষ ও প্রকৃতির যৌথরূপের নিখুঁত চিত্রায়ণে তাঁর ছোটগল্পসমূহ কালোত্তীর্ণ মহিমা লাভ করেছে। *স্মৃতির রেখা* (১৯৪১) দিনলিপিতে মানুষ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক–বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র বাংলার সন্ধ্যাসকাল আকাশ-বাতাস, ফল, ফুল–বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃত ছায়া ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে–তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখ দুঃখকে রূপ দিতে হবে।[৮]

রবীন্দ্রানুসারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনায় প্রকৃতির নির্মোহ রূপায়ণ ঘটলেও তাঁর ছোটগল্পে প্রকৃতি চিত্রায়ণ গৌণ হয়ে উঠেছে, সেখানে মুখ্য মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের প্রকৃতি-চেতনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-ভাবনার পার্থক্য বিদ্যমান। 'বিমূর্তন রবীন্দ্রসাধনার প্রবণতা–বিভূতিভূষণ জীবনরস-পিপাসু। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় পদ্মা শেষে 'বলাকা'র বিরাট নদী'তে পরিণত; বিভূতিভূষণের আদিতেও ইছামতী, অন্তেও সেই ইছামতী।'[৯] রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃতি-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হলেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে তাঁর কবিচিত্ত পাঠককে আনন্দময় সৌন্দর্যলোকাভিসারী করে এক নির্জন মায়াময় আবহে পৌঁছে দেয়, যা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-ভাবনা থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেন– 'মানবিক সত্যের সাথে প্রাকৃতিক সত্যের মিশেল দিয়া গল্পগুলিকে কবিত্বরসে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছেন।'[১০] রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতির সচেতন প্রয়োগ তাঁর গল্পের কাহিনি বা চরিত্রের পরিণতিকে প্রভাবিত করেছে। যেমন : যেসব গল্পে বৃষ্টির দৃশ্য বা পটভূমি সংযোজিত হয়েছে সেগুলোর নিষ্পত্তিতে অনিবার্যভাবে ট্রাজিক রসের উৎপত্তি হয়েছে। 'পোস্টমাস্টার', 'ছুটি', 'মধ্যবর্তিনী', 'জীবিত ও মৃত' প্রভৃতি গল্পে বৃষ্টির আবহ এরই সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়া বিভিন্ন গল্পে 'বৃক্ষ' ও 'অন্ধকারে'র উপস্থাপনা গল্পের কাহিনির পূর্ণতাব্যঞ্জক সংকেত দান করে। অন্ধকারের সাথে মানবমনের মিথস্ক্রিয়া লক্ষ করা যায় 'সমাপ্তি' গল্পে–'মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল;'[১১] এবং 'অন্ধকার অজ্ঞাতসারে এমন এক গীতময় সঞ্চরণশীল আবহ সৃষ্টি করেছে, যা অবিকশিত স্বামীবিমুখ মৃন্ময়ীর অপূর্ব-বিশ্বাস, সারল্য ও আকাঙ্ক্ষাকে সংগোপনে সম্ভাবিত করেছে।'[১২]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে এরকম মানুষ ও প্রকৃতি মিশে একীভূত হয়নি, প্রকৃতি এসেছে বিক্ষিপ্তভাবে, সেখানে গভীর কোনো দ্যোতনা সৃষ্টি করেনি, প্রকৃতি শুধু গল্পের প্রতিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কনে দেখা' গল্পে ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। গল্পের নায়ক হিমাংশু তার প্রিয় এরিকা পাম গাছটিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব আরোপ করে। এরিকা পাম গাছটিকে অন্যের বাড়িতে দেখতে গিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পায়। তখন অনুভব করে, 'ও যেন বলছে, আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি তোমার কাছে গেলে হয়তো এখনও বাঁচবো! ছেড়ে যেও না এবার! আমায় বাঁচাও!'[১৩] বাসায় ফিরে রাতে ভালো ঘুমাতে পারে না হিমাংশু। পরদিন এরিকা পাম গাছটিকে উদ্ধার করে প্রসন্ন চিত্তে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার একে বিয়ে দেওয়ার সাধ জাগে। হিমাংশু বলে– 'তাই অল্প বয়সের, দেখতে ভালো পাম খুঁজছিলাম। হি-হি–পাগল নয় হে পাগল নয়, ভালোবাসার জিনিস হোতো তো বুঝতে।'[১৪] এরকম অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা সাধারণ মানুষের বুঝতে কষ্ট হলেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বৃক্ষপ্রেমিক তথা প্রকৃতিপ্রেমিকের পক্ষে অনায়াস সাধ্য।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতিমুগ্ধতা যে একেবারে নেই তা নয়, যেসব গল্পে প্রকৃতির মোহনীয় রূপের মুগ্ধতার প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে মানুষের জীবন নেই, শুধু প্রকৃতির দর্শন ঘটেছে ('বিক্রমখোল', 'প্রভাতী', 'মানতালাও', 'ছোটনাগপুরের জঙ্গলে' প্রভৃতি গল্পে) ফলে কোনো সরস কাহিনিবৃত্তও তৈরি হয়নি। গল্পকার যেখানেই প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছেন, সেখানেই অপূর্ব মহান শিল্পীর প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি ঈশ্বরভাবনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। 'নব-বৃন্দাবন' গল্পে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত কর্ণপুর বৃন্দাবন যাওয়ার পথে এক শিশুকে কুড়িয়ে পেয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার আশা ত্যাগ করে পুনরায় গৃহী হয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসে এবং শিশুটিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্রত গ্রহণ করে। গল্পের শেষে সে কৃষ্ণের বাঁশির তান শুনতে পায়। গৃহী কিংবা সন্ন্যাসীর চেয়ে বড় হলো মানবধর্ম, কর্ণপুর মানবধর্ম পালন করেছিল তাই গৃহী হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছিল। ঈশ্বরের কৃপায় দুশ্চরিত্র হরিপ্রাণ মুখুজ্জের ধর্মপ্রাণ সাধুতে রূপান্তরিত হওয়ায় গল্প 'হরিকাকা'। 'বিশ্বশিল্পী' গল্পে গল্পকার প্রকৃতির সাধারণ বন্যলতার সৌন্দর্যের মধ্যে পরম ব্রহ্মের আস্বাদ লাভ করেছেন। পরম সত্তা রস উপভোগ করে আনন্দ পান। রস উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন দ্বৈতভাব, চাই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের জাগতিক বা বস্তুতান্ত্রিক জগৎ এবং সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বহু মানুষের মন। এই দ্বৈতের মিলন, পরিচয় ও প্রীতি অবলম্বনেই রসের ধারা প্রবাহিত হয়। যেখানে একক সত্তা বা দ্বিতীয়হীন সত্তা বর্তমান, সেখানে রস বয় না, সেখানে আনন্দ উপলব্ধির অবকাশ নেই। তাইতো গল্পকার বলেন : 'পরম ব্রহ্মের প্রাণময়ী বার্তা বহন করে এনেচে ওই বন্যলতা লোক-লোকান্তরের অসীমতা থেকে। যে মহাশিল্পীর হাতের এই অতি সুকুমার শিল্প, সেই শিল্পীর স্বাক্ষর আছে ওর পাতায়, ফুলে, লাবণ্যময় দুলুনিতে–ওর মধ্য দিয়েই তাকে প্রত্যক্ষ কর।'[১৫] বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে–

> [...] একদা একা থাকলেও তিনি একাকিত্ব উপভোগ করলেন না; তাই রসের উপলব্ধির জন্যই তিনি বহু দ্বারা খণ্ডিত তাঁর বিচিত্র মূর্তরূপ গ্রহণ করলেন, তিনি বিশ্বরূপ হলেন।
> [...] প্রথম অবস্থায় ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়রূপে ছিলেন: কিন্তু একা থাকলে যে তাঁর রসোপলব্ধি হয় না, তাঁর আনন্দরূপ প্রকট হয় না। তাই একা একা তাঁর ভালো লাগল না। সেই কারণেই তিনি দুয়ের ভিত্তিতে প্রকাশ নিতে চাইলেন; তিনি দ্বিতীয়কে চাইলেন। তখন তিনি নিজেকে বহুতে রূপান্তরিত করলেন। তখন জ্ঞাতা এল, জ্ঞেয় এল; দ্রষ্টা এল, দৃশ্য এল; শ্রোতা এল, শ্রোতব্য এল; ঘ্রাতা এল, ঘ্রাতব্য এল; এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে-ভরা বিচিত্র বিশ্ব এল।[১৬]

'মাকাল-লতার কাহিনী' গল্পেও মাকাল ফল ও লতার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধপ্রাণ গল্পকার প্রকৃতির অনাবিল রূপের মধ্যে ঈশ্বরের অপার সৌন্দর্য বিভা আবিষ্কার করে ঔপনিষদিক আনন্দ লাভ করেছেন। প্রকৃতি-চেতনার সমান্তরালে গল্পকারের অন্তর্লোকে সতত বিরাজমান ছিল ঈশ্বর-বিশ্বাসের অখণ্ডতা।

৩. মানুষ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে কৈশোর, যৌবন, বৃদ্ধ মানবজীবনের এই ত্রিক্ষেত্রের প্রতিই সমান আলো ফেলেছেন। 'তাঁর গল্প নিতান্তই কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর নরনারীর কাহিনী– 'Short simple annals of the poor'।'[১৭] তাঁর ছোটগল্পে চরিত্র হিসেবে কোনো রাজা বা উচ্চবংশীয় মহৎ মানুষের জীবন কড়চা নেই বরং খুবই সাধারণ দরিদ্র অথচ কর্তব্যপরায়ণ স্কুল মাস্টার, দারিদ্র্যপীড়িত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সহৃদয় মমতাময়ী নারী, গ্রাম্য মুখরা হৃদয়হীন রমণী, অবোধ শিশু-কিশোর, অবহেলিত আদিবাসী শ্রেণি, বিদেশি উপকারী বন্ধু, ফিরিওয়ালা, ক্যানভাসার, সমাজে অস্পৃশ্য হিসেবে পরিচিত পতিতা প্রভৃতির কারুণ্যে ভরা জীবনের গভীর স্বপ্ন, হতাশা, সততা, ক্লেদ, দারিদ্র্য, অর্থলোলুপতাকে সহজাত মমত্ব নিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

৩.১

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক ছোটগল্প একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে। চরিত্রগুলো গল্পকারের ব্যক্তিগত বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকেই সংগৃহীত এবং কল্পনার সংমিশ্রণে পরিবর্ধিত। এসব চরিত্র জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিক, এদের জীবন দুঃখ-দারিদ্র্যে গ্লানিময়, সাফল্যহীনতায় পর্যবসিত। বিভূতিভূষণ সহৃদয় মমতা নিয়ে তাদের অকৃতার্থতার গল্প বলেছেন। তেমনি কিছু অচরিতার্থতার গল্প হলো: 'রামতারণ চাটুজ্জে–অথর', 'কবি কুন্ডুমশায়', 'অনুসন্ধান', 'শাবলতলার মাঠ', 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি', 'উইলের খেয়াল', 'যদুহাজরা ও শিখিধ্বজ', 'বিধু মাস্টার', 'বেচারি', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'উল্টোরথ', 'বড়দিদিমা', 'ঝগড়া'। রামতারণ চাটুজ্জে এককালে স্কুলের ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচয়িতা হলেও কালক্রমে দারিদ্র্যকবলিত হয়ে পড়েন। কবি কুণ্ডমশায় মনেপ্রাণে কবি হয়েও সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পেরে কাপড়ের দোকানের কর্মচারী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। 'অনুসন্ধান' গল্পে একজন কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ শিক্ষক নারাণবাবুর নিদারুণ দারিদ্র্যের প্রতিচিত্রণ লক্ষণীয়। 'শাবলতলার মাঠ' গল্পের প্রধান শিক্ষক উমাচরণ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হলেও কবিতা লিখে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পে ভণ্ডুলমামার সারাজীবনের সাধ একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই তার সমস্ত সঞ্চয়

দিয়েও পূর্ণ করতে পারে না। 'উইলের খেয়াল' গল্পে বৃদ্ধ বয়সে পিসিমার সম্পত্তি প্রাপ্তির মাধ্যমে পূর্ণবাবুর দারিদ্র্যের অবসান ঘটে, কিন্তু সেই সম্পত্তি ভোগ করবার মত শারীরিক সক্ষমতা তার চলে যায়। গল্পকারের ভাষ্য মতে :

> দেখলাম পূর্ণবাবু চিরবঞ্চিত জীবনের সর্বগ্রাসী তৃষ্ণার ভোগলালসা মেটাতে উদ্যত হয়েচেন বিকারের রোগীর মত। চারিধারে ঘনায়মান মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে, স্বল্পতৈল জীবনদীপের আলো যত সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর জোতিঃবৃত্তের সৃষ্টি করচে, উনি ততই উন্মাদ আগ্রহে যেখানে যা পাবার আছে পেতে চান–যা নেবার আছে নিতে চান। জীবনে ওঁর যখন সুবৃষ্টি এল, জল না পেয়ে তখন আধ-মরা, সেই এল কিন্তু এত দেরি করে ফেললে![১৮]

'যদুহাজরা ও শিখিধ্বজ' গল্পে এককালের জনপ্রিয় যাত্রাশিল্পী 'যদুহাজরা' কালের পরিক্রমায় জৌলুস হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে অনাদরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। 'বিধু মাস্টার' গল্পে এক দরিদ্র মাস্টারের চাকরি চলে যাওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'বেচারী' গল্পে ভগ্নিপতির গলগ্রহ হয়ে থাকা সুরেশের মনোবেদনার চিত্র উঠে এসেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র্য চিরকাল পীড়িত করেছে। মানুষের প্রতি একটা সহজাত ভালোবাসা-মমতা তাঁর মনকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখতো। *স্মৃতির রেখা* (১৯৪১) দিনলিপিতে এ সম্পর্কে বলেন :

> যে বুড়ীটা গ্রামের পাঁচজনের ঝাঁটালাথি খেয়ে কিছুদিন আগে ঘরে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে জল অভাবে মৃত্যুতৃষ্ণা নিবারণ করতে না পেরে মরেছিল তার কথা ভেবে মন উদার শোক ও শান্তিতে ভরে আসবে–জগতের পবিত্র কারুণ্যের আশাহত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে অন্তরের অনাহত ধ্বনি কানে বাজবে। যে পরের ব্যথায় কাঁদতে শেখেনি সে অতি দুর্ভাগ্য। এক অতি অদ্ভুত জীবনরস থেকে সে বঞ্চিত হয়ে আছে।[১৯]

'জন্ম ও মৃত্যু' গল্পে গল্পকার যেন সেই অদ্ভুত জীবনরস খুঁজে পেয়েছিলেন। এখানে জীবনে প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধ বিশ্বনাথ বাবুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের সমান্তরালে দারিদ্র্যপীড়িত বৃদ্ধা শশী-ঠাকরুনের শ্রাদ্ধের আয়রনি চিত্রিত হয়েছে। বেঁচে থাকতে শশী-ঠাকরুনের ছেলেরা শহরে ভালো চাকুরি করে মোটা মাইনে পেলেও কেউ তার খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। বুড়ির মরণকালে কেউ দেখতে আসেনি। বড়ছেলে সাধ্যমতো বুড়ির সেবাযত্ন করার চেষ্টা করেছিল। বুড়ি ছেলের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। বড়ছেলে সিধুকে ডেকে নিয়ে তার শ্রাদ্ধে বেশি খরচ না করতে, অন্য ভাইরা যদি কিছু দেয়, সেখান থেকে কিছু টাকা ছেলে-পিলের ভবিষ্যতের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পরামর্শ দিয়েছিল। বুড়ি মরার দুই ঘণ্টা আগে বড় ছেলের বৌকে বলেছিল :

> বৌমা, লেপটা সরিয়ে নাও, চার-পাঁচ টাকা দামের লেপটা–আমি বাঁচব না, তখন ওটা আমার সঙ্গে ফেলে দিতে হবে। ও গেলে আর হবে না বৌমা। আহা, কোথায় পাবে সিধু যে, আবার চার-পাঁচ টাকা খরচ করে লেপ বানাবে? শীতকালে বাছারা আমার আদুড় গায়ে কাটাবে তা হলে।[২০]

শশী-ঠাকরুন বেঁচে থাকতে তার ছেলেরা আসেনি অথচ মৃত্যুর পর তার শ্রাদ্ধে ঘটা করে প্রচুর টাকা খরচ করেছিল। বিশ্বনাথবাবুর সাথে শশী-ঠাকরুনের জীবনের যে বৈপরীত্য ও শশীর ছেলেদের স্বার্থপরতার দিকটি প্রকটিত করে তুলেছেন গল্পকার। 'উল্টোরথ' এককালের

দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সত্য চক্রবর্তীর, ছোট ছেলের ভয়ে বৃদ্ধ বয়সে গুটিয়ে যাওয়ার গল্প। 'বড়দিদিমা' গল্পে সবাই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেলেও বৃদ্ধা বড়দিদিমা মৃত স্বামী-সন্তানের সুখস্মৃতি নিয়ে পাষাণী অহল্যার মত স্বামীর ভিটে পাহারা দেয় ও মৃত্যুর প্রহর গোনে। 'ঝগড়া' গল্প বাহাত্তর-তিয়াত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ কেশব গাঙ্গুলীর হৃদয়বিদারক মৃত্যুর আলেখ্য। কেশব গাঙ্গুলী যৌবনে রেলে চাকরি করত, অবসর গ্রহণের পর তার সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে স্ত্রী মুক্তকেশীর নামে চার হাজার টাকা ও ছোট মেয়ে ময়নার নামে তিন হাজার টাকা লিখে দেয়। নিজের জন্য কিছুই রাখার প্রয়োজন সে মনে করেনি। পকেট খরচের জন্য কোনো টাকা স্ত্রীর কাছে চাইলে ঝগড়া হতো। স্ত্রী-কন্যারা তাকে কেউ প্রাপ্য সম্মান দেয় না, চোর সাব্যস্ত করে, যত্ন করে না। ছোট মেয়ে ময়না তাকে একটা ভাঙা ছাতির বাঁট তুলে মারতে যায়, মেজ মেয়ে তার মৃত্যু কামনা করে। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে কেশব গাঙ্গুলী ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। সারারাত চণ্ডীমণ্ডপে মশার কামড় খেয়ে শুয়ে থাকলেও ম্যালেরিয়াশীর্ণ বৃদ্ধের প্রতি স্ত্রী-কন্যাদের মায়া হয় না। সব অপমান ভুলে বাড়ি ফিরলে স্ত্রী-কন্যাদের হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতায় হত-বিহ্বল কেশব গাঙ্গুলী শেষবারের মত বাড়ি থেকে চলে যায়। সব থেকেও নেই কেশব গাঙ্গুলীর, এই আত্মীয়হীন অমানবিক আবহ সহ্য করতে না পেরে সে অপমানিত ও নিগৃহীত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। মানব জীবনের শেষ অধ্যায়ের দুঃখ, দুর্দশা ও লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাবলি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোচরীভূত হয়েছে এবং হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। তাই তাঁর ছোটগল্পে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অপরদিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় শতাধিক গল্পের একটিতেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জীবনের অন্তিম সময়ের কারুণ্যের দশা প্রতিচিত্রিত হয়নি।

৩.২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামের প্রতি আমৃত্যু টান ছিল। শৈশবের নস্টালজিয়াই এই চিরশিশুকে গৃহমুখী করেছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ছোটগল্পে গৃহে প্রত্যাবর্তনের গল্প এসেছে। 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'সিঁদুরচরণ', 'সীতানাথের বাড়ী ফেরা', 'বুধীর বাড়ি ফেরা', 'প্রত্যাবর্তন' হলো তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তনের গল্প। 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পের ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্টা, ধর্মান্ধ 'দ্রবময়ী' কাশীপ্রাপ্তি বা স্বর্গলাভের আশায় কাশী গেলেও নিজের গ্রামের পরিচিত আবহ ও ঘরোয়া জীবনের নিবিড় স্নেহের আবেশকে বিস্মৃত হতে পারেননি। গৃহপ্রীতির কারণে গুরুদেবের ধর্মবয়ান শুনে তার মনটা নরম হয় না বরং বাড়িতে ফেলে আসা গরু মুংলির শারীরিক অবস্থার কথা মনে পড়ে এবং অস্থিরতা বাড়ে। নিজের স্বামীর ভিটেতে প্রত্যাবর্তনের পর দ্রবময়ীর উপলব্ধি– '[...] কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই–এই ভিটেই আমার গয়া কাশী। তিনি এই উঠোনের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসীতলায়–আমাকেও তোরা ওখানে–'।[২১] 'সীতানাথের বাড়ি ফেরা' ও 'সিঁদুরচরণ' গল্পে গৃহে প্রত্যাবর্তনের যে অপার আনন্দ ও সুখ তারই চিত্র উঠে এসেছে। 'প্রত্যাবর্তন' নামে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি গল্প আছে। 'প্রত্যাবর্তন' গল্প দুটিকে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের সাথে মিলিয়ে পড়া যায়। একটি 'প্রত্যাবর্তন' গল্পের কথক

বিনোদ আরেকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র গোবিন্দ। 'ছুটি' গল্পে ফটিক যেমন তার মামীর নিষ্ঠুরতার শিকার; তেমনি গোবিন্দ তার কাকিমার ও বিনোদ খুকির মার নিষ্ঠুরতায় বিপর্যস্ত। ফটিক তার মার কাছে ফিরে যেতে পারেনি বিনোদও তেমনি মাঝপথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের সাধ তাদের পূর্ণ হয়নি। গোবিন্দ কিন্তু পালিয়ে নিজ গৃহে মায়ের কোলে ফিরে পরিতৃপ্তি লাভ করেছে।

৩.৩

গল্পকার মায়ের এই প্রীতি, স্নেহ এবং বোনের ভালোবাসার নিগড়ে বাঁধার কাহিনি বলেছেন–'উমারাণী', 'উপেক্ষিতা', 'জাল', 'আহ্বান', 'বামা', 'কিন্নর দল','মৌরিফুল', 'চৌধুরাণী', 'অসাধারণ' প্রভৃতি গল্পে। নারীর সহৃদয় ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপণ এই গল্পগুলিকে নবতর মাত্রায় উদ্ভাসিত করেছে। 'উমারাণী' ও 'উপেক্ষিতা' গল্প দুটি ভাই-বোনের মধ্যকার নিষ্কলুষ ভালোবাসা-প্রীতির প্রতীকসম হয়ে উঠেছে। উমা কথকের নিজের বোন নয়, কথকের বোন মারা যাওয়ায় এবং উমার নিজের দাদা না থাকায় উভয়ের বুভুক্ষু হৃদয়ের সাধ পূর্ণতা পেয়েছে। উমা সর্বদা দাদার চিন্তায় অস্থির, দাদাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করে তাকে সুখী দেখার আকাঙ্ক্ষা এ গল্পে অনুরণিত হয়েছে। উমা দাদার জন্য পশমের জুতা তৈরি করে, তার হবু বৌয়ের জন্য নিজের মিষ্টান্ন খাবার লোভ জলাঞ্জলি দিয়ে সেই টাকায় রূপার কাঁটা গড়ায়। যে টাকা সে নারকেলের পাতা চেঁচে ঝাঁটার কাঠি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে তিলে তিলে উপার্জন করেছিল। 'উপেক্ষিতা'ও কথকের পাতানো-বোন বৌদির সহৃদয় প্রীতির বর্ণাঢ্য গল্প। বৌদির কথকের ওপর এত টান থাকার কারণ তার ভাই বিমল যে অকালে মারা গিয়েছিল তার চেহারার সঙ্গে কথকের চেহারার সাদৃশ্য। তাই সমাজ ও বাড়ির লোককে লুকিয়ে বৌদি প্রায় প্রতিদিনই নানা খাবার (ক্ষীরের পুতুল, কলার বড়া, গোকুল পিঠে, দুগ্ধশুভ্র চন্দ্রপুলি, মোহনভোগ প্রভৃতি) কথককে দিত। কথকের জামার বোতাম ছিল না, পরম মমতায় তার জামার বোতাম লাগিয়ে দেয় সে। ভাই-ফোঁটার দিনে দশ টাকা দিয়ে ভাইকে আশীর্বাদ করে। পাতানো ভাইয়ের সাথে প্রীতির সম্পর্ক বাঙালি নারীর সহৃদয়তারই প্রমাণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নারীকে মায়ের জাতি হিসেবেই বিবেচনা করেছেন আজীবন। স্নেহময়ী মাতৃরূপা নারী বিভূতিভূষণের প্রিয়, এই মাতৃস্বরূপার ভালোবাসা, বাৎসল্যের আতিশয্যের গল্প 'আহ্বান' ও 'জাল'। 'আহ্বান' গল্পের মুসলমান বৃদ্ধার কথকের প্রতি অনিঃশেষ ভালোবাসা সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে মাতৃহৃদয়ের ভালোবাসার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। বৃদ্ধার গায়ে-পড়া স্বভাবজাত স্নেহ লেখককে বিরক্ত করলেও বুড়ির মৃত্যুর পর কথক সে ভালোবাসা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছে। লেখকের মনে পড়ে–

> আমার মনে পড়লো বুড়ি বলেছিল সেই একদিন–আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস বাবা। এর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর বারাণসী থেকে আমায় কি ভাবে আহ্বান করে এনেচে। আমার মন হয়তো ওর ডাক এবার তাচ্ছিল্য করতে পারেনি। [...] শুকুর মিঞা বল্লে– দ্যাও বাবাঠাকুর, তুমিও দ্যাও–তুমি দিলে মহাপ্রাণী ঠাণ্ডা হবে–
>
> দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো–অ মোর গোপাল।[২২]

'জাল' গল্পের অনসূয়া বাঈ ভরহেচ্ নগরে আশ্রিত কথক হিতেন্দ্রনাথ কুশারীকে নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসেন, কোনোদিন তার খাবার-দাবারের ত্রুটি হতে দেননি। পাণ্ডববর্জিত ভরহেচ্ নগরে কথকের নাগরিক মন হাঁপিয়ে উঠেছিল, তাই অনসূয়া বাঈয়ের সাথে সে রাঁচি যায় এবং পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু অনসূয়া বাঈ মনে করে, কথক গাঁয়ের লোক হয়তো শহরে এসে হারিয়ে গেছে। 'মা যেমন হারানো সন্তানকে খোঁজে, তেমনি করে অনসূয়া বাঈ খুঁজলে তাদের অর্থবল ও লোকবল দিয়ে আমাকে। খুঁজে বার করলে রাঁচি-চক্রধরপুর-সার্ভিসের বাস্ থেকে।'[২৩] কথক স্বীকার করে, 'না; ওদের মন কি সুন্দর! কত জায়গায় গেলাম, ওদের মত মন কোথাও পেলাম না।'[২৪] 'বামা' গল্পে বামার স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির সবাই ফাঁসুড়ে ডাকাত। তারা দিনের বেলা মানুষকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়, রাতের বেলা ঘুমন্ত অতিথির সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলে। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে নিজের জীবন বাজি রেখে ফাঁসুড়ে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়ে বামা সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছে। 'চৌধুরাণী' গল্পে বিধবা আশালতা সৎ-মায়ের সন্তানদের নিজের ভাইয়ের মতো আগলে রাখে। বৈমাত্রেয় ভাই শরৎ-এর সম্পত্তি দখলের ষড়যন্ত্র রুখে দেয়, শরৎ তার নামে কুৎসা রটালেও শরৎ-এর স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্ব-প্রণোদিত হয়ে আশালতা তার সন্তানদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব নেয়। গ্রামের বৃদ্ধ বেণী হালদারের কেউ ছিল না, তাই আশালতা তার রান্নার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। পরোপকারী মনোভাবের জন্য গ্রামের সকলেই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। এ সম্পর্কে গল্পকারের উক্তি :

> অনেকে অনেক রকম সাহায্য পেতো আশার কাছ থেকে। কারো আঁতুড়ে রাত জাগতে হলে আশা, কোন যজ্ঞি-বাড়ীতে রান্না করতে আশা, কারো বাড়ী থেকে পুরুষ অভিভাবক বিদেশ যাবেন, সে বাড়ীতে দু-চার দিন শুতে হলে আশা, কারো বাড়ীর ডাল বেটে দেবার সময়ে আশা। সারা গাঁ-খানার যে কোনো বিপদে আশাকে সবাই স্মরণ করবে এবং পাবেও। পাবে ঠিকই, ঘড়ির কাঁটার মত পাবে। কখনো নিরাশ করেনি কাউকে।[২৫]

আশালতার মতো পরোপকারী, হৃদয়বান, নিঃস্বার্থ চরিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। 'অসাধারণ' জাতিতে হাড়ি ম্যালেরিয়াশীর্ণ, গনোরিয়াগ্রস্ত, খোঁড়া অকর্মণ্য বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অসামান্য ভালোবাসার গল্প। আপার প্রাইমারি স্কুল পাস করা হাড়ি বৌটি ধান ভানার কাজ করে, ধাইয়ের কাজ করে, দুর্ভিক্ষের দিনেও নিজে না খেয়ে অসুস্থ বৃদ্ধ হাড্ডিসার স্বামীকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের এই দরদ শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর দায় থেকেই উৎসারিত নয়, মানবিকতাবোধের ও ভালোবাসার উজ্জ্বল নিদর্শনও বটে। 'কিন্নর দল' গল্পে শ্রীপতির বৌয়ের আগমনের পূর্বে গ্রামে মজুমদার বাড়ির ভাঙা রোয়াকে প্রতিদিন দুপুরে পাড়ার মেয়েদের মেয়ে-গজালি হতো। গ্রামের গরিব, অশিক্ষিত মহিলা বলেই এরা ছিল হিংসুক। একে অপরের বদনাম ও মুখরোচক পরনিন্দা করেই হৃষ্ট চিত্তে দিনগুজরান করতো। শ্রীপতির বৌ এসবে অভ্যস্ত ছিল না, তার আপন-পর জ্ঞান ছিল না, সে সবার সঙ্গেই খুব ভালো ব্যবহার করতো, সবাইকে মূল্যায়ন করত। গল্পকারের ভাষ্য মতে :

> [...] শ্রীপতির বৌ সম্পূর্ণ দিলদরিয়া মেজাজের মেয়ে। দেবার বেলায় সে কখনও না বলে কাউকে ফেরায় না, যদি জিনিসটা তার কাছে থাকে। একেবারে মুক্তহস্ত সে বিষয়ে–কিন্তু আদায় করতে জানে না, তাগাদা করতে জানে না, মুখে তার রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হাসিমুখ ছাড়া তার কেউ কখনও দেখেনি।[২৬]

শ্রীপতির বৌ শিক্ষিত, মার্জিত, সুন্দরী ও শিল্পিত মানসিকতার হওয়ায় তার ব্যক্তিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে এসে গ্রামের নারীকুলের চেতনাগত ও আচরণগত পরিবর্তন আসে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নারীর হৃদয়ের অতলে যে স্নেহময়ী, উদার ও মমত্ববোধে পরিপূর্ণ উষ্ণ স্রোত আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর ছোটগল্পে এর সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তিনি একচোখা নন, নারীর উদারতার পাশাপাশি নিষ্ঠুরতার দিকটিও তাঁর গোচরে ছিল। 'মুক্তি' গল্পে ছেলের বৌ, শাশুড়ির হৃদয়হীনতায় মুমূর্ষু নিস্তারিনীর অন্নাভাবে মৃত্যু নারীর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। পাণ্ডুর রোগে আক্রান্ত নিস্তারিনী ভাত চাইলে তার শাশুড়ি বলে– '[...] জ্বর রয়েচে চব্বিশ প্রহরের জন্যি। ভাত খেলেই হল অমনি?...বলি, সোয়ামী খেয়েচ, পুত্তুর খেয়েচ, দেওর খেয়েচ–এখনো খাওয়ার সাধ মেটেনি তোমার?'[২৭] 'প্রত্যাবর্তন' গল্পের বিনোদের প্রতি কাকিমার আচরণ, 'পাঁচুমামার বিয়ে' গল্পে আশ্রয় ও সহায় সম্বলহীন, অভিভাবকহীন নিরীহ পাঁচুমামার স্ত্রীকে বিনাদোষে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, 'ঝগড়া' গল্পে ম্যালেরিয়াশীর্ণ অসুস্থ বৃদ্ধ কেশব গাঙ্গুলীর প্রতি তার স্ত্রী মুক্তকেশী ও কন্যাদ্বয়ের পৈশাচিক আচরণ, 'মৌরীফুল' গল্পে স্নেহ-বুভুক্ষু সুশীলার শাশুড়ি কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে অকাল মৃত্যু, 'পুঁইমাচা' গল্পে ক্ষেন্তির প্রতি তার শাশুড়ির অমানুষিক নির্যাতন নারীর নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষর বহন করে। কিশোরী ক্ষেন্তি ও *পথের পাঁচালী* উপন্যাসের কিশোরী দুর্গা চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। দুর্গার মৃত্যু হয় নিজের বাড়িতে এবং ক্ষেন্তির মৃত্যু হয় বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে। মৃত্যুজনিত এ পার্থক্য ছাড়া তাদের দুজনেরই প্রকৃতিপ্রীতি ও সাধারণ অন্যান্য আচরণের মধ্যে প্রচুর মিল পাওয়া যায়। এছাড়া ক্ষেন্তির মা অন্নপূর্ণা ও বাবা সহায়হরি'র সঙ্গে অপুর মা সর্বজয়া ও বাবা হরিহরের চরিত্রের মূলগত সাদৃশ্য পাওয়া দুষ্কর নয়। 'বাটি চচ্চড়ি' গল্পে মুখরা রমণী বিধবা পিসিমার দ্বারা তার ভাতৃবধূ মৃত্যুপথযাত্রী অলকার প্রতি অমানবিক আচরণ নারী হৃদয়ের নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক।

৩.৪

'বুধোর মায়ের গল্প', 'হিঙের কচুরি', 'গিরিবালা', 'বিপদ' এসব গল্পে সমাজের চোখে নীচ ও হীন কাজ পতিতাবৃত্তিকে গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন স্বাভাবিক সারল্যে। বুধোর মা, গিরিবালা, কুসুম, হাজু সমাজের কাছে অস্পৃশ্য, পাপিষ্ঠা হলেও গল্পকার তাদের এই পাপকে প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন করেছেন কারণ মানুষকে তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'বিপদ' গল্পের হাজু যখন গ্রামে ছিল তখন চুরি ও ভিক্ষাবৃত্তি করেও পেটভরে খেতে পারেনি। শহরে নিষিদ্ধ পল্লীতে নাম লেখাবার যে পাপ তা তাকে স্পর্শ করে না। জীবনে ভালো থাকার অধিকার সবারই আছে। বহুদিন পরে গ্রামের অভিভাবককে পেয়ে অতি উৎসাহের সঙ্গে সে তার নিজের টাকায় কেনা আয়না, একটি টুকনি ঘটি, একটা সুদৃশ্য কৌটা দেখাতে

থাকে। তার উৎসাহ, আনন্দ দেখে তাকে সঠিক পথে ফেরাবার উপদেশ দেওয়া হয়ে ওঠে না কথকের বরং মনে হয় :

> যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরমহৈতিষী সাধু হইতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ ও পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা-পিরিচে–যার বাবাও কোনোদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া, নিন্দা করিবার ভাষা আমার জোগাইল না।[২৮]

বুধোর মা শেষ জীবনে কাশীতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এই সৌভাগ্যের মৃত্যুকে সমাজের মানুষ ভালো চোখে দেখতে পারে না। গিরিবালা প্রথম জীবনে দুশ্চরিত্রা থাকলেও শেষজীবনে গিয়ে ধর্মের সেবক হয়, আশ্রম খোলে। গ্রামের সাধারণ মানুষ যৌবনের বারাঙ্গনা গিরিবালাকে চেনে, ধর্মপ্রাণ গিরিবালার প্রতি তাদের আগ্রহ নেই। মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিবর্তনের প্রতি খেয়াল করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে শোধরাতে পারে বলেই মানুষ সৃষ্টির সেরা। গিরিবালা'র বিবর্তনও সে সূত্রেই হয়েছে। বুধোর মা, গিরিবালা, কুসুম, সুলোচনা, হাজু এদের কারো সাথেই কথকের পতিতা-খদ্দেরের সম্পর্ক ছিল না। ফলে তিনি তাদের স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে শিশুর সারল্য ও মানবিকতার মানদণ্ডে বিবেচনা করেছিলেন। গল্পকার অস্পৃশ্য পতিতা হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেই তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৩.৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রতি আগ্রহী হওয়ার প্রধান কারণই হলো তারা প্রকৃতির মতোই সহজ-সরল ও অনাবিল। সততা ও নিঃস্বার্থ আচরণ এদের চরিত্রের ভূষণ। মজ্জাগত চরিত্রে স্বাভাবিক সারল্যের সহজপ্রাপ্যতাই তাঁকে এদের নিয়ে অনেকগুলি ছোটগল্প রচনা করতে উজ্জীবিত করেছে। তিনি তাঁর *বনে পাহাড়ে* দিনলিপিতে আদিবাসীদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন :

> [...] এরা সারাদিন জঙ্গলে কাজ করে, বাঘ-ভালুকের মুখে। সন্ধ্যাবেলায় নিজেদের আস্তানায় ফিরে দুটি নিরুপকরণ তণ্ডুলসিদ্ধ খেয়ে মহানন্দে দিন কাটায়। এতেই ওদের খুশি উপচে পড়ছে। আমরা ওদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম। কি সুন্দর জীবন এদের তাই ভাবি। এই যে বাইরের সভ্য জগতে এত যুদ্ধ, খাদ্যাভাব, লোকের দুঃখকষ্ট–তার কোনো আঁচ এসে এখানে পৌঁছায়নি। কেরোসিন তেল পাওয়া না গেলেই বা এদের কি, চিনির দামচালের দাম চড়লেই বা এদের কি! এরা ওসব কোনো জিনিসের ধার ধারে না। বনে বাস করে, বন-প্রকৃতিই এদের সমস্ত জিনিস জোগায়।[২৯]

আদিবাসীদের প্রসঙ্গ 'শিকারী', 'চাউল', 'কয়লা-ভাঁটা', 'কালচিতি', 'বোতাম', 'কবি' প্রভৃতি ছোটগল্পে উঠে এসেছে। 'শিকারী' গল্পে বাসুড়ি সাঁওতালের ম্যালেরিয়াশীর্ণ ছেলে মাগনিরামের বাবার মান-সম্মান বৃদ্ধির বাসনা ও নগদ একশত টাকা পুরস্কারের আশায় নিজের জীবনের বিনিময়ে বন্যহস্তী শিকারের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। 'চাউল' দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত একমুঠো অন্নের জন্য হপ্তায় মাত্র পাঁচ সের চালের জন্য কোম্পানিতে কাজ নেওয়া থুপীর বাবার অকাল জীবনাবসানের মর্মান্তিক গল্প। প্রকৃতির কোলে

বসবাসরত আদিবাসী কয়লা শ্রমিকদের নিজেদের মজুরির মূল্য সম্পর্কে অসচেতনতা ও সরল জীবনযাপনের গল্প 'কয়লাভাটা'। 'কালচিতি' যেন অরণ্য ও মানুষের যুগপৎ গল্প। 'বোতাম' গল্পে আদিবাসী হো তরুণী চম্পূর খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর রাজনৈতিক নেত্রী এলিশাবা কুই'য়ে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনি বিবৃত হয়েছে। 'কবি' গল্পে কবি রঘুনাথ দাস-এর জীবনযাত্রা ও সাহিত্যচর্চা যেন প্রকৃতির সমানুপাতে মানব সত্তার প্রকৃতিমগ্নতার সরল আখ্যান। *বনে পাহাড়ে* ও *হে অরণ্য কথা কও* (১৯৪৮) দিনলিপি দুটিতে আদিবাসী প্রীতির পরিচয় আছে। এছাড়া *আরণ্যক* (১৯৩৯) উপন্যাস তো অরণ্যবাসী অভিবাসী মানুষেরই ইতিবৃত্ত।

৩.৬

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষের সততা অনুপ্রাণিত করতো, মানুষের শঠতাও কিছু কম পোড়াতো না। মানুষের সততার গল্প হলো: 'দৈবাৎ', 'পড়ে পাওয়া', 'হাজারি খুড়ির টাকা', 'বে-নিয়ম', 'শান্তিরাম', 'রূপো বাঙাল' প্রভৃতি। 'দৈবাৎ' ও 'পড়ে পাওয়া' মোটা অংকের টাকা কুড়িয়ে পাওয়ার পর সেই টাকা আত্মসাৎ না করে মালিকের কাছে পৌছে দেওয়ার সৎ মানসিকতার গল্প। 'বে-নিয়ম' ও 'রূপো বাঙাল' গল্পে কর্মচারীর বিশ্বস্ততার গল্প বিধৃত হয়েছে। 'হাজারি খুড়ির টাকা' গল্পে হাজারি খুড়ি ও তার ছেলে বলাই বজ্রপাতে মারা যাওয়ার পর তার অনাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও চারশো টাকার জায়গায় সাত-আটশো টাকায় তাদের শ্রাদ্ধ করার মানসিকতা সতীশ ঘোষের অপরিসীম সততা ও উদারতার পরিচায়ক। 'যাত্রাবদল', 'একটি দিনের কথা', 'বড়বাবুর বাহাদুরি' গল্পে একই সমান্তরালে দুটি বিরুদ্ধ স্রোত সততা ও শঠতার প্রতিচিত্রণ লক্ষণীয়। উপর্যুক্ত গল্পে মানুষের ভেতরের হীনতা, দৈন্য ও নীচ স্বার্থপরতা এবং সহৃদয় মনুষ্যত্বের সহাবস্থান দেখানো হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্জিত জীবনবোধ মানবজীবনের অন্তর্গত এই ধনাত্মকতা ও ঋণাত্মকতা দুটিকেই স্বীকার করেছে এবং তিনি দোষ-গুণ সংবলিত সমগ্র মানবসত্তাকেই গ্রহণ করেছেন। মানুষ যেখানে চরম মাত্রায় লোলুপতার পরিচয় দিয়ে মনুষ্যত্বের অপমান করে সেখানে তিনি তীব্র নিন্দা ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। 'ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর', 'অভয়ের অনিদ্রা', 'কমপিটিশন' প্রভৃতি গল্পে মানুষের মানবতা বিবর্জিত স্থূল লোভের প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন। 'উড়ুম্বুর', 'আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা' গল্পে অর্থ ও যশলোভী আধুনিক লেখক ও সিনেমার প্রতি পরোক্ষ নিন্দাবাদ ও মৃদু কটাক্ষ লক্ষ করা যায়।

৩.৭

ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের কারণে বিদেশীদের প্রতি দেশীয় লেখকদের সহমর্মিতা প্রায় শূন্যের কোঠায়। ঔপনিবেশিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাদের সাধারণত অত্যাচারী ও মতলববাজ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। 'থনটন কাকা' ও 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' গল্পে বিদেশিদের প্রতি গল্পকারের সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ থনটন কাকা ও ফালমন সাহেব অন্য ইংরেজদের মতো নয়। ফালমন সাহেব শরীরে ইংরেজ বংশধর হলেও মননে পুরোপুরি বাঙালি ছিলেন। গল্পটির বাস্তব ভিত্তি আছে। *হে অরণ্য কথা কও* দিনলিপিতে গল্পকার বলেছেন– 'সাহেবদের

নীলকুঠির ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় বেড়িয়ে বেড়ালুম–কোথায় আজ সেই লালমুরা ফালমন সাহেবের দল, কোথায় তাদের বলদর্পিতা, গর্বিতা, মেমের দল [...]'[৩০] এছাড়া ফালমন সাহেব ও নীচজাতীয় দাসীর সঙ্গে *ইছামতী* (১৯৫০) উপন্যাসের বড় সাহেব ও নীচকুলোদ্ভব গয়ামেমের সাদৃশ্য আছে।

৩.৮

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ছিলেন সাহিত্য-শিল্পী ও শিক্ষক। ফলে শিক্ষক ও শিল্পীদের প্রতি দুর্বলতাবশতই হয়তো তাদের কেন্দ্র করে অনেক ছোটগল্প রচনা করেছেন। 'ঝড়ের রাতে', 'আর্টিস্ট', 'কবি কুণ্ডু মশায়', 'রামতারণ চাটুজ্জে–অথর', 'বন্দী', 'জনসভা', 'বারিক অপেরা পার্টি' গল্পের শিল্পী অথবা শিক্ষক সবাই সরস্বতীর নিঃস্বার্থ সেবক ছিলেন, শিল্পচর্চা বা সাহিত্য সেবা এদের কারোই পেশা ছিল না, ছিল নেশা। *পথের পাঁচালীর* (১৯২৯) দ্বিতীয় অংশ *অপরাজিত* (১৯৩২)-র আজবলাল ঝা, সে কবি ও শিক্ষক। তার টোল চলে না, তার কাব্য কেউ পড়ে না। কারণ বিভূতিভূষণের অন্য সাহিত্যসেবী চরিত্রের মতই সেও বর্তমান সাহিত্য সম্পর্কে কিছুই জানে না, একেবারে প্রাচীন সাহিত্য ও শিক্ষা-দীক্ষায় মগ্ন হয়ে থাকে। আজবলাল ঝার মতো আরেকটি চরিত্র *পথের পাঁচালী*-র অপুর বাবা। শিক্ষক আজবলাল ঝার সাথে *আরণ্যক*-এর শিক্ষক মটুকনাথের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 'আরণ্যকের নৃত্যশিল্পী ধাতুরিয়া, কবি বেঙ্কটেশ্বর ও বৃক্ষপ্রেমিক যুগলপ্রসাদ এ জাতীয় চরিত্র।'[৩১] গল্পকার এদের তাচ্ছিল্য বা করুণা প্রদর্শন করেননি। তাঁর ছোটগল্পগুলোতে জীবনযুদ্ধে অসফল শিল্পীদের প্রতি মমত্ববোধেরই প্রকাশ ঘটেছে।

৩.৯

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীমন চিরকালই শিশু। 'নব-বৃন্দাবন', 'সীতারামের বাড়ি ফেরা' ও 'খেলা' ছোটগল্পে সন্তানের প্রতি পিতার বাৎসল্যের চিত্র অংকিত হয়েছে। *ইছামতী* (১৯৫০) উপন্যাসের ভবানী চরিত্রেও সন্তানের জন্য অপরিমেয় স্নেহের প্রতিফলন দেখা যায়। 'ঠেলাগাড়ি' গল্পের খোকার সাথে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুন্নাম' গল্পের টুনু চরিত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 'পুরোনো কথা' অসুস্থ মায়ের স্নেহবঞ্চিত শিশুহৃদয়ের আকুতির গল্প, 'তালনবমী' গল্পে নিম্নবিত্ত ও নিম্নশ্রেণির শিশুর তালনবমীর নিমন্ত্রণ না পাওয়ার বেদনা শিল্পিত হয়েছে।

স্মৃতিই পরিণত মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। স্মৃতিভুক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতীত থেকে আনন্দ-বেদনার স্বাদ আহরণ করার জন্য পূর্ব-প্রণয়ের গল্প লিখেছেন। 'পারমিট', 'বিড়ম্বনা', 'বাঁশি', 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' নামক গল্পে পূর্ব-প্রণয়ের অম্ল-মধুর স্বাদের গল্প পরিবেশিত হয়েছে। 'পারমিট' গল্পে আকালের সময় সস্তায় দু'মণ ধানের জন্য হাকিমের কাছে কথকের আবেদন মঞ্জুর করায় হাকিমের স্ত্রী বিনু। যাকে অনেকদিন আগে বিয়ে করতে অসম্মতি জানিয়েছিল কথক। এ গল্পের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্পের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। একই গোত্রভুক্ত গল্প 'বিড়ম্বনা'। মৃত স্বামী বনোজের প্রিয় বাঁশি নিয়ে সুলেখার স্মৃতি রোমন্থনের গল্প 'বাঁশি'। 'বাঁশি'

গল্পের সাথে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসী মামী' গল্পের দূরাগত সাদৃশ্য বর্তমান। 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' হীরু ও কুমীর সুপ্ত ব্যর্থ প্রেমের আলেখ্য। অনেকদিন পর কুমীর ঘরে অরন্ধনের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে হীরুর হৃদয়ের গোপন ব্যথা প্রকটিত হয় যখন সে বুঝতে পারে– '[...] আচ্ছা, আর কারো সঙ্গে কথা বলে অমন আনন্দ হয় না কেন? সুরমার সঙ্গে তো রোজ কথা হয়...কই...'[৩২] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা শ্রেণি, পেশা, ধর্মের মানুষের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন, সেসব মানুষের অন্তর্লোকের বাস্তবতাকে সাহিত্যে প্রতিফলনও ঘটিয়েছেন। তিনি *অভিযাত্রিক* দিনলিপিতে এ সম্পর্কে বলেন:

> দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম, তবে কি দেখতে বেড়িয়েচি? [...] মানুষের অন্তর একটি রহস্যময় বিরাট বিশ্ব, এর সীমা নেই, শেষ নেই। মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযান, উত্তর মেরু-দক্ষিণ মেরু অভিযানের মতই কষ্ট ও অধ্যবসায়সাপেক্ষ, সেই রকমই বৈচিত্র্যময়।'[৩৩]

সমাজে ব্যক্তির অসংগতির চিত্র চসার-এর *ক্যান্টারবেরি টেলস*-এর অনুসরণে 'অনুশাসন' গল্পটি রচিত। বালাদাস পুরকায়স্থ সেন্ট জেভিয়ার মন্দিরের সহকারী পুরোহিত। তিনি রবিবার সকালে সর্ব-সাধারণের পাপস্বীকার গ্রহণ করেন ও বিধি অনুসারে দণ্ড দেন। একজন চাষা পাপ স্বীকার করে এবং বলে সে মঙ্গলদাসের শালী সখীবাই পানজিমের নাম করা সুন্দরী ও নাচনেওয়ালীর গোসলের দৃশ্য গোপনে দেখে ফেলেছে। পাপের দণ্ডদানের পর পরদিন সেই চাষা ও পুরোহিতের সাক্ষাৎ ঘটে একই পাপকর্মের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে। লঘু কৌতুকরসের গল্প হলেও গল্পকার সমাজের অসংগতির চিত্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। 'আমার ছাত্র' গল্পে কথকের গণেশদাদা গ্রামের অশিক্ষিত দিনমজুর। বৃদ্ধ বয়সেও তার পড়াশুনা করবার আশ্চর্য আগ্রহই গল্পের সারবস্তু। এ গল্পের সাথে বনফুলের 'অর্জুন কাকা' গল্পের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তবে এদের মূল পার্থক্য গল্পকারদের দৃষ্টিভঙ্গিজাত। দরিদ্রতার কারণে পিতা-মাতার কোলের সন্তান হারানোর হৃদয় বিদারক গল্প 'অন্নপ্রাশন'। 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পটিতে নারী-পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত একত্রবাস নীতিবান পাঠকের কাছে সমাজনীতির হানিকারক মনে হতে পারে। কিন্তু গল্পকারের সহৃদয় সহানুভূতিতে বৃদ্ধ ক্যানভাসার কৃষ্ণলালের জীবনের অকৃতার্থতাও মোহনীয় রূপ লাভ করেছে। 'তিরোলের বালা' গল্পটি বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে অসাধারণ ও অভূতপূর্ব সৃষ্টিকর্ম। গল্পটি একজন অনিন্দ্যসুন্দরী 'সিজোফ্রেনিয়া' রোগী পূর্ণিমার, যে রোগগ্রস্ত অবস্থায় কী কী করে কিছুই মনে রাখতে পারে না। তার ভাই তাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার সময় পথিমধ্যে রাত হওয়ায় এক কৈবর্তের ঘরে আশ্রয় নেয়। সকালবেলা উঠে দেখা যায়, ঘরের মধ্যেই রোগীর ভাইয়ের গলা কাটা। রোশিণী রোগের ঘোরে মাছ কাটা বটি দিয়ে নিজের হাতে ভাইয়ের গলা কেটে ফেলেছে অথচ সকালে উঠে ব্যাপারটা সে বুঝতেই পারে না। অতি নাটকীয় সমাপ্তি পাঠকের মনে ঘা দেয়, এক ধরনের ভয়ানক রসের সৃষ্টি করে। গল্পকারের নির্মোহ বর্ণনার গুণে গল্পটি অনবদ্য সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিতান্ত সাধারণ আকাঙ্ক্ষার খোঁজও রাখতেন গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩.১০

মানব জীবনের আলোকোজ্জ্বল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপের নির্মোহ যৌথ প্রকাশই তাঁর মানববীক্ষার পটুত্বের পরিচায়ক। বিচিত্র মানুষের সাহচর্য, মানুষের জটিল জীবনাভিজ্ঞতা ও লালিত স্বপ্নের বৈপরীত্য এবং মানবপ্রেম হতে উৎসারিত মানবসত্তার চিন্তনসূত্রের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রকৃতি-চেতনার সম্মিলন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর ছোটগল্পে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় মানবচরিত্র সৃষ্টিতে প্রণোদিত করেছে।

৪. মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর-এর অন্বয়সূত্র

পৃথিবীর সকল ধর্মের বিবেচনায় মানুষ ও প্রকৃতি স্রষ্টা তথা ঈশ্বরের সৃষ্টি। সৃষ্টিতত্ত্বের আলোকে জন্মসূত্রে এরা পরস্পর অন্বিত। নিম্নে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে এই ত্রিতত্ত্বের সম্মিলনের গতি-প্রকৃতি আলোচনার চেষ্টা করা হলো :

গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষ ও প্রকৃতিকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দেখিয়েছেন 'কালচিতি' ও 'কবি' গল্পে। তথাকথিত যান্ত্রিক সভ্যতার আলো থেকে কিছুটা দূরে প্রকৃতির আশ্রয়ে আদিবাসী মানুষের সাবলীল জীবনযাত্রার ইতিবৃত্ত হলো 'কালচিতি'। গল্প পাঠান্তে এক ধরনের ভালোলাগার আবেশ সৃষ্টি হয় যা প্রাক-বৃটিশ আমলের ভারতবর্ষের আবহ তৈরি করে। প্রকৃতির কোলেই বাঘ, বন্য-হস্তি ও ভাল্লুকের সাথে এ আদিবাসীদের নৈমিত্তিক বসবাস। এ বনাঞ্চলের অরণ্যচারী মানুষ সম্পর্কে গল্পকারের ভাষ্য:

> [...] এ সব বন্য দেশে আটা ছাতু প্রভৃতি খাদ্য একেবারে অচল। এরা ভাত ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এমন কি তরকারি পর্যন্ত খায় না, হয়তো একটু শাকভাজা আর নুনের টাকনা দিয়ে এক বড় জামবাটি ভর্তি পান্তাভাত দিব্যি মেরে দিলে। তাতেই এদের সবল স্বাস্থ্যবান পাথরেকোঁদা চেহারা, ধনুকবাণ নিয়ে বড় বাঘ ও বুনো হাতী আর ভীষণ শঙ্খচূড় সাপের সামনে এগিয়ে যাবে নির্ভয়ে। আর ভালুক? সে তো এদের ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। সন্ধ্যের অন্ধকারে বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘোরে।[৩৪]

আদিবাসীরা বাজারের বিড়ি কিনে খায় না, খায় পিকা অর্থাৎ কাঁচা শাল পাতায় জড়ানো তামাকের পাতা। পাহাড়ি ঝরনা থেকে খাবারের পানি আসে। অতিথি আপ্যায়নেও তারা নিজেদের উৎপাদিত শস্য ব্যবহার করে। কথকের ভাষ্যমতে–'ঘটিতে চা এল, আর এল তালের পরোটা, গরম ভাজা মুড়ি, তালের ক্ষীর, মর্তমান কলা আর শসার কুচি নুন-নেবু মাখানো। যা কিছু সবই গ্রামের, কেবল পরোটার আটা এসেছে বাইরে থেকে। অবশ্যি চা-চিনিও। খাঁটি দুধের তৈরি তালের ক্ষীরটি অতি উপাদেয় হয়েছিল।'[৩৫] কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় গ্রামের কুটিরে কুটিরে মাটির প্রদীপে মহুয়া বীজের তেল ও বন-করনজার তেলের আলো জ্বলে। বিদায় দেবার সময় গ্রামপ্রধান নারান হাঁসদা উপঢৌকনস্বরূপ কথকের গরুর গাড়িতে ঢেঁড়স, কুমড়ো, পাতিলেবু, বড় একছড়া মর্তমান কলা ও একহালি তাল তুলে দিয়েছিল। প্রকৃতি এসব অরণ্যচারী সরল মানুষগুলোকে সন্তানের মতোই আগলে রাখে। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে আজন্মলালিত আদিবাসী মানুষরা প্রকৃতির মাঝে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই আত্মতুষ্টি নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। 'কবি' গল্পে গল্পকার প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন কবি রঘুনাথ দাসের সরল জীবনচর্যার প্রামাণ্য চিত্র অঙ্কনের

পটভূমিতে। প্রকৃতি ও রঘুনাথ দাসের আন্তঃসম্পর্কের নিবিড়তা, সজীব কবিপ্রাণে অপরিহার্য প্রকৃতির মূর্ছনা, মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থানের ঔপনিষদিক আনন্দের উদ্বেলতাকে নির্দেশ করে।

মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর তিনটি বিষয়ের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে 'জাল', 'কুশল পাহাড়ী' গল্পে। 'জাল' গল্পে বৃদ্ধ রামলাল তুলসীদাসের রামায়ণে বর্ণিত দণ্ডক বনের শোভা ও সৌন্দর্যে আপ্লুত হয়ে রাঁচির অদূরে দেড়শো বিঘা সম্পত্তি কিনে নিবিড় অরণ্যের মাঝে ভরহেচ্ নগর পত্তন করেন। মৃত্যুর সময় যখন বলেন–'ওসব বাত ছোড়ো। আমার বড় চৈন সে দিন বীত গিয়া এই বনের মধ্যে! তুলসীজী বলিয়েছেন–শোভিত দণ্ডক কি রুচি বনী–।'[৩৬] এই উক্তি থেকেই তার ঈশ্বর ভক্তির নমুনা সংগ্রহ করা যায়। ভরহেচ্ নগরের প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে মুগ্ধ কথকের ভাষ্যে :

> [...] কি অপূর্ব শোভা চারিদিকে। কম্‌ব্রিটাস-লতার সাদা পাতার গুচ্ছ বড় বড় শালগাছের মাথায় এমনভাবে সাজানো, যেন দূর থেকে মনে হয় ওরা শালতরুর পুষ্পস্তবক। পাহাড়ের পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্চে, নিঃশব্দে বনভূমিতে দূরে-দূরে রহস্যময় অন্ধকার নেমেছে। বনের মধ্যে ধনেশ পাখী কু-স্বরে ডাকছে, বড় সম্বর হরিণের রব শোনা গেল একবার মাত্র। কি নির্জন চারিধার...মুক্তরূপা ধরিত্রীর জ্যোৎস্না, সূর্যাস্ত ও অরুণোদয় এখানে এক-একটি কাব্য। শুধুই সবুজ বনশীর্ষ, শুধুই ধূসরবর্ণ পাথরের তৈরী শিখরদেশ, অস্ত-দিগন্তের সিঁদুর ছোঁয়া...।[৩৭]

বৃদ্ধ রামলাল ও তার পুত্রবধূ অনসূয়া বাঈয়ের বাঙালি অতিথি হিতেন্দ্রনাথ কুশারীর প্রতি সন্তানবৎ বাৎসল্যের পরিচয় পূর্বোক্ত 'মানুষ' অংশে আলোচনায় উঠে এসেছে।

'কুশল পাহাড়ী' গল্পে সহজ-সরল প্রকৃতির সন্তান আদিবাসী মঙ্গল টুডু আছে। মঙ্গল টুডুরা চুরি করতে জানে না। তাদের জীবনে চাহিদা খুবই কম। তারা অল্পে সন্তুষ্ট, তাই খাটতে চায় না। টাকার মূল্য তারা বোঝে না। সাধুর ভৈরব থানে গিয়ে কথকের মনে হয় 'সব যেন এখানে সুপ্রাচীন–প্রাচীন সাধু, প্রাচীন শালবৃক্ষ, প্রাচীন শিলাসন, প্রাচীন অরণ্যভূমি।'[৩৮] কথক ভৈরব থানের সাধুজীর মুখে ঈশোপনিষদের "কবির্মনীষী পরিভূঃসয়ম্ভু" শ্লোক শুনে মুগ্ধ হয়ে ব্যাখ্যা শুনতে থাকেন :

> কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখি। এই শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্না দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি, কবিই বটে তিনি। আমি কিছু পাইনি বাবা। ভড়ং দেখচো-এসব বাইরের। ভেতরের জ্ঞান কিছু হয়নি। তবে দেখতে চেয়েচি তাকে। তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েছি।[৩৯]

প্রকৃতির মাঝেই ভৈরব থানের সাধু কবিরূপে ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছেন। মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে 'কুশল পাহাড়ী' গল্পে। প্রকৃতির মাঝেই সর্বদা বিরাজমান স্বয়ং ঈশ্বর। ঋগ্বেদে পরাক্রমশালী ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতিকে একে অন্যের পরিপূরক বা আধাররূপে তৈরি করেছেন। বেদ-এ উল্লেখিত ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতি ত্রিতত্ত্বের সম্পর্ক নিয়ে সমালোচকের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

> [...] মৃত্যুর পরও দেহ ও প্রাণ এই মহাপ্রকৃতিতে আশ্রয় নেয়। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ–এই পাঁচটি মহাভূত থেকে আমাদের প্রত্যেকের ব্যষ্টি দেহ নির্মিত হয়েছে অর্থাৎ

> আমাদের ব্যষ্টি দেহরূপ কার্যের সাক্ষাৎ কারণ এই পাঁচটি মহাভূত। আমাদের মৃত্যু হলেও দেহের আকাশ তার কারণ স্বরূপ মহাকাশে বিলীন হয়। দেহের বায়ু মহাসমীরণে মিলিয়ে যায়, দেহস্থ তেজ মহাবৈশ্বানরে (আগুনে) প্রবিষ্ট হয়। দেহস্থিত জল জলাধারে চলে যায়। দেহস্থ জড় পদার্থসমূহ পৃথিবীর মাটিতে মিশে যায়। মৃত্যুকে যদি একটি ব্যষ্টিগত প্রলয় ধরা হয়। তা হলে প্রলয় একটি সমষ্টিগত মৃত্যু বা মূল কারণস্বরূপা প্রকৃতিতে প্রবেশমাত্র বলে ধরা যেতে পারে। আর এই প্রকৃতিও অবিনশ্বর এই কারণেই শুধু মানুষের আত্মাই অবিনশ্বর নয়। জীবনে ও মরণে মানুষ মাত্রেই অবিনশ্বর। মানুষ সম্পর্কে প্রাচ্য তথা ভারতীয় দর্শনের এই আবিষ্কার অভিনব তো বটেই, মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধামিশ্রিত এত বড় কথা আর কোনো দর্শনেই এযাবৎ বলা হয়নি। জীবন সম্পর্কে ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-স্থিতি-সত্তা জাত এই উপলব্ধি বিজ্ঞান-চেতনার দ্বারা সমর্থিত ও পরিস্রুত।[৪০]

মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ এই পাঁচটি থেকে মানুষের দেহ নির্মিত হলে মৃত্যুর পর দেহ বিশ্লিষ্ট হয়ে এই পাঁচটি মহাভূতে ভাগ হয়ে যায়। 'পুঁইমাচা' গল্পের কিশোরী ক্ষেন্তির তার নিজের রোপণ করা নধর সুপুষ্ট পুঁইপাতাগুলির মধ্যে মৃত্যুর পর সে নিজে জীবনস্বরূপে আশ্রিত একথা বলাই যায়। শক্তির নিত্যতা সূত্রও বলে, শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই শুধুমাত্র রূপান্তর আছে। পুঁইপাতাগুলির মধ্যেই ক্ষেন্তির শরীর ও জীবনের নবতর রূপান্তর ঘটেছে। উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে, মানুষের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যকার যে বিপ্রতীপতা, ব্যবধান, দূরত্ব তা অনেকাংশে কমে এসেছে ফলে মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের পারস্পরিক সংহত যোগসূত্রের নবতর মাত্রা উন্মোচিত হয়েছে। মানুষের জীবনের সমগ্রতার সঙ্গে প্রকৃতি-চেতনা ও ঈশ্বর-ভাবনার সমসত্ত্ব মিশ্রণ তাঁর ছোটগল্পগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে দুঃখ-যন্ত্রণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কৃতিত্ব-ব্যর্থতা, ক্লেদ-গ্লানির সমন্বয়ে প্রবহমান মানব জীবনের সামগ্রিকতাকেই ধারণ করেছেন। এখানে তিনি গণমানুষের ভেতরে তাদের অধিকারবোধ জাগিয়ে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। মূলত তিনি জীবন রসিক শিল্পী। নির্মোহ, নির্লিপ্ত রসগ্রাহী হিসেবে মানবজীবনের বিচিত্র রসাস্বাদনই যেন তাঁর ছোটগল্প রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেখানে জীবনের বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়েছে। মানবচরিত্রের নানা অভিজ্ঞতা তাঁর সজীব কল্পনার মিশ্রণে ছোটগল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। জীবনদৃষ্টির সুবিশাল পার্থক্য থাকলেও উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচনার বিষয়শৈলীর সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পের সমধর্মিতা প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে প্রকৃতি-প্রেম এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতি-চেতনার মূলগত পার্থক্য হলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতির সাহচর্যে অর্জিত অনুভূতির সাহায্যে বিশ্বদেবতার কল্পনা করেছেন, আর বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মোহনীয় রূপে শুধু মুগ্ধ ও আত্মতৃপ্তই হয়েছেন, কোনো সূক্ষ্মতর আকুতি প্রবল হয়ে ওঠেনি। মূলত অর্জিত জীবনাভিজ্ঞতা ও মৃদু কল্পনার মিশেলের পরিমিতিতে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর ছোটগল্পের ভুবন। জীবনকে প্রকাশ ও গোপন করার এই আশ্চর্য পরিমিতিবোধ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মহৎ শিল্পীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর ছোটগল্পে মানুষের জীবনোপলব্ধি, প্রকৃতির সৌন্দর্য-চয়ন ও অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা আশ্চর্য গীতময়তায় একীভূত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ২৩৩

২ Lal Ramji, *William Wordsworth Selected poems an evaluation of his poetry*, Aarti Book Centre, New Delhi, 1993, p. 44

৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৫৮০

৪ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (৬ষ্ঠ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ৫৫৮

৫ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (৪র্থ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৩২৬

৬ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ৩১৩

৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮

৮ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (৩য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৬৭

৯ তারকনাথ ঘোষ, *জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ*, আনন্দধারা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃ. ১০৯

১০ প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ২৩

১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ*, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৮১

১২ সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩১

১৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ৫৫৩

১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৩

১৫ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৫৯৭

১৬ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপনিষদের দর্শন*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৯ (৪র্থ সংস্করণ), পৃ. ৮৭-৮৮

১৭ গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১২৩

১৮ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ৪৬১

১৯ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (৩য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২১১-২১২

২০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ১৩১

২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৮

২২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০

২৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ২৭০-২৭১

২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯

২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

২৬ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ২২৭

২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০৪

২৮ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ২৬৪
২৯ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (৬ষ্ঠ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ৬৮৮
৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৫
৩১ চিত্তরঞ্জন ঘোষ, *বিভূতিভূষণ*, বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃ. ১৬৮
৩২ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ১৬৪
৩৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ৩২৫
৩৪ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৫২০-২১
৩৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২২
৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১
৩৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬
৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৩
৩৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৪
৪০ অর্ধেন্দু বিশ্বাস, *বিভূতিভূষণ: বিচার ও বিশ্লেষণ*, 'প্রকৃতিচেতনা ও বিভূতিভূষণের গল্প', সম্পাঃ পার্থজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতাঃ পাণ্ডুলিপি, ১৯৯২), পৃ. ১২৭-১২৮

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.006

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ

মো. আবু বকর সিদ্দিক*

সারসংক্ষেপ

বিশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালি মুসলমান সমাজ তার প্রকৃত অস্তিত্বের খোঁজে ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করে। প্রাবন্ধিক ও চিন্তক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (১৯১১-১৯৮৪) বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিদেরই একজন। নানান গবেষণামূলক প্রবন্ধে তিনি জাতি, জাতীয়তা এবং জাতিরাষ্ট্র নিয়ে নির্মোহভাবে পর্যালোচনা করেছেন এবং এরই সূত্র ধরে বাঙালি মুসলমানকে বাংলার হিন্দু ও বহিরাগত মুসলমানের থেকে স্বতন্ত্র ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত জাতি হিসেবে উপস্থাপন করে তাদের পরিচয়গত হতাশা থেকে মুক্তির প্রয়াস চালিয়েছেন। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরির পরিপ্রেক্ষিত বোঝার জন্যে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসের বাক্-পরিবর্তনসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ জানার জন্যে এ-জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি নির্মাণে তিনি জাতিগত পরিচয়, ভাষাগত পরিচয় ও সাহিত্যে তার সংস্কৃতির (মুসলিম সংস্কৃতি) যথার্থ প্রতিফলনের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি মুসলিম সংস্কৃতিকে প্রভাবশালী হিসেবে নির্মাণ করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (২০১৭) গ্রন্থের নির্বাচিত প্রবন্ধে 'বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ে'র প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে এবং তিনি বাংলার মুসলমানের সামগ্রিক ইতিহাসকে কীভাবে দেখেছেন তার পর্যালোচনা করা হয়েছে—একই সঙ্গে তিনি বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকটের মূল কারণসমূহ কীভাবে চিহ্নিত করেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে এবং এসব সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে যে-উপায়সমূহ বাতলে দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর আলোচনার মৌলিকত্ব ও সীমাবদ্ধতাও বিচার করা হয়েছে। গবেষণা-ক্ষেত্রে প্রধানত পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর সঙ্গে নির্ধারিত কালপর্বের অন্যান্য প্রাবন্ধিকের চিন্তার তুলনা করতে গিয়ে তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: বাঙালি মুসলমান, আত্মপরিচয় সংকট, ইতিহাসচেতনা, মুসলিম ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ

১. প্রাক্‌কথন

বিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে একজন অগ্রগণ্য চিন্তক হলেন আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ। তিনি দেশে ও বিদেশে শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। হবিবুল্লাহ শিক্ষকতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয় (অস্ট্রেলিয়া) ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (দিল্লি)। শিক্ষক ও গবেষকসত্তার বাইরে হবিবুল্লাহ ছিলেন একজন মানবিক, সমাজ-সচেতন ও সংস্কৃতিমান মানুষ।[১] তিনি অসাম্প্রদায়িক

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট-৩১১৪

জীবনবোধে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জীবনব্যাপী মুক্তবুদ্ধির চর্চা করে গেছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন এবং প্রগতিশীল ও সমন্বয়ধর্মী জাতীয়তাবাদী চিন্তক হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছিলেন। হবিবুল্লাহ ছিলেন উদার, মুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। তৎসময়ের মুসলিম রক্ষণশীল ধারার বিপরীতে ছিল তাঁর অবস্থান।[২] হবিবুল্লাহর মানবতাবাদী মনন তাঁকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তিনি জীবনের একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত অখণ্ড সর্বভারতীয় রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।[৩]

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর গবেষণা ও সৃজনশীল রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মৌলিক গ্রন্থ, অনুবাদ, গবেষণা-প্রবন্ধ, সাধারণ প্রবন্ধ, সভাপতির ভাষণ, পুস্তক সমালোচনা ও যুক্তিনির্ভর প্রত্যুত্তর প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে—*Foundation of Muslim Rule in India: A History of the Establishment and Progress of the Turkish Sultanate of Delhi: 1206-1290* (1945), *Descriptive Catalogue of Arabic, Persian and Urdu Manuscripts in Dacca University Library* (1966), *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (প্রবন্ধ-সংকলন, প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৪, কথাপ্রকাশ সংস্করণ: ২০১৭), *আলবেরুণীর ভারততত্ত্ব* (অনুবাদগ্রন্থ, ১৯৭৪) ও *বিলায়েতনামা* (১৯৮১) ইত্যাদি। অধ্যাপক হবিবুল্লাহর গবেষণায় বৈচিত্র্য ও প্রসারতার মূলে ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসচর্চায় প্রয়োজনীয় ভাষার ওপর তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ভারত ও বাংলার মুসলমানের ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে 'বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়' সংক্রান্ত ভাবনাসমূহ প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর ইতিহাস-গবেষণার মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে আত্মপরিচয় সংকটের মূল দিকটি সামনে নিয়ে এসেছেন এবং বাঙালি মুসলমান সমাজকে আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে নানান দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন। তিনি আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে সমন্বয়বাদী ধারার সংস্কৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি বাংলা অঞ্চলের সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়াও তিনি বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের আলোচনায় বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতিসত্তা ও জীবনবোধ—প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন। বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজের আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর (*সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস* গ্রন্থে আলোচিত) অভিমত, যুক্তি, বিশ্লেষণ প্রভৃতির আলোকে তাঁর বক্তব্যের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

২. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ইতিহাসবিদ হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে মধ্যযুগের বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানান বিষয়। বাঙালি মুসলমানের

আত্মপরিচয়ের সন্ধান বিষয়েও তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। তবে তিনি বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট নিয়ে কোনো একক গ্রন্থ রচনা করেননি। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা প্রধানত তাঁর লেখা বেশকিছু প্রবন্ধের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর গবেষণাকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ। তাঁর লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধ *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (২০১৭) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রবন্ধে ভারতীয় ও বাঙালি মুসলমান সম্পর্কে তাঁর নানান পর্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলির বিষয়বিন্যাসের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় যে, মোট তেরোটি প্রবন্ধের মধ্যে পাঁচটি প্রবন্ধ ('ভারতের মুসলমান', 'বাংলার মুসলমান', 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ', 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' ও 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস') ভারতে ইসলাম প্রচার এবং বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতিভাবনা নিয়ে রচিত। এছাড়া উক্ত বইয়ে ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতা সম্পর্কিত প্রবন্ধ রয়েছে চারটি ('মুসলিম মনীষা', ইসলামের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা', 'মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ', ও 'মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ: নগর ও রাষ্ট্র')। দুটো প্রবন্ধ উর্দুসাহিত্য ('উর্দু সাহিত্যের ভূমিকা' ও 'উর্দু ইতিহাস-সাহিত্য') নিয়ে লেখা। একটিতে ওহাবি আন্দোলন ('ভারতে ওহাবী আন্দোলন') এবং অন্য একটিতে ইতিহাসের সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ ('ইতিহাসের কি ও কেন?') নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। বাঙালি মুসলমান সম্পর্কে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গিও এই বইয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে, এই বইয়ের বেশকিছু প্রবন্ধে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (যেমন—'বাংলার মুসলমান', 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ', 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' ও 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস') বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন। এসব প্রবন্ধে তিনি বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকটকে যেমন চিহ্নিত করেছেন, তেমনি সংকট থেকে উত্তরণের উপায়ও বাতলে দিয়েছেন। বর্তমান নিবন্ধে শেষোক্ত চারটি প্রবন্ধ বিশ্লেষণের আলোকে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সম্পর্কিত চিন্তার স্বরূপ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ বোঝার জন্যে প্রাবন্ধিক ও চিন্তক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন—বাঙালি মুসলমানের জাতিগত পরিচয় কীভাবে নির্মিত হয়েছে?, তার জাতিগত পরিচয় নির্মাণে ধর্মীয় পরিচয় কোনো বাধার সৃষ্টি করেছে কিনা?, বাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার কীরূপে হয়েছে?, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সংকটের জন্যে প্রধানত কাদের দায়ী করা যায়?, বাঙালি মুসলমান কেনো 'বাংলা ভাষা' ও 'বাঙালি সংস্কৃতি' নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে?, বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি কী হবে?, তার সাংস্কৃতিক জগৎ কীভাবে নির্মিত হয়েছে?, বাঙালি মুসলমান কোন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবে এবং কেন করবে?, কীভাবে সে বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালি সংস্কৃতিতে নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য তথা মুসলিম জীবনের পরিচয় ফুটিয়ে তুলবে?, বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের উপায় কী হবে?, সর্বোপরি, তার আত্মপরিচয়ের সংকট কীভাবে দূর হবে?—প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের মধ্য দিয়ে তিনি মূলত বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপকে তুলে ধরেছেন।

বর্তমান নিবন্ধে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে—বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়হীনতার কারণ অনুসন্ধান, বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আত্মপরিচয়ের স্বরূপ, বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং উপসংহারে গবেষণার ফলাফল পেশ করা হয়েছে।

২.১ বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ তাঁর 'বাংলার মুসলমান' প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের প্রত্যুষকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন। যেমন—বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার কীরূপে হয়েছে?, বাংলার ইসলামের রূপ কেমন?, বাংলা কীভাবে তার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা হারিয়েছে?, বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিভাজনের বীজ কারা রোপণ করেছে?—প্রাবন্ধিক প্রধানত এ-সব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে তুলে ধরেছেন। বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং তাদের আত্মপরিচয় সংকটের পরিপ্রেক্ষিত বোঝার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত প্রশ্নাবলির উত্তর জানার প্রয়োজন রয়েছে।

উত্তর ভারতে যেভাবে ইসলাম প্রচার হয়েছে, বাংলায় সেভাবে হয়নি। বাংলায় ইসলামের বাণী প্রথম এসেছিল আরব থেকে। সেটা স্থলপথে নয়, সমুদ্রপথে।[৪] তার প্রসার ঘটেছিল নীরবে। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে আরব বণিক সম্প্রদায়ের ভারতে আগমনের সূত্র ধরে ভারতবাসী প্রথম ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হয় বলে জানা যায়। তবে বাংলার সঙ্গে আরবের সম্পর্ক এ-দেশে ইসলাম আগমনের পূর্বেই শুরু হয়েছিল।[৫] তাছাড়া, প্রাক্-মুসলিম যুগে আরবের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। প্রাবন্ধিক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ আরবের সঙ্গে বাংলার প্রাথমিক সময়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—রাষ্ট্রীয় শাসন শুরুর পূর্বে বাংলার মুসলমান সমাজে ধর্মগত নয়, সংস্কৃতিগত প্রভাবই বেশি ছিল। আরবদের ইসলাম প্রচারের মূল দিকটি ধর্মগত না হয়ে সংস্কৃতিগত হওয়ার কারণে বাংলায় ইসলামের একটি দেশজ রূপ গড়ে ওঠে। এখানে ইসলামের মূল ধর্মীয় নীতি অক্ষুণ্ন রেখে সহজ মানবীয়তা, সাম্য ও প্রসারমান সংস্কৃতির আদর্শ প্রাধান্য পেয়েছে।[৬]

তেরো শতকের গোড়ার দিকে উত্তর ভারতে তুর্কি-মুসলিমদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলার মানসে তারা কোনো ধরনের যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেনি। বাংলার মুসলমান সমাজ উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছে। ফলে বাংলার অবস্থানও তখন বরাবর দিল্লির বিরুদ্ধে গিয়েছে। দশম শতক থেকে বহির্বিশ্বে, বিশেষ করে এশিয়ায় তুর্কি-ইরানি শক্তির উত্থান মুসলিম জগৎ থেকে আরব প্রাধান্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। 'আরবেতর' বা আরবের বাইরের জাতি হিসেবে তুর্কি ও ইরানিদের প্রতি আরবদের এক ধরনের অবজ্ঞাও ছিল। এর ফলে বাংলাকেও আরবরা তুর্কি-ইরানি শক্তির বিরুদ্ধে একটি ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এ-কারণে

তুর্কি-আরব দ্বন্দ্ব এক সময় প্রবল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, তেরো শতকে ভারতে তুর্কি বিজয় এশিয়ায় আরবদের প্রভাব অনেকটাই বিপন্ন করে দেয়। এভাবে এশিয়ায় আরবরা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারত মহাসাগরের তীরে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজতে থাকে।[৭] তাছাড়া, তুর্কি-আরব দ্বন্দ্বের আরও একটা বড় কারণ ছিল সমুদ্রপথে আধিপত্য বিস্তার। তেরো শতকে ভারতে তুর্কি বিজয়ের ফলে আরবদের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই বিপন্ন হয়ে যায়। বিপরীত আদর্শসম্পন্ন এবং বিপরীত পথে আগত এই দুই জাতির দ্বন্দ্বও তীব্রতর হয়ে ওঠে। এছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ একচেটিয়াভাবে বাংলার হাতে ছিল। তুর্কি বিজয়ের কারণে আরব প্রভাব খর্ব হওয়ার দরুন তা দিল্লির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এর ফলে বাংলার অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণের জন্যে দিল্লি বাংলাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু বাংলার মানুষ নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের ব্যাপারে ঠিকই সচেতন থেকেছে। তারা দিল্লির কাছে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার সঁপে দিতে চায়নি। এভাবেই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব বাংলার মুসলমান তথা বাঙালির মধ্যে জাগ্রত হয়। দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুকে আত্মসচেতনও করেছে।[৮]

মুঘল আমলে বাঙালি মুসলমান সমাজ এশিয়ার মুসলিম সমাজের জ্ঞানতাত্ত্বিক জগতের সংস্পর্শে তেমন আসতে পারেনি। সাহিত্যও সৃষ্টি করতে পারেনি। এ-কারণে, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাংলার মুসলমানের শাসনের ইতিহাস কোথাও সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। উত্তর ভারতের দর্শন, কাব্য ও ইতিহাস ইত্যাদি চর্চার প্রেরণা এসেছে ইরাক ও মধ্য এশিয়ার 'ইমিগ্র্যান্টদে'র (অভিবাসী) কাছ থেকে। দক্ষিণ ভারতে মনীষী যারা এসেছিলেন, তাঁদের সকলেই ছিলেন নবাগত। তাছাড়া অধিকহারে অভিবাসীদের আগমনের কারণে মুসলমানের ইতিহাস একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনি।[৯]

বাংলার সমাজব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রপরিচালনায় স্বাদেশিক মনোভাব লক্ষ করা যায়। বাংলার সামাজিক বিকাশও 'বাঙালিত্ব'কে আশ্রয় করে এগিয়েছে। তাছাড়া, বাংলার রাষ্ট্র পরিচালনায় দেশজ অমুসলমানের সহযোগিতা ছিল। সমান অংশগ্রহণও ছিল।[১০] বাংলায় মুসলমানদের শাসনামল নিয়ে তেমন লিখিত দলিল না-থাকলেও রাজকার্যে অমুসলমানদের অবদান রাখার অবাধ সুযোগ ছিল। প্রাত্যহিক জীবনের এই ঘনিষ্ঠতা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক ধর্ম ও সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগেরও জন্ম দিয়েছে।

বাঙালি মুসলিম মানসে আরব প্রভাবিত 'Militant ধর্মীয়তা'র ছাপ লক্ষ করা যায়নি। বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ঔদার্য বিরাজমান থাকার সময়েই ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার বেশি হয়েছে। বাংলায় ইসলাম প্রসারের ধরন নিয়ে হবিবুল্লাহর মন্তব্য—'ইসলাম প্রচারকদের প্রায় সকলেই এসেছে উত্তর ভারত দিয়ে ইরান, ইরাক ও মধ্য এশিয়া থেকে। কিন্তু বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আবহাওয়ায়, যেখানে সামাজিক exclusiveness ও উগ্র ধর্মীয়তার কোনও অস্তিত্ব নেই—তাদের প্রচার পদ্ধতি সেবার মধ্য দিয়ে শান্ত ব্যক্তিগত আবেদনের রূপ নিতে বাধ্য হলো।'[১১] অবশ্য বাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু মতও আছে। যেমন, উনিশ শতকের

শেষের দিকে রিজলি, বেভেরলি ও হান্টার প্রমুখ লেখকের মাধ্যমে এই মত প্রচারিত হয়—'বাংলার মুসলমান, বাংলার হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তর থেকে উদ্‌ভূত—ইসলামের তলোয়ারের জোরে তারা মুসলমান হয়।'[১২] Richard M. Eaton তাঁর বিখ্যাত *The Rise of Islam and Bengal Frontier, 1204-1760* (1993) বইয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনামলে 'বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণে'র ('Religion of the Sword thesis') বিষয়টিকে অযৌক্তিক হিসেবে প্রমাণ করেছেন।[১৩] কাজী আবদুল ওদুদও (১৮৯৪-১৯৭০) তাঁর 'বাংলার মুসলমানের কথা' প্রবন্ধে যৌক্তিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই মতকে ('তরবারি তত্ত্ব') ভ্রান্ত হিসেবে প্রমাণ করেছেন। অবশ্য কাজী আবদুল ওদুদের পূর্বে হান্টার ও অন্যান্য লেখকের উল্লিখিত মতের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি (১৮৪৮-১৯১৭)। উনিশ শতকের শেষ দশকে তাঁর লিখিত *হকিকত্-ই-মুসলমানান-ই-বাঙ্গালা* (১৮৯১) গ্রন্থে বাংলায় আগত বেশিরভাগ মুসলমানকে 'বহিরাগত' (আরব, ইরান, তুরান, মুঘল, পাঠানদের বংশধর হিসেবে অভিহিত করা) হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।[১৪] তবে খোন্দকার ফজলে রাব্বির মতামত যে যথার্থ নয় তা আধুনিক বাঙালি মুসলমান লেখকেরা প্রমাণ করেছেন। এম. এ. রহিম (১৯২১-১৯৮১) তাঁর *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২; তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ: ২০২২) গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, বাংলায় মুসলিম শাসনামলে বহিরাগত অভিজাত মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের নিপীড়নে ধর্মান্তরিত হওয়া দেশীয় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল।[১৫] অসীম রায় তাঁর *The Islamic syncretistic tradition in Bengal* (1983) গ্রন্থে বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্যের ক্ষেত্রে পিরদের ভূমিকাকে বড়ো করে দেখেছেন।[১৬] অবশ্য, রিচার্ড ইটনও 'পিরবাদী' ভূমিকাকে অন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। অসীম রায় যেখানে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অস্থিতিশীল সমাজে পিরদের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, রিচার্ড ইটন সেখানে পিরদের বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁদেরকে 'বাংলার কৃষি সীমান্তের প্রেরণা-সঞ্চারক' বলে অভিহিত করেছেন।[১৭] যাহোক, বাংলায় মুসলমানদের উৎপত্তি নিয়ে দ্বিমত আছে। তবে বাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সাম্য ও মানবিক জীবনবোধই প্রাধান্য পেয়েছিল—এ-ব্যাপারে কমবেশি সবাই একমত পোষণ করেছেন। এ-ক্ষেত্রে ফকির, দরবেশ, সুফি ও সন্তেরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১৮]

বাংলায় ধর্ম ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে এক ধরনের সমন্বয়বাদী সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। এটা ক্রমে বাধাগ্রস্ত হয়। তেরো শতকে তা একেবারেই রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ক্রমে বাংলা তার আত্মপ্রতিষ্ঠা হারায় ষোলো শতকে—পাঠান ও মুঘল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে। ষোলো শতকের পাঠান-মুঘল যুদ্ধে মুঘলদের জয়লাভ বাংলার ইসলামের ঔদার্যকেও ক্ষুণ্ন করেছে। মুঘল সাম্রাজ্যের দীর্ঘ প্রভাব বাংলা কোনোভাবেই এড়াতে পারেনি। তবু তারা এর প্রতিবাদ করেছে, সহজে মুঘলদের গ্রহণ করেনি। আত্মরক্ষার প্রয়াস চালিয়েছে প্রতিনিয়ত।[১৯] অন্যদিকে, আরবদের সামুদ্রিক ক্ষমতা ষোলো শতকে পর্তুগিজদের হাতে চলে যাওয়ার কারণেও বাংলার আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সকল ধরনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। এটিকে (সমুদ্রে আরবদের কর্তৃত্ব হারানো) প্রাবন্ধিক বাংলাকে মুঘল শাসনের কাছে নতি স্বীকার করার বড় কারণ হিসেবে

চিহ্নিত করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে আরবের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[২০] এর ফলে, উত্তর-ভারত ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাংলার মুসলমানদের অযাচিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে তা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলার জন্য নেতিবাচক পরিণতিই বয়ে আনে। বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের যে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তাতেও ভাঙন শুরু হয়।

দিল্লির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার যুক্ত হওয়ার কিছু ইতিবাচক দিকও ছিল। এর মধ্য দিয়ে বাংলার 'প্রাদেশিক আত্মসর্বস্ব মানসিকতা' প্রসারিত হয়েছে এবং 'সাংস্কৃতিক চেতনা'ও বিস্তৃত হয়েছে। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সমাজের 'প্রগতিশীল ফার্সি সাহিত্যে'র সঙ্গেও পরিচয়ের সুযোগ তৈরি হয়।[২১] তবে, বাঙালি বর্হিজগতের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারেনি। এ-কারণে বাঙালি মুঘল শাসনকার্যেও সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এ-জন্যেই বর্হিভারতীয় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আদর্শানুপ্রাণিত বাঙালি মুসলমানের কিছু অংশ 'স্বাদেশিকতার মর্যাদা' দাবি করেছিল।[২২] বাঙালি হওয়ার তাগিদ মুসলমান সমাজের সব স্তরেই আগে অনুভূত হয়েছিল। সে-কারণে, বাঙালি মুসলমান সমাজের সংহতি ও একাত্মবোধও প্রবল হয়েছিল। মুঘল শাসন সেখানে বাধার সৃষ্টি করে। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের মূল সংকট তৈরি হয় এখানেই—

> বাঙালী হওয়ার যে তাগিদ মুসলমান সমাজের সব স্তরেই পূর্বে অনুভূত হয়েছিল এবং যার ফলে সমাজের সংহতি ও একত্ববোধ প্রবল হয়েছিল, সে তাগিদ না থাকাতে সামাজিক বাঁধনও শিথিল হয়ে পড়ল এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকারভেদ শ্রেণীনির্ভর হয়ে গেল। অভিজাতদের মানস রইল দিল্লী ও ইরানের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি, আর বাঙালীত্ব যাদের রক্তমাংসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই অনভিজাত মুসলমান উত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে চমৎকৃত হলেও প্রাদেশিক মানসিকতা ও সহানুভূতি বর্জন করার কোনও প্রয়োজনই অনুভব করল না।[২৩]

বলা যায়, সামাজিক বিপ্লবের কারণে তখন যে অভিজাত শ্রেণি তৈরি হয়, বাংলার মুসলমানের গতিপ্রকৃতির ধারা তাদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। একদিকে চৈতন্যের শুদ্ধি আন্দোলন, অন্যদিকে মুঘলদের সময়ে সৃষ্ট এই অভিজাত শ্রেণির ইসলাম নিয়ে একঘেয়েমি মনোভাব ও সংকীর্ণতা বাংলার মুসলমানদের 'বাঙালি' হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। ভাষার দৃষ্টান্তও এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। মুঘল যুগে বাংলা ভাষা সাহিত্যানুরাগী অভিজাত মুসলমানদের কাছে সমাদর পায়নি। তাঁদের কাছে ফার্সি ভাষার অনুশীলনই ঐতিহ্যের ও আভিজাত্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল।[২৪] এ-কথা বলা যায় যে, বাঙালি মুসলমান সমাজে বিভেদ সৃষ্টির বীজ মুঘল আমলেই সূচিত হয়েছিল। এই ভেদ সৃষ্টির কারণে প্রাবন্ধিক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমান সমাজ 'দ্বিখণ্ডিত' হয়ে যায় বলে মনে করেন।[২৫]

মূলত, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ তাঁর 'বাংলার মুসলমান' প্রবন্ধে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলায় মুসলমানদের আগমন, ইসলামের প্রচার ও প্রসার, আরবদের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক, দিল্লির সঙ্গে তুর্কি ও ইরানের সম্পর্ক, দিল্লির সঙ্গে বাংলার বিরোধ, ইসলাম ধর্মের উদারতা ও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি, মুঘল শাসনামলে সৃষ্ট জাতিভেদ প্রভৃতি এ-প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাংলার মুসলমান শাসনামলের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে এ-অঞ্চলের মুসলমানদের 'বাঙালি' হওয়ার পথে

সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলোও তুলে ধরেছেন। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সংকটের নেপথ্যে মুঘল শাসনামলের ভূমিকা যে সক্রিয় ছিল তা হবিবুল্লাহ দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন।

২.২ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়হীনতার কারণ অনুসন্ধান

বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট চিরদিনের। ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতার দরুন এই সংকটের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। বিশেষ করে, নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক প্রভৃতির লিখিত ইতিহাস না-থাকার জন্যে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি হয়েছে। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ মনে করেন, বাঙালি মুসলমানের ইতিহাসচর্চায় অনীহাই তার আত্মপরিচয়হীনতার অন্যতম কারণ। তিনি এ-বিষয়ে 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে যৌক্তিক আলোচনা করেছেন। এ-প্রবন্ধে তিনি কেবল বাঙালি মুসলমানের লিখিত ইতিহাস না-থাকার কারণই বিশ্লেষণ করেননি, কীভাবে বাঙালি মুসলমান ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয়ের ভিত্তি নির্মাণ করতে পারে তার উপায়ও বাতলে দিয়েছেন।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 'বাঙালি'র যে পরিচয় হাজার বছর ধরে নির্মিত হয়েছে তার তিরোধান সম্ভব নয় বলে মনে করেন। তিনি 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস' প্রবন্ধে এই 'বাঙালিত্বের'ই ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। লেখকের মতে, বাঙালিত্বের ইতিহাস অনুসন্ধানে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর জানার প্রয়োজন রয়েছে—'[...] কবে হতে আমরা বাঙালী বলে নিজেকে চিনেছি? কোন্ প্রক্রিয়ার ফলে এখানকার মুসলমান উত্তরাপথের সাংস্কৃতিক চিন্তা থেকে আলাদা হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে উঠল? উত্তর ভারতের ও বাঙালী মুসলমানের মধ্যে অর্থনৈতিক বিবর্তনের প্রভেদ কেন? আকৃতিগত পার্থক্যেরই বা কী কারণ?।'[২৬] বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ বোঝার জন্যেই উপর্যুক্ত প্রশ্নাবলির উত্তর জানার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, আত্মপরিচয় সম্বন্ধে সচেতন না-হলে সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্থবহ হয়ে ওঠে না। রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করার জন্যে প্রত্যেক জাতির সাংস্কৃতিক ভিত্তির প্রতি সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।[২৭] বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ অনুসন্ধানের তাগিদে বাংলার মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে জানার দরকার আছে। এ-ক্ষেত্রে লেখক বাংলায় মুসলমান যুগের ইতিহাসচর্চাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই সঙ্গে 'প্রাক মুসলিম বাংলার ইতিহাসও মুসলমানের পক্ষে সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোনও কিছুই অতীতকে এড়াতে পারে না।'[২৮]

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায়, বাংলায় মুসলমান শাসনামলের ইতিহাস খুবই অবহেলিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমান শাসনামলের তথা মধ্যযুগের প্রায় ৮০০ বছরের ইতিহাস আলোচনায় যথার্থ স্থান পায়নি। অনেকক্ষেত্রে ভুল ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাঙালি মুসলমান, এমনকি বাঙালি হিন্দুর আত্মপরিচয়ের ভিত্তি নির্মাণের জন্যে এই আটশত বছরের ইতিহাস জানার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, 'আজকের বাঙালী মুসলমানের সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কাহিনি অজানা তো বটেই, বাঙালী-হিন্দুর আত্মপরিচয়ও অসম্পূর্ণ থেকে যায় যতদিন না মধ্যযুগের এই প্রায় ৮০০ বছরের বিবর্তনীয় ধারাগুলি সুস্পষ্ট হয়।[২৯] আবু

মহামেদ হবিবুল্লাহ বাংলার ইতিহাসে বাঙালি মুসলমান শাসনামলের তেমন গুরুত্ব না-পাওয়ার যে প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন তা নিয়ে আরও অনেক ইতিহাসবিদ ও লেখক একই মন্তব্য করেছেন। যেমন, আবদুল হক তাঁর 'বাঙালী মুসলমান : ভূমিকা ও নিয়তি' প্রবন্ধে বাংলার ইতিহাসকে 'খণ্ডিত ও অসম্পর্ণ' বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেছেন—'[...] বাঙালী মুসলমানের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস প্রধানতঃ বাংলায় আগত অবাঙালীদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অঙ্গ মাত্র, এমনকি সে ইতিহাসে লীন। বাংলার ইতিহাস তাই আর যা-কিছু হোক, বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস নয়।'[৩০]

বাংলার ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকেরা 'মুঘল আমল'কে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। ইংরেজ মারফত বাঙালিরা মুঘল শাসকদের শক্তি ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে বেশি পরিচিত হওয়ার কারণে তারা মনে করে মুসলমানের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বার মুঘল আমলেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।[৩১] এ-রকম ধারণা বাংলার মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে 'খাপছাড়া' (খণ্ডিত) মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। প্রাবন্ধিক এ-সম্পর্কে বলেছেন—'কিন্তু ভুলে যাই, কারণ জানবার সুযোগ আজও সৃষ্টি হয় নাই, যে প্রায় ৩০০ বছর ধরে এদেশে একটা স্বাধীন সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র ছিল মুঘলদের পূর্বে এবং যে রাষ্ট্র ছিল উক্ত ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপ্রসূত।'[৩২] বাংলার হিন্দু মুসলমানের ভাষা, দুই ধর্মের ঔদার্য ও সমন্বয়ের চেষ্টা মুঘল শাসক সম্রাট আকবরের সময় (শাসনকাল: ১৫৫৬-১৬০৫) থেকে নয়, আরও ১০০ বছর আগেই শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বাঙালি মুসলমানেরা তা অবগত নয়। এমনকি রক্ত সম্পর্কে বাঙালিরা যে তিব্বতীয় মঙ্গলীয়-দ্রাবিড়ীয় অস্ট্রিক জাতির কাছাকাছি তাও তারা ভুলে যায়।[৩৩]

বাংলার মুসলিম আমলের কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। এ-জন্যে মুসলমান শাসনামলের নথিপত্র, ব্যক্তিগত পত্র ও অন্যান্য উপাত্ত আবিষ্কার করে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা প্রয়োজন। কিন্তু বাঙালি মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় ইতিহাস সংগ্রহ ও রক্ষায় পিছিয়ে আছে। তারা এ-বিষয়ে সচেতনও নয়। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ মনে করেন, এ-ধরনের মানসিকতা মুসলমানদের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রটিকে আরও সংকীর্ণ করে দিয়েছে।[৩৪] তাছাড়া, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সাধনা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যা বাঙালি মুসলমানের মধ্যে নেই।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাসকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে একটা জাতির নাড়ি-নক্ষত্রের খবর পাওয়া যায়। তিনি মুসলিম বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মন্তব্য করেছেন—'[...] রাজবংশের উত্তানপতন ও যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা ইতিহাসের কাঠামো মাত্র, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণে। কিন্তু মুসলিম বাংলার ইতিহাসে সে প্রাণ প্রতিষ্ঠা দূরের কথা, স্থূল কাঠামোরও অনেকাংশ অসম্পূর্ণ।'[৩৫]

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 'বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস' প্রবন্ধে জোরালোভাবে বলেছেন যে, বাঙালি মুসলমানদের উল্লেখ করার মতো ইতিহাসচর্চার কোনো ক্ষেত্র নেই। সমৃদ্ধ ইতিহাস থাকার পরেও চর্চার অভাবে বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ই এখন সংকটের মুখে। প্রাবন্ধিক বারবার বাঙালি

মুসলমানদের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রগুলো কীভাবে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা যায় সেদিকেই আলোকপাত করেছেন। আর মুসলিম বাংলার কাঠামো নির্মাণের ইতিহাস নয়, প্রয়োজন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস—এরূপ ইতিহাস নির্মাণের মধ্য দিয়েই একটা জাতির আত্মপরিচয়ের ভিতকে চিহ্নিত করা যায়।

২.৩ বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আত্মপরিচয়ের স্বরূপ

'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ' নামক প্রবন্ধে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আত্মপরিচয়ের সংকটের চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের উপায় নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বাঙালি সংস্কৃতিতে মুসলমানের দান কম নয়। বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র মানসিকতা, হৃদয়ভিত্তি, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংস্কৃতিচেতনা আছে এবং সাহিত্যে তার যথার্থ রূপ দেওয়ার প্রয়োজনও রয়েছে। এ-কারণে, মুসলিম জনসাধারণের মূল্যবোধ, কৃষকের জীবন, ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার, তৌহিদের বাণী ও সংস্কারকে সাহিত্যে রূপ দেওয়াও বর্তমানে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেননা, সাহিত্যের চারণভূমি বাস্তব সমাজে এবং বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি বাংলাভাষী বাঙালি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সমাজ।

বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের আগমন খুব বেশি আগে হয়নি। পঞ্চাশ বছর আগেরকার সময়েও শিক্ষিত শ্রেণির সংস্কৃতিচর্চার ভাষা ছিল ফার্সি ও উর্দু।[৩৬] আর আধুনিক বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচর্চায় ঐতিহ্যের অভাব রয়েছে এবং সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাও নেই। এই ধারাক্রম শুরু হয়েছিল মধ্যযুগে। সে-সময় মুসলমানরা সাহিত্যচর্চায় আত্মশক্তি খুঁজে পাননি এবং নতুন সংস্কৃতি সম্পর্কে সার্বিকভাবে সুষ্ঠু চেতনাও তাদের মনে তখন জাগেনি। মধ্যযুগে মুসলমান রচিত কাব্যসমূহে যে মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে 'বিশুদ্ধ' ইসলামি ভাবের ঘনিষ্ঠতা কম ছিল—এ-সাহিত্যের আখ্যান, প্রকাশভঙ্গি ও ভাবসম্পদ বাঙালি, হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ভাবসমৃদ্ধ মধ্যযুগের বাংলা কাব্য থেকে ভিন্ন নয়।[৩৭]

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের আবির্ভাবকে আকস্মিক বলে মনে করেন। এই আকস্মিকতার পেছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈপ্লবিক শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল।[৩৮] রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণেই বাঙালি মুসলমান আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হয়েছিল। ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক আধিপত্যের সময়ে মুসলমান শাসক শ্রেণির সংস্কৃতি ছিল 'নাগরিক'। আর এই 'নাগরিক' সংস্কৃতি ফার্সি ও উর্দু ভাষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, মুঘল শাসনামলের পর থেকেই বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এরপর পলাশির প্রান্তরে বাংলার সংস্কৃতির ধারা রুদ্ধ হয়ে পড়ে।[৩৯]

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে বাঙালি মুসলমানের জীবনে নানান রকম দুর্যোগ নেমে আসে। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লাখ টাকা

রাজস্বদানের প্রতিশ্রুতিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা গ্রহণ করে।[৪০] কিন্তু রাজস্ব আদায়ের নামে চলে অবাধ লুটপাট এবং এই লুটপাটের চরম পরিণতি ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর। এই মন্বন্তরের কারণে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। এর ফলস্বরূপ ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আইন চালু করা হয়। এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার ব্যাপক রদ-বদল ঘটে। ভূমিনির্ভর মুসলিম সমাজের সর্বনাশের আরেকটি কারণ হচ্ছে ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে 'লাখেরাজ সম্পত্তি'র[৪১] বা Resumption procedings বাজেয়াপ্তকরণ। এভাবে বাঙালি মুসলমানের জীবনে ইংরেজ শাসনের ধাক্কা তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।[৪২] এরপর 'সিপাহী বিদ্রোহে'র (১৮৫৭) আঘাত বাংলার মুসলমানকে অধঃপতনের স্তরে নিয়ে যায়। এর দুটো উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। প্রথমত, গ্রামীণ জীবনধারার সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভ ঘটে; দ্বিতীয়ত, বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় ফার্সি ভাষার প্রভাব কমে যায়। ফলে, উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে মুসলমান সংস্কৃতির বাঙালি হওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এর পরিণতি হিসেবে উর্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে বাংলা সাহিত্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[৪৩]

বাঙালি মুসলমানের বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে যে বিলম্ব দেখা যায় তার আরও একটা উল্লেখযোগ্য কারণ আছে—বাঙালি হিন্দুর তুলনায় এ-সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ দেরিতে হয়েছে। অবশ্য, এর পেছনে অর্থনৈতিক আনুকূল্যের বিষয়টি জড়িত ছিল। ভারতে মুসলিম শাসন থেকে ব্রিটিশ শাসন—দুই যুগেই হিন্দুর আর্থিক স্থায়িত্ব অক্ষত ছিল। কিন্তু মুসলমানের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বাঙালি মুসলমান ব্রিটিশ শাসনের (শুরুর দিকে) প্রায় একশত বছর আর্থিক আনুকূল্য পায়নি। ফলে, বাঙালি মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশও দেরিতে হয়েছে। তাছাড়া, হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি গঠন যত সহজ হয়েছিল, মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণি তত সহজে গড়ে ওঠেনি।[৪৪] প্রাবন্ধিক বাঙালি মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ বিলম্বিত হওয়ার জন্যে এ-সমাজের পরিবর্তনবিমুখ মনোভাবকেও দায়ী করেছেন।[৪৫] তবে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাঙালি হিন্দু ব্রিটিশ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা যতটা পেয়েছে বাঙালি মুসলমান ততটা পায়নি।

উনিশ শতকের শেষদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মসচেতনতা জাগ্রত হয়। নবজাগ্রত এক মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে অনিবার্যভাবে জন্ম নেয় আত্মপরিচয়-জিজ্ঞাসা—তার সঙ্গে বিভিন্ন মানসিক জটিলতাও বাঙালি মুসলমানকে আক্রান্ত করে। হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক ভিন্নতারও সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার সৌজন্যে দুই সমাজের এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে টানাপোড়েন শুরু হলে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে যে সংযোগ শুরু হয়েছিল মুসলিম শাসনামলে, ব্রিটিশদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ আমলে বাঙালি মুসলমানের অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, এ-সমাজ ব্রিটিশ শাসনের রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির মধ্যেও পড়েছে। এ-কারণে, 'ইংরেজ বিভেদনীতি'কে বাঙালি মুসলমান সমাজের স্বাভাবিক বিকাশ না-হওয়ারও একটা

অন্তরায় হিসেবে গণ্য করা হয়। আর 'বিভেদনীতি'র মধ্যে সে-সমাজের বিকাশ যে 'সমন্বয়ী' হবে না তা স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।[৪৬] যাহোক, রাজনৈতিক প্রভাবের ('ইংরেজ বিভেদনীতি') কারণেই বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের যে পরিচয় হয়েছিল তার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে।

মুসলমানের সাহিত্যচর্চাকে অনেকে 'ইসলামীয়তা'র নামে অভিহিত করতে চান। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ এর বিরোধিতা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান রচিত সাহিত্যে 'ইসলামি ভাব' বা 'ইসলামীয়তা' আছে কিনা তা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া, সাহিত্যে 'ইসলামীয়তা' বলতে কী বোঝায় বা ইসলামি সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায় তা জানা আবশ্যক। 'ইসলামীয়তা' বলতে যদি এ-ধর্মের চেতনাগত ও আদর্শগত দিক বোঝানো হয়, যেমন— 'একেশ্বরবাদ, সাম্য ও আন্তর্জাতিকতা, আত্মপ্রত্যয়, বিশ্বাস ও কর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগ, আশাবাদী সাংসারিকতার মধ্যে আত্মোপলব্ধি এ সব তত্ত্ব মোটেই জটিল নয় এবং সাহিত্যে রূপ পাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ বা বিরোধও নেই।'[৪৭] তাছাড়া, সংস্কৃতি জাতিগত ও দেশগত। বাঙালি মুসলমানের একেশ্বরবাদ, সাম্য ও আন্তর্জাতিকতা, আত্মপ্রত্যয়, বিশ্বাস ও কর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগ একটি সুস্পষ্ট একতা দান করেছে। কিন্তু এই ধর্মীয় মূলতত্ত্বগুলোই ভারতের চিন্তাধারার মূলে প্রোথিত। কেননা, ভারতের সংস্কৃতি বলতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মানুপ্রাণিত উপাদানেরই সমষ্টি।[৪৮] তাই, বাঙালি মুসলমান তার সাহিত্যিক ঐতিহ্য (ভারতীয় ও বাঙালি) থেকেই ধর্মীয় অনুভূতি বা তত্ত্বকে সাহিত্যে তুলে ধরেছে। এটাও মনে রাখতে হবে, বাঙালি মুসলমানের মনের বিরহী চেতনাও বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে এসেছে, ইসলামি ভাব থেকে নয়।[৪৯]

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের পিছিয়ে থাকার যেসব কারণ চিহ্নিত করেছেন (মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা, ব্রিটিশ শাসনের ভেদনীতি, মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশে বিলম্ব হওয়া প্রভৃতি) তার বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় রয়েছে। প্রাবন্ধিক ও চিন্তক কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'বাঙ্গালী-মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা' প্রবন্ধে মুসলমান সমাজে সাহিত্যের বিকাশের পথে বেশকিছু বাধাকে চিহ্নিত করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি মুসলমান সমাজের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। কাজী আবদুল ওদুদ মনে করেন, বাঙালি মুসলমানের জীবনায়োজনে মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে। জীবনকে যাপনের ক্ষেত্রে সে একটা নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং এটা তার চিন্তাভাবনাকেও সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। কারণ, বাইরে থেকে বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দিলে তা ব্যক্তির চিত্তের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। এ-কারণে তিনি সাহিত্যচর্চা ও বিকাশের জন্যে বাঙালি মুসলমান সমাজে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বাংলার মুসলমান সমাজের অন্তরে গূঢ় জীবনরসের সঞ্চার করা জরুরি—এটি তার ভেতরেই সঞ্চিত আছে। কেবল প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ বিকাশের। সর্বোপরি, সাহিত্যের বিকাশের জন্যে 'সুব্যবস্থিত সমাজ-জীবনের, জীবনের বহু ভঙ্গিমতাকে যথেষ্ট যত্ন ও শ্রদ্ধা নিয়ে লালন করবার' প্রয়োজন রয়েছে।[৫০] মূলত, বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা

নিরূপণে হবিবুল্লাহ ও ওদুদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য লক্ষণীয়—হবিবুল্লাহ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সমস্যাকে দেখেছেন; আর ওদুদ বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যেই এই সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন।

যাহোক, বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যে পিছিয়ে থাকার মূল কারণ হচ্ছে—সে সমাজ এখনও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠেনি। যখন বাঙালি মুসলমান সমাজে সমষ্টিগত চেতনার প্রকাশ হবে, তখন সাহিত্যেও তার প্রতিফলন লক্ষণীয় হবে। আর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নির্মাণের তাগিদেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তার জোরালো ভূমিকা পালন করার প্রয়োজন রয়েছে।

২.৪ বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ

'সংস্কৃতি' একটি বিশদ ধারণার নাম। যেকোনো জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে সেই জাতির ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সমাজব্যবস্থা, খাদ্যাভাস, চিন্তাপ্রণালি, জীবনাভ্যাস ও জীবনানুশীলন জড়িত। বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ও এসবের মধ্যেই নিহিত। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ তাঁর 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' নামক প্রবন্ধে মোট তিনটি পর্বে বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে সংস্কৃতি কী এবং কীভাবে নির্মিত হয় সে সম্পর্কিত ধারণা; ভাষা ও ধর্মীয় অবস্থান বিবেচনায় বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ এবং বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় কী হবে তার আলোচনাও প্রথম পর্বে করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে বাঙালি মুসলমান বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা যে অমূলক সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষ পর্বে বাঙালি সংস্কৃতিকে কীভাবে সমৃদ্ধ করা যায় তার উপায়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং বাঙালি মুসলমানের নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্য সকলের আগে নিজেদের কর্তব্য যে বেশি সে সম্পর্কেও যৌক্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নির্মাণের তাগিদেই তার সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। বাঙালি মুসলমান যে সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করছে এবং বর্তমানে যে-সংস্কৃতিতে অবগাহন করছে, এ-দুই সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় না-হলে তার জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে ফুটে উঠবে না। সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান যদি প্রতিবেশী হিন্দুর সঙ্গে সমতাবিধান না-করতে পারে তবে সে মানসিক হীনাবস্থার (Inferiority Complex) মধ্যে পড়বে এবং তার আত্মপরিচয়ের সংকট আরও ঘনীভূত হবে। এ-বিষয়টি প্রধানত বিবেচনায় রেখে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ বোঝা ও তার ভিত্তি দৃঢ় করার জন্যে 'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ'কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' বলতে সাধারণত নিজের সংস্কৃতির ওপর (যে সংস্কৃতিতে কোনো জাতি অবগাহন করছে) যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টির ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ, নিজের সংস্কৃতিতে 'অপর' হয়ে না-থেকে 'আত্ম' হওয়া। বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি হচ্ছে 'বাঙালি সংস্কৃতি'। এ-সংস্কৃতিতে বাঙালি হিন্দুর দান বেশি বলে তাকে হিন্দু প্রভাবিত বলে মনে করা হয়।[৫১] কারণ,

বাঙালি মুসলমান জীবনের পরিচয় এ-সংস্কৃতিতে তেমন পাওয়া যায় না। এ-জন্যে, বাঙালি মুসলমানের নিজের জীবনের আচার, ধর্মীয় ঐতিহ্য তথা ইসলামি ভাবধারা ও তার সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয় 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে সংযোজন করার প্রয়োজন রয়েছে। বাঙালি মুসলমানের সংযোজিত সংস্কৃতির চর্চা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে তখনই কেবল সে 'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণে'র দাবি করতে পারবে। বাঙালি মুসলমানের এই 'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণে'র সার্থকতা কোথায়? এর জবাবে হবিবুল্লাহ বলেছেন—'রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠাই তো চরম উদ্দেশ্য নয়—সমগ্র ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনকে প্রয়োজন মতো সংস্কৃত ও উন্নত করার উপায় মাত্র এবং যাকে সংস্কৃতি বলি তার সুষ্ঠু বিকাশই এ আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র সার্থকতা'।[৫২] আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের এই 'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে-বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনায় অন্যান্য বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে হাজির হয়েছে।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ তাঁর 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' নামক প্রবন্ধের প্রথম পর্বে 'সাংস্কৃতিক সমজাতিত্ব' নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে 'সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য' কী এবং বাংলার সাংস্কৃতিক সমজাতিত্ব কীভাবে নির্মিত হয়েছে তার স্বরূপ পর্যালোচনা করেছেন। কোনো দেশের বা সমাজের 'সাংস্কৃতিক সমাজীয়তা' তিনটি বিষয় দিয়ে নির্দিষ্ট হয়—ভাষা, ঐতিহাসিক ট্র্যাডিশন ও ধর্ম। এ-তিনটির মধ্যে ভাষাই প্রধান অনুষঙ্গ। এর বাইরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে—জাতিগত উৎপত্তি। 'জাতিগত উৎপত্তি' বা এর প্রভাবকে উল্লিখিত তিনটির কোনোটিই মুছতে পারে না। ধর্মকে বাদ দিয়েও ভাষা ও জাতিগত সম্বন্ধ (Racial Kinship) অনুসারে বাংলার 'সাংস্কৃতিক সমজাতিত্ব' (Homogeniety)-এর ব্যাপারে একমত হওয়া যায়।[৫৩] বাঙালি জাতির দুটি প্রধান উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে হিন্দু ও মুসলিম জাতি এবং ভাষার ক্ষেত্রে উল্লেখ্য পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা। প্রাবন্ধিক ভাষা ও জাতিগত সম্বন্ধ অনুসারে 'বাংলার সমজাতিত্ব' বিচার করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—'[...] যাঁরা বাঙালী মুসলমানের রক্তে তুর্কী-ইরানী প্রাধান্য দেখবার পক্ষপাতী তাঁরা অংশ দিয়ে সমগ্রের বিচার করেন।'[৫৪] বাংলায় মুসলমানদের শাসনামল মুঘল শাসনের বহু পূর্বে শুরু হয়েছে। বাংলায় অনেক আগে থেকেই নানানভাষী সুফি প্রচারকরা এ-অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলেছেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসও তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।[৫৫]

বাংলার ইতিহাসে মুসলমানদের প্রভাবকে কখনোই অগ্রাহ্য করা যায় না। বাংলার ইতিহাসে 'মুসলমানি আমল'কে যারা দেশীয় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এক অধ্যায় মনে করেন না, তারা এ-অঞ্চলে ইসলামের প্রভাবকে বহির্বঙ্গীয় বলে মনে করেন।[৫৬] অথচ, ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে ইসলাম ভারতে তথা বাংলায় এসেছে। ভারতে ইসলাম কী ভূমিকা পালন করেছিল তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে। এ-ক্ষেত্রে ভারতে ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়নে মানবেন্দ্র নাথ রায়ের (১৮৮৭-১৯৫৪) বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, ইসলাম এক নতুন জীবনদর্শন নিয়ে পৃথিবীতে হাজির হয়েছিল। ইসলামের উত্থান ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে

বিস্তারলাভের ঘটনা মানব ইতিহাসেরই এক চমকপ্রদ অধ্যায়। ইসলামের লক্ষ্য কেবল সামরিক বিজয় নয়, বরং বিজিত রাজ্যের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আমূল পরিবর্তনকে ইসলাম গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। এটা ঠিক যে, মুসলমানরা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সামরিক বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছে; তবে তা পুরাতনকে সরিয়ে নতুন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে। তাই বলা যায়, ধর্মীয় আন্দোলনের চেয়ে বরং রাজনৈতিক আন্দোলনরূপেই ইসলামের উত্থান হয়েছিল। এশিয়া ও আফ্রিকার প্রদেশগুলোতে পুরাতন ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে বাঁচতে ইসলামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের (একেশ্বরবাদ) কাছে আশ্রয় চেয়েছিল।[৫৭] তাই বলা যায়, ইসলামের মূল চেতনা আরব ইতিহাসের ক্রম ধারায় বিকশিত হয়েছে, হঠাৎ করে নয়।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ মনে করেন, বাঙালির ইতিহাসে পরস্পরবিরোধী ঝোঁক (Emphasis) ও দ্বিধাগ্রস্ত ঐতিহ্য সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে—বাংলার ইতিহাসে 'মুসলমানি আমল'কে স্বীয় ইতিহাসের একীভূত (Integral) মনে না-করা। হিন্দুর লিখিত ইতিহাসে মুসলমান 'অপর' হয়ে থাকার কারণেই এখনো বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি। তিনি এর দৃষ্টান্ত হিসেবে বলেছেন, বাঙালির সামাজিক ইতিহাস হিন্দুদের হাতে লিখিত হওয়ার দরুন তারা সচেতনভাবে হিন্দু ব্রাহ্মণ, বীর রাজীবলোচন তথা কালাপাহাড়কে শুধু ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে নৃশংস, কাপুরুষ হিসেবে উল্লেখ করেছে। কিন্তু নৃশংসতায় যিনি তুলনাহীন সেই প্রতাপাদিত্যকে বাঙালির বীরত্বের ও স্বাধীনতার আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৫৮] ফলে, হিন্দুর লিখিত ইতিহাস ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে এবং এটি বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈষম্যকেও প্রতিফলিত করেছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের কারণে বাংলার ইতিহাস লেখকেরা 'খণ্ডিত ইতিহাস'কে 'মূল ইতিহাস' হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বাঙালি সংস্কৃতির সমতাবিধান না-হওয়ার কারণ হিসেবেও এই 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির একদেশদর্শিতা'কে দায়ী করা যায়।[৫৯]

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম উভয় জাতিকে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাসকে সমন্বিত অবস্থানে রেখে এগিয়ে যেতে আহ্বান করেছেন। কোনো একটিকে মুখ্য ও অন্যটিকে গৌণ মনে করার অবকাশ এখানে নেই। উভয় ধর্মেরই অন্ধকার ও গৌরবময় ইতিহাস বিদ্যমান আছে। তবুও এক্ষেত্রে সংকীর্ণতার প্রশ্নও উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজেদের ইতিহাস, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করে বাইরের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করাও নেতিবাচক ফল বয়ে আনবে। তাই বাঙালিকে আত্মসংকীর্ণতা পরিহার করে ইতিহাস ও সংস্কৃতিচর্চায় আত্মসচেতন হয়ে উঠতে হবে। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের অনুধাবন করা উচিত—আত্মসচেতনতা ও সংকীর্ণতা এক বিষয় নয়। 'প্রাদেশিক মনোবৃত্তি' অর্জন মানেও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নয়। এই বৈশিষ্ট্য আত্মীকরণের মধ্য দিয়েই বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[৬০]

'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাংলার মুসলমান সমাজের 'সংস্কৃতির অবিভাজ্যতা'র ধারণাকে যৌক্তিক বিশ্লেষণে খণ্ডন

করেছেন। অনেকের মতে, বাংলার মুসলমান সমাজে সংস্কৃতির অবিভাজ্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ, মুসলমান সমাজের মতো তাদের সংস্কৃতির মধ্যেও সাযুজ্য লক্ষণীয়।[৬১] সংস্কৃতির এই অবিভাজ্যতার জন্যেই বাঙালি মুসলমান ব্যবহারিক জীবনে 'প্রাদেশিক মনোবৃত্তি'কে প্রাধান্য দিতে পারে না, যেমনটা বাঙালি হিন্দু পারে। এ-কারণে, বাঙালি হিন্দুর সামাজিক আচার, পোশাক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে বহির্বঙ্গীয় রীতির সঙ্গে অমিল লক্ষ করা যায়। লেখক মনে করেন, বাংলার মুসলমানের 'বাঙালি' হওয়ার অন্তরায় হচ্ছে—বিশ্ব মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। সেই সঙ্গে বাংলার মুসলমানের 'বাঙালিত্ব' প্রতিষ্ঠায় 'ইসলামের বিশ্বময়তা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের বিরোধী বলে আপত্তি উঠতে পারে।'[৬২] বাঙালি মুসলমানের এই আশঙ্কা যে অমূলক হবিবুল্লাহ তা যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, যে 'মুসলিম সংস্কৃতি' থেকে বাঙালি মুসলমান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তার স্বরূপ জানা প্রয়োজন। ইসলাম ধর্মের একটি বিশ্বজনীন রূপ রয়েছে। দেশভেদে, রাষ্ট্রভেদে, সমাজভেদে ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও নানান বৈচিত্র্য বিদ্যমান রয়েছে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে তাকেই বলা হয় মুসলিম সংস্কৃতি।[৬৩] দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতি পালনে রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকার কথাও বিবেচ্য—রাষ্ট্রশক্তির আনুকূল্যের জন্যেই কোনো একটা সংস্কৃতি সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তবে, রাষ্ট্রশক্তি নির্ভর সংস্কৃতি পালনের এই সাদৃশ্য কখনো জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর জয়ী হতে পারে না।[৬৪] দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আরবের সংস্কৃতি ইরানি সংস্কৃতির ওপর জয়ী হতে পারেনি।

মুসলমান প্রধান রাষ্ট্রগুলোতে হিন্দুদের জীবনপ্রণালিতে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি অমুসলিমদের প্রভাবে পরিবর্তন হয়েছে মুসলিমদের জীবনানুশীলন। উভয়ের ক্ষেত্রে উভয়ের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, সাহিত্য—সবক্ষেত্রে জাতীয় চেতনার প্রকাশ দেখা যায়। ফলে, বাঙালি মুসলমানরা যদি ভাবে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা করলে তারা ইসলামি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাহলে সেটা হবে অমূলক। কেননা মুসলিমদের জীবনাচারে বৈচিত্র্য থাকা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়।[৬৫]

'জাতিগত বৈশিষ্ট্যে'র বাইরে ভাষা অনুসারেও 'মুসলিম সংস্কৃতির অবিভাজ্যতা'র প্রমাণ হয় না। ইতিহাসের ভাষ্যমতে, আট শতক থেকে টাইগ্রিস নদীকে কেন্দ্র করে দুই তীরে আরবীয় সংস্কৃতি ও ইরানি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এই উভয় সংস্কৃতি ইসলামের অনুসারী হলেও দুইটাতেই ছিল ব্যাপক পার্থক্য। এর মধ্যে ভাষাগত পার্থক্যকে (আরবি ও ফার্সি) মুখ্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আরব থেকে নিয়ে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের যে সংস্কৃতি তা পুরোপুরিই আরবি ছিল।[৬৬] তবে, আরবের শাস্ত্রীয় ইসলামের ব্যাপক পরিবর্তনও হয় ইরানিদের হাতে—যার আধিপত্য ভারতীয় মুসলমানদের ওপরেও বিরাজ করছে। কারণ, ভারতীয় মুসলিম সভ্যতায় ইরানি সংস্কৃতির 'মুসলমানি রূপ'ই প্রাধান্য পেয়েছে।[৬৭] এছাড়াও প্রাক্ ইসলামি ভারতের মুসলমানরা বিনাদ্বিধায় আরবীয় সংস্কৃতির বাইরেও অনেক কিছুকেই অনুসরণ করেছে, অনুকরণও করেছে। ফলে, বাঙালি সংস্কৃতির চর্চায় 'মুসলমানিত্ব' খর্ব হওয়ার শঙ্কার জায়গাটি অমূলক ও অযৌক্তিক বলে ধরে নেয়া

যায়। কারণ, ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলি বজায় রেখে এর সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির সমন্বয় বাঙালি সংস্কৃতিতে কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি করে না।[৬৮] তাই, বাঙালি মুসলমান যদি বাঙালি সংস্কৃতিচর্চায় কোনো উদ্বেগ বা আশঙ্কা না-রেখে এ-সংস্কৃতিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে তাহলে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকেই সুগম করবে।

'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' প্রবন্ধের তৃতীয় পর্বে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায়গুলো (বিশেষত, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে) নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি বাঙালি সংস্কৃতিতে 'ইসলামি ভাবে'র যৌক্তিক সংযোজন বা অভিযোজনের উপায়সমূহ বাতলে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতিকে কীভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া যায় তার আলোচনাও করেছেন।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ মনে করেন, মুসলমানের অংশগ্রহণ নেই বলে বাঙালি সংস্কৃতি পুরোপুরি 'বাঙালি' হয়ে ওঠেনি। এ-সংস্কৃতিতে বাঙালি মুসলমানের অনুপ্রবেশ এখনও সেভাবে ঘটেনি। তাই একে আদর্শ সংস্কৃতিও বলা যায় না।[৬৯] বর্তমানে বাঙালি যে সংস্কৃতি চর্চা করে তা মূলত হিন্দু প্রভাবিত। তাই, একে পুরোপুরি 'বাঙালি সংস্কৃতি' হয়ে উঠতে হলে বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোকে বর্জন না-করে বরং গ্রহণের দিকেই মনোনিবেশ করতে হবে। বিশেষত, বাঙালি সংস্কৃতির পূর্ণ রূপ পাওয়ার জন্যে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও তার জীবনধারাকে 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।[৭০] প্রসঙ্গত বলা দরকার, প্রাবন্ধিক বাঙালি সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য সকলের চেয়ে বাঙালি মুসলমানেরই কর্তব্য বেশি বলে মনে করেন। বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দুর দানে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি বাঙালি মুসলমানের দান পেলেই তা পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। অর্থাৎ, বাঙালি সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়ার উপায় হচ্ছে—এ-সংস্কৃতিতে হিন্দুর দান স্বীকার করা এবং মুসলিম জীবনের উপাদানসমূহ যুক্ত করা। এ-ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান লেখকদের দায়িত্ব হচ্ছে, সাহিত্যে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করা এবং মুসলিম জীবনের উপাদানসমূহকে বাংলা সাহিত্যে সার্থকভাবে উপস্থাপন করা। আর বাঙালি মুসলমানকেও তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মননে-মগজে এভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হতে হবে, সংকীর্ণতা ও শঙ্কা পরিহার করতে হবে—'সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই মুসলমানকে নিজের ট্র্যাডিশন ও আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং সে ট্র্যাডিশিনের আবিষ্কারক ও প্রচারক হতে হবে তার নিজেকেই।'[৭১] বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের এটাই বড় উপায়। তাছাড়া এর মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান তার আত্মপরিচয়ের সংকট থেকেও মুক্তি পাবে—এমনটা আশা করা যায়। কারণ, বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ শুধু রাজনৈতিক বিকাশের মধ্যে নিহিত নয়, বরং ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনকে উন্নত করার মধ্যেই তাদের সুষ্ঠু সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে। আর সে-জন্যে বাঙালি মুসলমানের 'সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণে'র গুরুত্ব সর্বাগ্রে। সেটা কীভাবে করা যায় তাই মূলত আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর আলোচনার মূল বিষয়।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ বোঝার ক্ষেত্রে এ-জনগোষ্ঠীর (বাংলার হিন্দু ও মুসলমান) ইতিহাসকে ভালো করে জানার প্রয়োজন বলে মনে করেন। তিনি

আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে বাঙালি মুসলমানের জাতিগত পরিচয়, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, বাঙালি মুসলমান সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে তার আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। এ-জন্যে তিনি মুসলিম জীবনের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবনাদর্শ ও মুসলিম সংস্কৃতিকে 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে সংযোজনের ওপর জোর দিয়েছেন।

৩. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরির পরিপ্রেক্ষিত বোঝার জন্যে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসের বাক্-পরিবর্তনসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ জানার জন্যে এ-জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি নির্মাণে তিনি জাতিগত পরিচয়, ভাষাগত পরিচয় ও সাহিত্যে তার সংস্কৃতির (মুসলিম সংস্কৃতি) যথার্থ প্রতিফলনের ওপর দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি মুসলিম সংস্কৃতিকে প্রভাবশালী হিসেবে নির্মাণ করাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। অতীতের মোহ নয়, অন্ধ আবেগ নয়, পরিচয়হীনতার সংকোচও নয়, বরং তিনি যৌক্তিকভাবে বাঙালি মুসলমান জাতিগত পরিচয়ে যে 'বাঙালি' তা বলেছেন। এ-কারণে, বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতিও 'বাঙালি সংস্কৃতি'। এ-সংস্কৃতিতে 'অপর' হয়ে থাকা এক অর্থে আত্মপরিচয়হীনতারই নামান্তর। তাই, তিনি বাঙালি সংস্কৃতিতে কীভাবে মুসলিম জীবনের জীবনাদর্শ সংযোজন করা যায় তার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, আত্মপরিচয়ের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে নিজের ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সক্রিয় থাকা। তিনি মনে করেন, বাঙালি মুসলমান যেদিন তার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সাহিত্যে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারবে এবং 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে সক্রিয় ও প্রভাবশালী ভূমিকায় হাজির হবে, সেদিন তার আত্মপরিচয়ের সংকটও অনেকখানি দূর হবে। যাহোক, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলি বিশ্লেষণ ও আলোচনার শেষান্তে বেশকিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়। নিম্নে তাঁর বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সম্পর্কিত চিন্তার ফলাফল পেশ করা হলো।

প্রথমত, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সংকটের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 'বাংলার মুসলমান' নামক প্রবন্ধে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট যে দীর্ঘ সময়ে ও নানান ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে তা তুলে ধরেছেন। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় সংকটের প্রেক্ষাপট বোঝার জন্যে এ-অঞ্চলের (বাংলা) ইতিহাসের ঘটনাবলিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি 'বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়' সন্ধানে ছিলেন ইতিহাসমুখী। তাঁর ইতিহাসচর্চার বিশাল অংশজুড়ে ছিল ভারতীয় ও বাংলার মুসলিম-মানসের স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং মুসলিম মানসের বিবর্তন ধারার উৎসকে খতিয়ে দেখা। অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের

ভেতর দিয়ে বাংলার সমাজ ও সভ্যতায় মুসলিম-মানসের অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।[৭২]

দ্বিতীয়ত, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়-সংকটের মূল জায়গাসমূহ চিহ্নিত করেছেন ('বাংলার মুসলমান' ও 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস' প্রবন্ধ)। যেমন—মুঘল শাসনামলেই বাংলার মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে এবং বাংলায় জাতিভেদ সৃষ্টিতেও মুঘল শাসকদের দায় রয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি ইংরেজ বিভেদনীতিও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরিতে সহায়তা করেছে বলে মনে করেন। আরও একটা বিষয়কে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে—বাঙালি মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশে বিলম্ব হওয়া; এর জন্যে তিনি মুসলমান সমাজের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের অসহযোগিতামূলক আচরণকে দায়ী করেছেন। প্রধানত, এসব বিষয় বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকটকে সামনে নিয়ে আসে।

তৃতীয়ত, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ কেবল বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকটকে চিহ্নিতই করেননি, বরং এ-সংকট থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ নিয়েও যৌক্তিক আলোচনা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে 'বাংলার মুসলমান', 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস', 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ' ও 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ' প্রবন্ধসমূহকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি আত্মপরিচয় নির্মাণে ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, তিনি মনে করেন, বাংলায় মুসলমান শাসনামলের ইতিহাস খুব অবহেলিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাঙালি মুসলমানের ইতিহাসচর্চায় সচেতনতা, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জীবনের যথার্থ প্রতিফলন এবং 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে মুসলিম জীবনের উপকরণসমূহ যুক্ত করা—এর মধ্য দিয়েই তার আত্মপরিচয় নির্মিত হতে পারে। এর বাইরে তিনি বাঙালি মুসলমানের জাতিগত ও ভাষাগত পরিচয়কেও গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই সঙ্গে গুরুত্ব দিয়েছেন বাঙালি মুসলমানের সামাজিক বিকাশের ধারাকে। যাহোক, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে—বাঙালি মুসলমান আগে বাঙালি, তারপর মুসলমান। তবে সব কিছুর ঊর্ধ্বে সে আগে মানুষ বলেই বুদ্ধিমত্তা, জীবনবোধ (ধর্ম) তার অবিচ্ছেদ্য গুণ। তাই সে একই সঙ্গে মানুষ, বাঙালি ও মুসলমান। তিনি বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষাকে গ্রহণের কথা বলেছেন এবং 'বাঙালি সংস্কৃতি'তে মুসলিম জীবনাদর্শ যোগ করে একে পরিপূর্ণ করে তোলার কথাও বলেছেন।

চতুর্থত, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ অন্বেষণের ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র (১৯২৬) চিন্তকদেরই উত্তরসাধক। বর্তমান সময়েও তাঁর চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা আছে। কারণ, বাঙালি মুসলমানকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার আছে যে তার জাতিগত পরিচয় 'বাঙালি' এবং ধর্মীয় পরিচয় 'মুসলমান'। আর ধর্মীয় পরিচয় কখনও জাতিগত পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠতে পারে না। এই দুই পরিচয়ের মধ্যে দ্বান্দ্বিক অবস্থা সৃষ্টিরও সুযোগ নেই। যাহোক, বাঙালি মুসলমানের 'আত্মপরিচয়' সংক্রান্ত ভাবনায় লেখকের গভীর জীবনদৃষ্টির পরিচয়ও প্রতিফলিত হয়েছে। এ-কারণে, 'বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়' তথা

স্বতন্ত্র সত্তার অনুসন্ধানে আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর গবেষণালব্ধ উপলব্ধিকে বাঙালি মুসলমান সমাজের আলোকবর্তিকা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ মমতাজুর রহমান তরফদার, 'অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ', *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ*, সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য [সম্পা.], (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১), পৃ. ১৮

২ নূরুল ইসলাম মনজুর, 'মধ্যযুগের বাংলা ও ভারতীয় ইতিহাসের মূলসূত্র অন্বেষণ: আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ', *বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা* (ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০১৭), পৃ. ৩৩০

৩ রতনলাল চক্রবর্তী, *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯), পৃ. ২৮

৪ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাংলার মুসলমান', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১৩৫

৫ আমিনুল ইসলাম, 'বাংলায় মুসলমানের আগমন', *হাজার বছরের বাংলার মুসলমান* (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০২৪), পৃ. ৯

৬ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাংলার মুসলমান', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

৭ তদেব, পৃ. ১৩৭

৮ তদেব

৯ তদেব, পৃ. ১৪০

১০ তদেব

১১ তদেব, পৃ. ১৪২

১২ কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার মুসলমানের কথা', *শাশ্বত বঙ্গ* (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ১১৮

১৩ Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760* (Berkley, Los Angeles and London: University of California Press, 1993), P. 114, 115

১৪ উদ্ধৃত: ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৩), পৃ. ৪; [মূল: Khondker Fuzli Rubbee, *The Origin of the Musalmans of Bengal*, Calcutta, 1895]

১৫ এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২২), পৃ. ৪৮

১৬ Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1983), pp. 207, 208

১৭ আকবর আলি খান, *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা*, আমিনুল ইসলাম ভূইয়া [অনু.], (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২২), পৃ. ৯৯

১৮ গৌতম রায়, 'বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়', *বাঙালি ও বাংলাদেশের মন* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০২৪), পৃ. ১৬

১৯ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাংলার মুসলমান', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

২০ তদেব, পৃ. ১৪৪

২১ তদেব

২২ তদেব, পৃ. ১৪৫

২৩ তদেব

২৪ তদেব

২৫ তদেব

২৬ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১৬৩
২৭ তদেব
২৮ তদেব
২৯ তদেব, পৃ. ১৬৩, ১৬৪
৩০ আবদুল হক, 'বাঙালী মুসলমান: ভূমিকা ও নিয়তি', *বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, গোলাম মুস্তাফা [সম্পা.], (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭), পৃ. ১৫
৩১ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪
৩২ তদেব
৩৩ তদেব
৩৪ তদেব, পৃ. ১৬৬
৩৫ তদেব
৩৬ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১৪৬
৩৭ তদেব
৩৮ তদেব, পৃ. ১৪৭
৩৯ তদেব
৪০ এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১৯), পৃ. ২১
৪১ 'লাখেরাজ' আরবি শব্দ। এর অর্থ নিষ্কর। মুঘল শাসনামলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল 'লাখেরাজ' ভূমি কর বা খাজনা মওকুফকৃত জমি। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের আমিনি কমিশনের মতে, সম্রাজ্যের রাজস্ব ভূমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন শ্রেণির লাখেরাজদের অনুকূলে পতিত হয়েছিল। তখন সরকারি দলিলে এসব ভূমিকে বলা হত বাজে ভূমি তথা যেসব ভূমি বা জলাশয় থেকে সরকার কোনো রাজস্ব পায় না। দেখুন: Ram Sharan Sharma, *Land Revenue in India: Historical Studies* (Motomahal Banarsidas, Delhi, 1971), p. 126
৪২ এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০
৪৩ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], পর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮
৪৪ তদেব, পৃ. ১৪৯
৪৫ তদেব
৪৬ তদেব
৪৭ তদেব, পৃ. ১৫২
৪৮ তদেব
৪৯ তদেব, পৃ. ১৫৩
৫০ কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা', *শিখা সমগ্র*, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম [সং. ও সম্পা.], (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৯), পৃ. ৪০
৫১ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১৫৯
৫২ তদেব, পৃ. ১৫৪
৫৩ তদেব
৫৪ তদেব, পৃ. ১৫৩, ১৫৪
৫৫ তদেব, পৃ. ১৫৫
৫৬ তদেব
৫৭ মানবেন্দ্র নাথ রায়, *ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা*, সৈয়দ তোশারফ আলী [অনু.], (ঢাকা: দ্যু প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ২৫

৫৮ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ', *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম [সম্পা.], পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫
৫৯ তদেব, পৃ. ১৫৬
৬০ তদেব, পৃ. ১৫৭
৬১ তদেব
৬২ তদেব, পৃ. ১৫৮
৬৩ তদেব
৬৪ তদেব
৬৫ তদেব
৬৬ তদেব, পৃ. ১৫৯
৬৭ তদেব
৬৮ তদেব
৬৯ তদেব
৭০ তদেব, পৃ. ১৫৯, ১৬০
৭১ তদেব, পৃ. ১৬২
৭২ নূরুল ইসলাম মনজুর, 'মধ্যযুগের বাংলা ও ভারতীয় ইতিহাসের মূলসূত্র অন্বেষণঃ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ', *বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.007

বাংলাদেশের ছোটগল্প : নারী মনস্তত্ত্বের স্বরূপ

রোজী আহমেদ*

সারসংক্ষেপ

অর্ধাংশ নারী অধ্যুষিত বাংলাদেশে নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবহেলিত, নির্যাতিত। সামাজিক-আর্থিক-পারিবারিক সকল ক্ষেত্রে তাদের বঞ্চনা সহ্য করতে হয়। বাংলাদেশের ছোটগল্পে বিশেষভাবে এইসকল অবদমিত নারীর মানসিক যন্ত্রণা, মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতার চিত্র দৃশ্যমান হয়। গল্পকাররা অনেক ছোটগল্পেই নারীর মনোযাতনা, মানসিক বৈকল্য কার্যকারণসহ গল্পগুলোতে স্পষ্ট করেছেন। শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭), শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮), মঞ্জু সরকারের (১৯৫৩) গল্পে নারীর মনোলোকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঈর্ষা-ঘৃণা, অতৃপ্তি-অবদমন প্রভৃতি উঠে এসেছে। স্বার্থপর, দুর্বল ব্যক্তিত্বের পুরুষের কাছ থেকে নারীর অমর্যাদা, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নারীর প্রতি আস্থা রাখতে না পারা, পরিবারের সদস্যদের নারীর প্রতি অবহেলা প্রভৃতি এসব লেখকের গল্পে দেখা যায়। আমরা এই প্রবন্ধটিতে কয়েকটি গল্পের আলোকে বাংলাদেশের নারীদের মানসিক জটিলতা ও মনোসমস্যার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

চাবি শব্দ : বাংলাদেশের ছোটগল্প, নারী, মানসিক টানাপড়েন, বৈষম্য, অস্তিত্বসংকট।

নারী পৃথিবীর সব জায়গায় অবদমন এর শিকার। নানামাত্রিক সামাজিক অবরোধ, সংস্কার ও শিক্ষার অভাবের কারণে যুগ-যুগ ধরে বাঙালি নারীসমাজ সন্তান জন্ম, তার লালনপালন, স্বামীসেবা ও গৃহকর্মের মধ্যেই আবদ্ধ। সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন, আর্থনীতিক ও রাষ্ট্র শাসনে নারীরা হয়েছে বৈষম্যের শিকার। ফলস্বরূপ সামাজিক অনেক সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহ, দাসপ্রথা, সতীত্বধারণা, পণপ্রথা– প্রভৃতি নারীর বিকাশকে করেছে সংকুচিত। ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের মনে হয়েছিল যে, সতীদাহ প্রথার আদর্শগত কারণ ছাড়াও মেয়েদের 'সতী' হওয়ার পেছনে একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে। তিনি মেয়েদের এই বাসনার পেছনে উত্তেজনা ও অভিযান প্রবৃত্তি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মতে, মেয়েরা স্বেচ্ছায় সহমরণকে বরণ করে নিত, সেটি এক ধরনের আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যার মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছার একজাতীয় নেতিবাচক প্রকাশ ঘটাত। জীবিত অবস্থায় তাদের ইচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। এই অবরুদ্ধ ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ ঘটতো তাদের আত্মহত্যার অধিকার ঘোষণার মধ্য দিয়ে।[১] নারী সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চলতে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনস্তাত্ত্বিক সংকটে নিমজ্জিত হয়। তবে নারীর একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

থেকে জগৎকে দেখা, জানা ও মৌলিকরূপে পাল্টানোর প্রয়াসে বিভিন্ন নারীবাদী ব্যক্তি ও সংগঠন তৈরি হয়েছে। বিশিষ্ট নারীবাদী জুডিথ ইভান্স এর মতে, 'Feminism is a protest against women's oppression, hence there is no confining its story, by country, culture or time.'[২] কার্ল মার্কস মনে করেন, শ্রেণিবিভাজনই লিঙ্গবৈষম্যের মূল কারণ। তিনি আরও মনে করেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ পাবে এবং শ্রেণিবৈষম্য কমে আসবে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মতে, যৌন পীড়নই প্রাচীনতম মৌলিক অসাম্য। S. Firestone-এর মতে, যৌন-শোষণের অবসান ঘটলেই নারীশোষণের অবসান ঘটবে। অর্থাৎ অর্থনীতি নয় Sexuality শোষণের ভিত্তি। ফায়ার স্টোন বলেন:

> Goal of feminist revolution must be not just the elimination of male privilege but the sex distinction itself: General difference between human beings would no longer matter culturally ... the tyranny of the biological family would be broken. And with it the psychology of power.[৩]

হুমায়ুন আজাদ তাঁর *নারী* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

> পিতৃতন্ত্র যত সংস্থা তৈরি করেছে; পরিবার, বিয়ে, সমাজ, ধর্ম, বিদ্যালয় সবই মর্মমূলে প্রতিক্রিয়াশীল, এগুলো অনেক শতকে প্রগতিশীল করা যায়নি, কেননা সমাজ, রাষ্ট্র যারা অধিকার করে আছে, তাদের জন্য প্রতিক্রিয়াশীলতাই আধিপত্য রক্ষার উপায়। কয়েক সহস্র বছর ধরে নারী ভবিষ্যৎহীন, বিশ শতকের শেষাংশেও নারী ভবিষ্যৎহীন। তার সামনে অনেক শতাব্দী, কিন্তু তার সামনে ভবিষ্যৎ নেই।[৪]

সিমোন দ্যা বেভোয়ারের মতে, নারী পুরুষের মধ্যে কোনো পারস্পরিকতা রক্ষা করা হয়নি, পুরুষ নারীকে করে তুলেছে চিরন্তন; 'অপর' তাকে করে তুলেছে কর্ম, কখনো কর্তা হয়ে উঠতে দেয়নি।[৫] অনেকে ভেবেছিলেন সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার ঘটলে নারীর প্রতি মানুষের মানসিক উদারতা ও চেতনার প্রসার ঘটবে। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটলেও লিঙ্গবৈষম্য দূর হয়নি। মূলত বৈষম্যের রূপ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু বৈষম্যের কাঠামো একই রয়ে গেছে। সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হলেও আসে কর্মস্থলে যৌনলাঞ্ছনা। অবহেলা, বৈষম্য, অবদমন নারীর জন্য সর্বদাই অপেক্ষারত। বাঙালি নারীদের মধ্যে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) বিবিধ অবদান সত্ত্বেও সবচেয়ে বড় পরিচয় নারী আন্দোলনের প্রেরণদাতা হিসেবে। তাঁর মতে, উড়তে শেখার আগেই পিঞ্জরাবদ্ধ এই নারীদের ডানা কেটে দেওয়া হয় এবং তারপর সামাজিক রীতি-নীতির আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয় তাঁদের।[৬] তাছাড়া এম. ফাতেমা খানম (১৮৯৪-১৯৫৭), নুরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৯৯৪-১৯৭৫), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), জোবেদা খানম (১৯২০-১৯৮৯), নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২) প্রমুখ নারীর মনন বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে গেছেন। বাংলাদেশের ছোটগল্পে নারীর জীবনের নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অধিকারহীনতা, অস্তিত্বসংকট দেখতে পাওয়া যায়; যা তাদের মনোজগতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন মনস্তত্ত্ববিদ, অস্তিত্ববাদী, সমাজতাত্ত্বিকদের মতামতের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ছোটগল্পে নারীদের মনোজটিলতার কারণ উদঘাটন করার চেষ্টাই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

সেলিনা হোসেনের 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পটিতে একজন নারীর প্রবল অস্তিত্বশালী হবার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে মতিজান স্বামী সংসারে আসলেও তার স্বামী মাতাল, জুয়ারি, পরনারীতে আসক্ত। আবুলের অকর্মণ্য স্বভাব এবং শাশুড়ির তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, শারীরিক, মানসিক নির্যাতন উদ্ভ্রান্ত করে দেয় তাকে। তার বিবশ অনুভব :

> খরদুপুরের রোদ মতিজানের মাথায় ঢুকতে থাকে – বিড়ির ধোঁয়ার ধোঁয়াটে হয়ে থাকা ঘরটা একটা রঙিন ফানুস হয়ে যায় – ক্রমাগত উড়ছে, উড়ছে। ছোঁয়ার সাধ্য ওর নেই। তখন দুপুরটা ওর ভেতরে শক্ত হয়ে জমতে থাকে। ও ভাবে আমি একটা শক্ত মেয়ে মানুষ হবো।[৭]

মতিজান উপলব্ধি করে, এই বাঁধনহীন সংসারে টিকে থাকতে হলে তাকে তার শাশুড়ির মতো হতে হবে। মতিজানের বাবা যৌতুক না দিতে পারার শাস্তি হিসেবে শাশুড়ি গুলনুর মতিজানকে মেরে, গলায় দড়ি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে; সারাদিন খেতে দেয় না, এতে মতিজান অনুভূতিশূন্য, বোধহীন হয়ে যায়। মতিজানকে তার শাশুড়ির দেখতে না-পারার পেছনে যে কারণগুলো বিদ্যমান ছিলো। তা হলো :

(ক) আবুল ছিলো গুলনুরের একমাত্র সন্তান যাকে মাত্র কয়েক মাসের রেখে তার স্বামী মারা যান। ফলে সন্তানের প্রতি মায়ের অস্বভাবী সংবন্ধন (fixation) গড়ে উঠেছে অবচেতনভাবেই। ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ অনুসারে একে জোকাস্টা গূঢ়ৈষা (Jocasta Complex) না বললেও, নারীর কর্তৃত্ববাদী সত্তা সব সময় সন্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে– মতিজানকে তার শাশুড়ি সহ্য করতে পারে না। তাই ছেলে আবুল বাড়িতে না আসলেই সে খুশি হয়। শাশুড়ি ও মতিজানের দ্বন্দ্বের কারণ অনেকটাই স্পষ্ট হয় নীরদচন্দ্র চৌধুরী 'বাঙালী থাকিব না মানুষ হইব'? শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন :

> ... শাশুড়ী ও বধূর এক সংসারে থাকা। ইহা কোন মতেই উচিত নয়। জৈব নিয়মে পুরুষমাত্রেই দুইটি নারীর সঙ্গে যুক্ত হয়। একটি নারীর দেহ হইতে তাহার জন্ম হয়, আর একটি নারীর দেহের সহিত সঙ্গত হইয়া সে জীবনের ধারাকে অব্যাহত রাখে। একজন অতীতমুখী ও অপরটি ভবিষ্যৎমুখী, দুইটি নারীকে একত্র থাকিতে দেওয়া প্রবৃত্তির নিয়ম বিরুদ্ধ। একজন না হয় আর একজন হইতে কষ্ট পাইবেই। মাতা যতই উদার হউন না কেন, তিনি কখনই তাহার দেহসম্ভূত পুত্রকে অন্য এক নারীর একান্ত অধিকারে ছাড়িয়া দিতে পারেন না।[৮]

(খ) মতিজানের বাবা আবুলকে যৌতুক হিসেবে যা দেবার– তা দিতে পারেনি। অনেক লোভী বাবা-মা ছেলেকে বিয়ে দিয়ে অর্থবিত্তের মালিক হবার সুপ্ত বাসনা মনে লালন করে। গুলনুরেরও তার অথর্ব ছেলেকে বিয়ে দিয়ে বিত্তবান হবার আশা সুপ্ত ছিল। পূরণ না হওয়ায় মতিজানের পরিবার এবং মতিজানের ওপর নির্যাতনটা বর্তায়।

(গ) বিয়ের এক বছর না যেতেই বাচ্চা না হওয়ায় মতিজানকে সন্তানধারণে অক্ষম হিসেবে প্রতিবেশীদের কাছে প্রচার করে গুলনুর এবং মতিজান সন্তানসম্ভবা হলে শর্ত জুড়ে দেয়, ছেলে না হলে হবে না।

গল্পে আবুল ধর্ষকামী (sadist) চরিত্র। মানসিক দুরবস্থার এক পর্যায়ে মতিজান জীবনে বেঁচে থাকার জন্য লোকমানকে অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয়। তাছাড়া নারী হিসেবে তার সন্তানলাভের

কামনাও প্রবল; কিন্তু সমাজ-স্বীকৃত পথে তার অভিলাষ চরিতার্থ করা সম্ভব হয়নি। তার সেই অতৃপ্ত প্রেমবাসনা সন্তানপ্রাপ্তির মাধ্যমে পরিতৃপ্তি পেতে চেয়েছে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটিই স্বাভাবিক রীতি। কামনা প্রত্যক্ষ পথে চরিতার্থের সুযোগ না পেলে পরোক্ষ পরিতৃপ্তির সন্ধান করে।

সেলিনা হোসেন গল্পটিতে বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরেও ভালোবাসার সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মতিজান-লোকমানের ভালোবাসায় সাহসী হয়ে ওঠে। শাশুড়ির সামনে টিকে থাকার অস্ত্র যেন সে পেয়ে যায়। ছেলে না হওয়ায় আবুলকে বিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে মেয়েদের নিয়ে বাইরে চলে যেতে বললে– সবাইকে সচকিত করে মতিজান হেসে ওঠে– 'বংশের বাত্তি? আপনের ছাওয়ালের আশায় থ্যাকলে হামি এই মাইয়া দুডাও পেত্যাম না।[৯] গল্পশেষে মতিজানকে আমরা প্রবল আত্মবিশ্বাসী একজন নারী হিসেবে আবিষ্কার করি। সমস্ত সমাজ, সংসারকে পেছনে ফেলে সে নিজের অস্তিত্বকে জানান দেয়।

বহির্জগতের ঘটনা নারীহৃদয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে– তা 'যোগাযোগ' গল্পে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রোকেয়ার জীবনে দেখিয়েছেন। বড় মামার জটিল অসুখের খবরে রোকেয়া সাত বছরের ছেলেকে তার স্বামীর কাছে রেখে আসলে– দুশ্চিন্তা পিছু ছাড়ে না। ট্রেনে আসার সময় সামান্য ঘুম আসলেই সে স্বপ্ন দেখে তার মৃত মা তাকে স্বপ্নে বলছে, 'রোকেয়া, অ রোকেয়া, আর কতো ঘুমাইবি? কাইন্দা কাইন্দা পোলার তর শ্বাস বন্দ হয়, উঠলি? অ রোকেয়া।'[১০] ঘুমের রেশ কাটতেই সে আবিষ্কার করে পাশের যাত্রীর কোলে বাচ্চাটার কান্না। গ্রামের প্রকৃতি ও শৈশবস্মৃতির সুখময়তা তাকে উদ্বেলিত করলেও এক সন্ধ্যায় তার মৃত মায়ের আবছা ছায়া রোকেয়ার আনন্দ ম্লান করে দেয়। মৃত মা তাকে আবারও বলে, 'রোকেয়া, তর পোলায় কেমুন আছে?' মায়ের মৃত ছায়া ও কণ্ঠস্বর তাকে একদিকে আত্মবিস্মৃত করে, অন্যদিকে সন্তানের চিন্তায় উদ্বিগ্ন করে তোলে। এই গল্পে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মনস্তত্ত্বের ক্রিয়াকৌশলে মনোচারী রোকেয়ার স্বপ্নাচ্ছন্ন ও কল্পনাপ্রবণ মানসিক অবস্থাকে অতিপ্রাকৃতের শিহরনময় পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন। মায়ের ছায়ামূর্তিকে দেখা– মায়ের জন্য রোকেয়ার অবচেতন মনে স্থিত ভালোবাসার প্রকাশ। আর মৃত মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা সন্তানবাৎসল্যে ব্যাকুল রোকেয়ার মনোজগতের দুশ্চিন্তার ফল। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অনুসন্ধান এতো ব্যাপক ও গভীর যে চোখের বক্ররশ্মি মানুষের ত্বক ফাটিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ে মনোলোকের গহীন মজ্জায়।[১১]

রোকেয়ার চেতন-অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া জানাতে লেখক প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। মায়ের আবছায়া মিলিয়ে যাবার একটু পরেই স্বামী হান্নানের টেলিগ্রামে পুত্রের দুর্ঘটনার আহত হবার খবর শুনে সে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। খোকনের কাছে পৌঁছানোর পথে তার আত্মানুসন্ধান, মনোকল্পনা রোকেয়াকে স্থির হতে দেয় না। এই সময় তার মাতৃহৃদয়ের অহংকার ও বাৎসল্যের প্রকাশ ঘটে। 'আমি তাড়াতাড়ি পোলার কাছে গিয়ে খাড়াইতে পারলেই হ্যার ব্যাবাকটি বিষ মুইছা ফালাইতে পারতাম।'[১২] ঢাকায় ফিরে হাসপাতালে অসুস্থ ছেলেকে সেবা করলেও খোকন রোকেয়াকে চিনতে পারে না। দীর্ঘ দূরত্বে থাকার সময়ে মানসিকভাবে খোকনের অসুস্থতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন

করতে পারলেও, দৈহিকভাবে নিকটে থাকার পরও সে সংযোগ করতে পারে না। খোকনের অসুস্থতা রোকেয়ার অনিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। মূলত রোকেয়ার মাধ্যমে মাতৃহৃদয়ের মনোবেদনা ও সন্তানের মৃত্যু শঙ্কাজনিত বিমূঢ়তা গল্পটিতে প্রবলভাবে ধরা দিয়েছে।

সমাজ-পরিবার থেকে নিরন্তর অবহেলা নারীর মনোজগতে জটিলতার সৃষ্টি করে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'অসুখ-বিসুখ' গল্পে এই সত্যই প্রতিপাদিত করেছেন। পুরান ঢাকার একটা বাড়িতে পুরো জীবন কাটিয়ে দেওয়া বৃদ্ধা আতমন্নেসার সমগ্র জীবন অনাদর অবহেলায় পার হয়েছে। নানা বঞ্চনা ও অমনোযোগের ফলে বৃদ্ধার যে মনোবিকৃতি ঘটেছে– তাতে তার চরিত্রে মানবিক স্বার্থপরতা ও হীনম্মন্যতা স্থান পেয়েছে। নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ হিসেবে সংসার শুরুর প্রথম থেকেই তার নিজস্ব অস্তিত্ব বিলীন হতে থাকে। হাঁপানি রোগে সর্বদা অসুস্থ স্বামীর সেবা, সন্তানদের লালন-পালনে বৈচিত্র্যহীন সংসারে, সে অর্থহীন আবর্তনের মধ্য দিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। আজীবন অসুস্থ স্বামী সেবা করতে গিয়ে বহুবর্ণিল ঔষুধপত্র দেখতে-দেখতে আতমন্নেসার ভেতর এক সময় ঔষধ-প্রীতি জন্ম নেয়। মনের অজান্তে সে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, তারও অসুখ হোক– ঔষধপত্র ডাক্তার আসুক। নানা সময়ে ছোটখাটো অসুখ হলেও সংসারের ব্যস্ততায় তা আর অন্যদের জানানো হয়নি। যার ফলে পরিবারের সবাই তাকে নীরোগ ভেবে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। শেষপর্যন্ত জীবন সায়াহ্নে সত্যিই অসুস্থ হলেও কেউ তাতে আমল দেয় না।

যৌবনকালে আতমন্নেসার বাচ্চা প্রসবের সময় তার স্বামী ডাক্তার তো দূরের কথা প্রতিবেশী সাবিত্রী দাইকেও ডাকেনি। স্বামীর অবহেলা, অমনোযোগ আতমন্নেসার ভেতরে ক্ষোভের সৃষ্টি করলেও অবদমন করার ফলে ক্রমান্বয়ে তা মনোবিকারের রূপ নেয়। তার শরীর খারাপ করলেও তার মেয়ে বলে, 'আম্মার শরীর মাশাল্লা খুব ভালো। আমরা কুনদিন আম্মার জ্বরভি হইতে দেখি নাই। ... না আম্মা, বিমার তোমার মনের মধ্যে।'[১৩] নিজের শরীর খারাপ ও সুন্দর-সুদৃশ্য ঔষুধ খাবার লোভে নিজের অসুস্থ মেয়ের ঔষধ আতমন্নেসা খেয়ে ফেললে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়। সেখানেই তার ক্যানসার ধরা পড়ে। আতমন্নেসারও অসুখ-বিসুখ হতে পারে, তার সত্যিই একটা বড় অসুখ হয়েছে, এই সত্যের স্বীকৃতিতে সে আনন্দিত হয়। এই মানসিক অবস্থা থেকে তার ভাবনা : শরীর লোহার হোক, কাঠের হোক, রোগ ব্যারাম ছাড়া কি মানুষ বাঁচে? ক্যান্সারের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত না হলেও রোগটা যে জটিল, নানা ধরনের আয়োজন দেখে সে অনুমান করে। হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা করে ফিরে এসে অন্যদের কাছে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তাতে তাকে সদ্য কিশোরীর মেলা থেকে ফিরে আসার কথা মনে হয়। 'হি হি, কিসব ফিতাফুতা দিয়ে আমার বুক বান্দে, পিঠ বান্দে, হাত পাওয়ের ওংলি ভি বান্দে, কি করবো? না, আমার কলিজার মাপ লইবো। হি হি।'[১৪]

রোগের কঠিন ছায়া বাড়ির সবাইকে বিষণ্ন করে ফেললেও আতমন্নেসা খুবই আনন্দবোধ করে; যেন বাজিতে সে জিতে গেছে। আজীবন বঞ্চিত আতমন্নেসা অসুস্থতার মধ্যে জীবনের সফলতা খুঁজে পায়, 'আমি কই নাই? ...আমি তগো আগেই কইছিলাম।'[১৫] অবহেলার কারণে সৃষ্ট আতমন্নেসার মনোসমস্যা বার্ধক্যে প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। সে ঘরে বসে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে

এবং সামান্যতম অসংগতি দেখলে বিরক্ত হয়। তার পুত্র সোবহান বাইরে যাওয়ার আগে পানি খেতে চাইলে ব্যস্ততায় পুত্রবধূ তা দিতে না পারলে আতমন্নেসা ক্ষিপ্ত হয়। বৌমাকে বকাঝকা করেও তার ক্ষোভের জ্বালা মেটে না। সে যে মন্তব্য করে সেখানে তার বিকারগ্রস্ত মনের হদিস পাওয়া যায় :

> পোলায় আমার পানি না পাইয়া বাড়ি থাইকা বারাইয়া গেল, খানকি মাগী তুই পানি না দিয়া ভাতাররে বাইর কইরা দিলি? ঘরটারে কারবালার ময়দান বানাইবার হাউস করছস, এ্যাঁ? এই যে তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে, শুকনো গলায় রোদের ভেতর বাইরে চলে গেলো তার ছেলে সোবহান সে যদি আর ফিরে না আসে তো খানকি মাগীটার উচিত শিক্ষা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে যদি খবর আসে যে গলি থেকে বেরিয়ে আলু বাজারের বড়ো রাস্তায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোবহান একটা ট্রাকের তলায় পড়ে গেছে মুখ থুবড়ে, শেষবারে মতো দেখতে চাইলে সবাই মেডিক্যাল কলেজে চলো, তো এই শয়তান বৌটার বাপের বাড়ি পর্যন্ত উদ্ধার না করে আতমন্নেসা ছাড়বে না।[১৬]

বৌমাকে শাস্তি দিতে আতমন্নেসা এতোটা হিংস্র হয়ে যায় যে, পুত্রের মৃত্যু কামনা করতেও সে দ্বিধা করে না। রাগান্বিত আতমন্নেসা কন্যা মতিবানুর ওপরও প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত ও বিরক্ত হয়। হাঁপানি রোগী মতিবানুর দীর্ঘদিন বাপের বাড়িতে পড়ে থাকা এবং বিবাহের চার বছরেও সন্তানহীন থাকা তার অপছন্দ। তাছাড়া জামাই চিকিৎসা করিয়ে সন্তান নেবার চেষ্টায় জামাইয়ের ওপরও তার বিরক্তির শেষ নেই। এখানেও তার মনোবিকলনের ছবি দৃশ্যমান :

> জামাইটাই বা কিরকম পুরুষমানুষ যে বিয়ের পর চার বছর বাচ্চা হয় না, এখনো অন্য বিয়ের নাম পর্যন্ত করে না। আবার ডাক্তার দ্যাখায়। বলে হাঁপানি ভাল হলে মতিবিবির বাচ্চা হতে পারে। কতো রঙের কথাই যে এরা জানে। নিজে পারে না, মাইনা কইরা ডাক্তার রাইখা পোলা পয়দা করবা, না? রাগে আতমন্নেসার মুখ খারাপ করতে ইচ্ছে করে।[১৭]

আতমন্নেসার মধ্যে sadism বা ধর্ষকামী মনোভাব সৃষ্টি হয়। আসলে এই সব ক্রোধ ও অশুভ আকাঙ্ক্ষা তার মানসিক বিকারের ফল। মনোবিদের মতে, 'বাস্তবের সঙ্গে লিবিডোর প্রতিক্রিয়ার ফলে মনের মানুষ জটিল হয়ে পড়ে। নানা বাঁকাচোরা পথে লিবিডো আত্মপ্রকাশে তৎপর হয়ে ওঠে।'[১৮] স্বামীসোহাগ বঞ্চনা, সন্তানদের স্বভাবসুলভ অবহেলা সারাজীবন সেবা-শুশ্রূষা না পাওয়া একঘেয়ে নারীজীবনে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যায়। জীবস্মৃত আতমন্নেসার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণই এই গল্পের অসাধারণত্ব।

শওকত ওসমান 'স্বৈরিণী' গল্পে ছাপ্পানোর্ধ্ব মায়মুনার অন্তর্যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম যৌবনে প্রেমে প্রতারিত এবং পরবর্তীকালে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও বৈধব্যপ্রাপ্তি তার নারী জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মায়মুনা প্রতিবেশী হাশেমকে ভালোবেসে সুখের নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখলেও পাত্রপক্ষের অভিভাবকদের বাধায় তা সফল হয়ে ওঠেনি। অগত্যা মায়মুনার অন্য জায়গায় বিবাহ হয় এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে তার জীবনে বৈধব্যবাস নেমে আসে। এখান থেকেই শুরু হয় মায়মুনার অন্ধকার জীবনের পথচলা। সে হাশেমের প্রতি প্রতিশোধের নেশায় নিজের জীবনকে বিপর্যস্ত করে। বহুগামী হয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হলে বারবনিতা পল্লিতে ঠাঁই হয় তার। এই পল্লিতে মায়মুনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া নিশীথের অতিথি হৃষ্টপুষ্ট-দীর্ঘকায়-সদালাপী

ব্যবসায়ী কুবাদ চৌধুরীর স্ত্রীর মর্যাদায় পৃথক বাসায় বসবাস করে। কুবাদ চৌধুরী মায়মুনাকে স্ত্রীর মর্যাদায় রাখলেও প্রথাগত সভ্য সমাজের আলোয় সামাজিক মর্যাদাদানে কার্পণ্য করেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত কুবাদ চৌধুরীর কাছ থেকে কোনো কথা শুনতে না পেয়ে তাকে নীরবে চলে যেতে হয়। মায়মুনা সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক অনীক মাহমুদ বলেন :

> বারোয়ারি পল্লী থেকে হাত ফেরতের কবল থেকে রেহাই পেলেও সামাজিক মর্যাদা পায়নি। এমনকি মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর বাড়িতেও জোটেনি সামান্য স্বীকৃতি বা সম্মান। অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দারিদ্র্য একজন অসহায় নারীকে কীভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধতে পারে মায়মুনা তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।[১৯]

মায়মুনা কঠোর বাস্তবতায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হলেও এক ধরনের Sublimation (ঊর্ধ্বায়ন)-এর মাধ্যমে হাশেম তার মগ্নচৈতন্যে (Subconscious) জেগে থাকে। ফলে মায়মুনার মধ্যে যে, প্রক্ষোভ বা আবেগ উৎপন্ন হয়, তারই আকর্ষণে সে অজাচারের দিকে ছুটে যায়। যৌনজীবনে অতৃপ্তি, তীব্র মানসিক অশান্তিতে মায়মুনার যন্ত্রণাদগ্ধ অন্ধকার জীবনে আলোর হাতছানি থাকলেও আলো তার জীবনে কোনো নতুন ভোরের ফল্গুধারা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই তার অবস্থান থেকে গেছে। লেখক গল্পটিতে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার নিগূঢ় টানাপড়েনের বর্ণনায় নারীর নিঃসঙ্গ চিত্তের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এই গল্পে হাশেম এবং কুবাদ চৌধুরী উভয় মর্যাদার ভীতি থেকেই মায়মুনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। আসলে:

> জনমতকে যে ভয় করে, জনমত তাকেই কাবু করে বসে – যে ভয় করে না তাকে কিছুই করতে পারে না। কুকুরকে ভয় করলেই কুকুর তেড়ে কামড়াতে আসে, ভয় না করলে কিছুক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে লেজ গুটিয়ে চলে যায়। সাহসই সবচেয়ে বড় জিনিস।[২০]

গল্পটিতেও এই বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়। হাশেম এবং কুবাদ চৌধুরী প্রত্যয়হীন, দুর্বল ব্যক্তিত্বের মানুষ। তাদের দৃঢ়তার অভাববোধের কারণে মায়মুনাকে কষ্ট পেতে হয়েছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'নীরবতা' গল্পে অসম সাহসিকতায় মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের আত্মসম্ভ্রমকে কীভাবে রক্ষা করলো তুফানি তা আমরা জানতে পারি। এদেশীয় দালাল শ্রেণির প্রতিনিধি নুরার সহযোগিতায় তুফানির ভাইকে পাক সেনারা অবরুদ্ধ করলে, ছাড়ানোর শর্ত হিসেবে তুফানিকে মেজর সাহেবের কাছে পাঠানোর নির্দেশ আসে। এতে তার বাবা-মা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়। একদিকে ছেলের জীবন, অন্যদিকে মেয়ের সতীত্ব। এই সময় তুফানির সতীত্বের শক্তি প্রবল হয়ে উঠলে সে সিদ্ধান্ত নেয় শত্রুকে পরাস্ত করেই সে জীবন দেবে। তাই পাকবাহিনী যখন নৌকায় তাকে নিয়ে যাচ্ছিল– সুযোগ বুঝে মেজর সাহেবসহ নিজেকে পানিতে আত্মবিসর্জন দেয়। এতে মেজর সাহেবসহ নৌকাটি অতল-তলে তলিয়ে যায়। গল্পে তুফানি অস্তিত্বসচেতন, অসীম সাহসী মেয়ে। বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে ভেঙে না পড়ে সে মনের অতল থেকে রহস্য চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তখন নিজের মনের গোপন সত্যকে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে নিজেই বিস্মিত ও হতবাক হয়। এই বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড বলেছেন :

> Man's craving for the grandiosity is now seffering the third and most bitter blow from present-day psychological research which is endeavouring to prove to the 'ego' of each of us that he is not even master of his own house, but he must remain content with the veriest. Scraps of information about what is going on unconciously in his mind.[২১]

হঠাৎ কোনো প্রবল ধাক্কায় মানুষ তার মনের অতলে পুঞ্জীভূত রহস্যময়তাকে অনুধাবন করে নিজেকে দৃঢ়ভাবে উপস্থিত করতে পারে। তুফানি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে শত্রুকে ধ্বংস করতে কৌশলের আশ্রয় নেয়। তুফানির সাহসিকতার দৃশ্য :

> কাত হচ্ছে ডিঙ্গি আরো কাত হলো। নিজের থেকে বুক ইস্তক উপরে তুলে দুই হাতে বাঁধা আঁকড়ে ডিঙ্গিটাকে উল্টাবার চেষ্টা করছে আরো একজন। ভৌতিক অভ্যুত্থান, কিন্তু ডিঙ্গি উল্টাবার আগেই হুড়মুড় গড়াতে গড়াতে এসে এক ঝটকায় ঝাপাৎ করে নিজে পড়লো ভীষণ ল্যাপটানো জটপাকানো জীবন্ত ভারী একটি পদার্থ বেশ আলোড়ন; তবু নেই কণ্ঠস্বর।[২২]

মেজরের নিথর নিস্তব্ধ দেহের সঙ্গে তুফানির মহান আত্মহত্যা নিভৃত থেকে গেল জানল কেবল নদী। অচেতন নদীর প্রতি মানবীয় বোধ আরোপের এই বিশিষ্ট কৌশল বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়।[২৩] সামান্য নারী বিবেচনায় তুফানিকে প্রতিহত করার কোনো ভাবনা মেজর সাহেবের মনে আসেনি। কিন্তু বুদ্ধির প্রাখর্যে, আত্মপ্রত্যয়ী তুফানি শত্রুকে পরাজিত করেছে কঠিন হাতে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ফারখত' গল্পে দেখা যায়, একাত্তরের মধ্যমার্চে শাহেদ-আলেয়ার বিয়ে পাকাপাকি হলেও দেশের ক্রমাগত খারাপ পরিস্থিতিতে শাহেদ যুদ্ধে যাবার জন্য মনস্থির করে। যুদ্ধে শাহেদের সঙ্গে আলেয়াও অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, আলেয়াকে সে নারী বিবেচনায় নাকচ করে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে পাক সেনাদের মুখোমুখি হবে কোনো নারী যে কিনা তার বাগ্‌দত্তা এটা না মানতে পেরে শাহেদ 'গুডবাই' জানিয়ে আলেয়ার কাছ থেকে বিদায় নেয়। কিন্তু আলেয়া থেমে থাকেনি, সেও নারীদের স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দেয়। হঠাৎ একদিন আলেয়াকে তরুণীদের মধ্যে দেখে শাহেদ হতবাক হয়; তখনি তার দিকে ছুড়ে আসে একটি চিরকুট। 'আপনাকে আমি ত্যাগ করেছি। আপনি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন, যা খুশি করতে পারেন। আপনার উপর আমার কোনো দাবি রইল না।'[২৪] এই গল্পে শাহেদ লেখাপড়া জানা ব্যক্তি, প্রগতিশীল সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও বাঙালি মধ্যবিত্তসুলভ যে মানসিকতা সেটা পরিত্যাগ করতে পারেনি। নারী ঘরের শোভা, তাকে ঘরে আবদ্ধ রাখার চিরাচরিত পন্থার বাইরে তাকে স্বাধীনভাবে সব কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দান শাহেদের মতো পুরুষদের ইচ্ছা নয়। তাই আলেয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা অনেকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলেয়া নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্বকে প্রমাণ করে, নারীরাও জীবন বাজি রেখে এগিয়ে যেতে পারে। আলেয়া শাহেদকে ফারখত অর্থাৎ ত্যাগ করে স্বেচ্ছাসেবক দলে অংশগ্রহণ করায় তার প্রেমপ্রবৃত্তি তার মধ্যে বিপ্লবাত্মক মনোভাবে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। আত্মনির্মাণের মধ্য দিয়ে সে নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উপনীত হতে পেরেছে।[২৫]

আলেয়ার এই দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইডেন কলেজের ছাত্রী সংসদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদিকা সুফিয়া নাসিরের একটা ভূমিকা আছে। একজন মানুষের আত্মনির্মাণের পটভূমিতে

অন্য আরও মানুষের আত্মনির্মাণের ধারা তৈরি হয়। একজন মানুষ স্বতন্ত্র হতে পারে কিন্তু একজন অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই অবস্থায় মানুষ বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা ও বিকল্পের ভেতর থেকে যখন কিছু নির্বাচন করে– তা শুধু তার নিজের জন্য নয়, সকল মানুষের জন্য ভালো। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্রে বলেন :

> When we say that man is responsible for himself, we do not mean that he is responsible only for his own individuallity, but that he is responsible for all men. When we say that man chooses himself, we do mean, that is choosing for himself he chooses for all men.[২৬]

একইভাবে সার্ত্রে আরো বলেন, In fashioning myself I fashion man. আর এভাবে মানুষ আত্মনির্মাণের ভেতর দিয়ে আত্মব্যক্তিকতায় (subjectivity) উপনীত হয় এবং তা পরিণামে আসলে আন্তঃব্যক্তিময়তায় (intersubjectivity) রূপ নেয়। আত্মনির্মাণের এই ধারায় মানুষ যখন নিজেকে অতিক্রম করে ঊর্ধ্বে উত্তরণ (self-sarpassing) লাভ করতে পারে এবং আন্তঃব্যক্তিকতা গঠিত হয়ে আত্মউত্তরণের মধ্য দিয়ে মানুষ তখন মানবতাবাদে উপনীত হতে পারবে। সার্ত্রে এই মানবতাবাদকে 'অস্তিবাদী মানবতাবাদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। গল্পটিতে সুফিয়ার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আলেয়ার মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে।

হাসান আজিজুল হক দুই নারীর অস্তিত্বসংগ্রামকে মূর্ত করেছেন 'মা-মেয়ের সংসার' গল্পে। দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবন পরিবেষ্টিত কোনো এক লোকালয়হীন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে মা-মেয়ের বসবাস। আত্মীয়-পরিজনহীন সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের ক্ষোভ না থাকলেও শেয়ালরূপী চার জন বর্বর যুবকের ধর্ষণের শিকার হলে জীবনে বিভীষিকা রূপ নেয়। এরই ফলস্বরূপ মা-মেয়ে উভয়ই গর্ভধারণ করলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কয়েকজন আসে তাদের শাস্তির বিধানের মাধ্যমে সমাজচ্যুত করতে। কিন্তু মায়ের প্রতিবাদের মুখে গ্রামবাসী টিকতে পারে না। এক সময় মা জন্ম দেয় মৃত শিশু আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝে মেয়ে জন্ম দেয় পরিপুষ্ট এক শিশুর।

এখানে এক বিরাট শূন্যতার অভ্যন্তরস্থ আপন স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব রক্ষায় তারা ব্যাকুল। একদিকে তারা জীবনযন্ত্রণায় কাতর, অন্যদিকে অস্তিত্বরক্ষার সংকটে অস্থির। জীবনে বেঁচে থাকার লড়াই করতে গিয়ে ধীরে ধীরে তারা অস্তিত্বসচেতন হয়ে ওঠে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় তারা মাটি খেয়ে বেঁচে থাকে। এ যেন নীরব সংগ্রাম। আত্মসচেতন মানুষের পক্ষে একমাত্র এই ধরনের সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কার্ল জাসপার্স (১৯৮৩-১৯৬৯) মনে করেন :

> ব্যক্তি তার অস্তিত্বের সঠিক তাৎপর্য কেবলমাত্র কোনো গভীর সংকট মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারে। অসুস্থতা, মৃত্যু, অনুশোচনার অতীত কোনো অপরাধবোধ– এ রকম সংকটকালেই ব্যক্তির রহস্যময় অস্তিত্বের সংকেত সঠিকভাবে উন্মোচিত হয়ে যায়। এমন মুহূর্তে ব্যক্তি তার প্রাত্যহিক লেনদেন, টানাপড়েন কিংবা সত্যের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বেড়াজাল থেকে পরিপূর্ণ এক মুক্ত অবস্থায় উপনীত হতে সক্ষম হয়। আর এমন মুহূর্তেই সে তার মূল অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়; সমস্ত সৃষ্টি ও শক্তির মূল যে বিধাতা তার অভিজ্ঞতায় ব্যক্তি এমনি মুহূর্তে গভীরভাবে অভিষিক্ত হয়।[২৭]

জীবন মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে মা-মেয়েও নিজেদের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে। সবকিছু উপেক্ষা করে গর্ভাবস্থায় অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়ে এরা ভয়কে জয় করে মৃত্যুকেই যেন তিরস্কার করে। উচ্চশ্রেণির দ্বারা নির্যাতিত হয়ে তারা স্রষ্টার প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। তবে গল্পের শেষে গল্পকার অলৌকিক বা পরাবাস্তবতার আশ্রয়ে ধর্ষকদল ও তাদের দোসরদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ে তারা ভেসে যায় ঠিকানাবিহীন দূরদেশে।

নিদারুণ অন্নাভাবে বিধবা নারীর সন্তানতুল্য গরুটি হারিয়ে আত্মহনন করার মনস্তত্ত্ব রূপ পেয়েছে মঞ্জু সরকারের 'গো-জীবন' গল্পে। অভাবের তাড়নায় দুই দিন না খাওয়া ঘুতুর মায়ের কাছে একমাত্র বেঁচে থাকার আশা তার নালটি নামের গরুটি। সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা গরুটি ঘুতুর মায়ের ঘোলাটে চোখে স্বপ্নের আবেশ আনে। হাজির বাড়ি গিয়ে চাল বা ভাত না পাওয়া, তার ছেঁড়া কাপড়ে বেইজ্জতি হওয়া দেখে পাড়ার বৌদের হাসাহাসি, নাতিকে পা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ায় ছেলের বৌয়ের গালাগালি বর্ষণে ছারখার হয়ে যায় এই ক্ষুধার্ত বুড়ির জীবন। এতকিছুর মাঝে যখন নাতি এসে খবর দেয়, ধান খাওয়ার অপরাধে হাজি নালটিকে খোয়াড়ে দিয়েছে, তখন ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো ঘুতুর মা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকে। টাকা না দিতে পেরে কন্যার চেয়ে অধিক নালটিকে ঘুতু হাজির কাছে বিক্রি করলে, ঘুতুর মা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

ঘুতুর মার মতো সর্বস্বান্ত নারীর কাছে নালটি ছিল আশার প্রদীপ। বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন হারিয়ে তার মনে প্রচণ্ড বিষাদের সৃষ্টি হয়। ক্ষুধার যন্ত্রণা, সন্তানতুল্য গরুটির বিক্রির খবরে উদ্ভূত নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সে ব্যর্থ হয়। হঠাৎ মারাত্মক ক্ষতি ঘুতুর মাকে নতুন অচেনা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে; যার ফলে নিজের অন্ধকার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে নতুন পৃথিবীতে চূড়ান্ত অভিযোজনে ব্যর্থ হয়ে সে আত্মবিলোপে উদ্‌যোগী হয়। মানুষের এই চরম অস্তিত্বহীনতার পটভূমিতে বিকাশ লাভ করে কসমস বা বিশ্বনিখিলের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার ধারণা। মানব অস্তিত্বের সকল ভরসা-আশ্রয় ও অর্থ হারিয়ে সত্তা নিমজ্জিত হয় অন্তহীন অন্ধকারে, সৃষ্টি হয় মহাজাগতিক বিচ্ছিন্নতা, এ অবস্থায় মানুষ নিজেকে ভাবে : 'A vine am I, a lonely one that stands in the world. I have no sublime planter, no keeper, no mild helper to come and instruct me about every thing.'[২৮] মহাজাগতিক বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুধারণা। এই ধরনের মানস-বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তির মধ্যে আত্মহননের প্রবণতা জাগিয়ে তাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। ঘুতুর মায়ের মধ্যে যা আর্থনীতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মহাজাগতিক বিচ্ছিন্নতায় রূপ নেয়।

নারীর মনোজগতে সংগুপ্ত ঈর্ষার প্রকাশ ঘটেছে শহীদুল জহিরের 'মাটি এবং মানুষের রং' গল্পে। গল্পটিতে আসিয়া বেগম শান্ত স্বভাবের আম্বিয়াকে পুত্রবধূ করার ইচ্ছা থাকলেও আম্বিয়ার গায়ের রং কালো এবং তার বাবার আর্থনীতিক অসচ্ছলতার কারণে তা করেননি। অনেকদিন পর আম্বিয়া তার ফুটফুটে পুত্র সন্তানকে নিয়ে আসিয়া বেগমের বাড়িতে বেড়াতে আসলে, আসিয়া বেগম বিব্রতবোধ করেন। কারণ নাতির গায়ের রং কালো হবে ভেবেই তিনি এক সময় আম্বিয়াকে পুত্রবধূ করেননি। কিন্তু ভাগ্যচক্রে তার নাতির গায়ের রং হয়েছে কালো; আর আম্বিয়ার ছেলের রং হয়েছে টুকটুকে ফর্সা। আম্বিয়ার ছেলেকে দেখে আসিয়া বেগমের মধ্যে অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয়। ঠিক

এই সময় হারুর মা আম্বিয়ার ছেলেকে রাজার ছেলের মতো বললে আসিয়ার সঞ্চিত ক্ষোভ রাসায়নিক কোনো এক বিক্রিয়ায় পরিণত হয়ে নিক্ষিপ্ত হয় আম্বিয়ার ওপর। নিজের নাতিকে কোলে তুলে নিয়ে অত্যন্ত সহজভাবে আসিয়া বলে, 'ছিনালগো পোলা সুন্দরই অয়।' আম্বিয়ার ছেলের সঙ্গে নিজের নাতির তুলনা করে আসিয়া ঈর্ষার যন্ত্রণাবোধ করে, তাই আম্বিয়াকে ভ্রষ্টা চিহ্নিত করে তার অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা কমাতে চায়। তার মানসিকতায় যে হিংস্রতা এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব ছিল– জ্বালাভরা অস্থিরতায় তা প্রকাশ পায়। অন্যদিকে আম্বিয়া এতক্ষণ আসিয়ার সুখের সংসারের সঙ্গে নিজের স্বামীর দুরবস্থা, নিজের স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতির তুলনা করে ভেতর-ভেতর বেদনাহত হলেও আসিয়া বেগমের কথায় যেন তার নব-উপলব্ধি ঘটে। নিজেকে চরিত্রহীনার অপবাদে স্বামীর স্পর্শকে যেন সে অনুভব করে, 'হাতের স্পর্শটা উঠে আসে, উঠে আসে তীব্র রোমকূপের গোড়ায়। রূঢ় কর্কশ হাতটা নরম হয়ে ডুমুরের খসখসে পাতার মতো ছুঁয়ে যায় শরীরের রেখা ধরে ধরে। ... আম্বিয়ার শরীরটায় দৃষ্টির অগোচরে এক কাঁপুনি ছুঁয়ে যায়।'[২৯] আসিয়ার আঘাত আম্বিয়ার কাছে মর্মান্তিক হয়ে ওঠে, তার মধ্যে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা শান্ত মেয়েটাকে তীব্র আক্রমণাত্মক করে তোলে। সে আসিয়াকে নিজের প্রাপ্তি দেখাবার তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করে। লেখকের ভাষায় : 'মগজের ভেতর থেকে প্রজ্বলিত আগুনের জিহ্বা বেরিয়ে আসে। বলে, সোয়ামির কুমোরের লুঙ্গি খুইল্লা দিলে বুজার পারবেন আমনেরও এইরম পোলা অইতো পারে। আমার ছিনাল হওন লাগে নাই সুন্দর পোলার লাইগ্‌গা।'[৩০] মনোবাঞ্ছাগত অতৃপ্তির প্রতিক্রিয়ায় মধ্য বয়সি আসিয়া বেগমের পক্ষে কন্যাসম আম্বিয়ার সম্পর্কে এরূপ কুরুচিপূর্ণ কথা বলা সম্ভব হয়েছে। কারণ হিসেবে সমালোচক রহমান হাবিবের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য :

> আমাদের সমাজে মেয়েরা একটি অবরুদ্ধ পরিবারের মধ্যে বড় হতে থাকে। ছেলেদের তুলনায় তাদেরকে হীনভাবে গণ্য করা হয় এবং তাদের মানসিক বিকাশে সমাজ, পিতা, মাতা, পুত্রের চেয়ে অযত্ন ও অবহেলায় গড়ে তোলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এই মেয়েরা যখন বিবাহিত হয়, তখন স্বামীর কাছ থেকে অবজ্ঞা পাওয়ায় তাদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে একটি প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপ্রবণতা কাজ করে। সে নেতিবাচক প্রবণতায় সে মায়েদের সন্তানরাও বেড়ে ওঠায়– তাদের মধ্যেও সংকীর্ণ-চিত্ততা, অসহিষ্ণুতা ও অনুদারতা প্রশ্রয় পায়।[৩১]

আসিয়ার আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার কারণও এটিই। নারী হিসেবে সারাজীবন অযত্ন, অবজ্ঞার মাঝে বড় হওয়ায় তার মধ্যে যে সংকীর্ণ মানসিকতা তৈরি হয়েছে, সেই কারণেই আম্বিয়াকে সে আক্রমণ করে বসে। বাঙালি সমাজে নারীর সাংসারিক অবস্থানের সঙ্গে-সঙ্গে তার অন্তর্লোকে সংগোপনে থাকা ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, ক্রোধ, অতৃপ্তজনিত হাহাকার এই গল্পে রূপায়িত হয়েছে।

শহীদুল জহির নারীর মনোজগতে গোপন রহস্যময় প্রবৃত্তিগুলি কীভাবে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় তা 'ডলু নদীর হাওয়া' গল্পে উপজীব্য করেছেন। গল্পে পঙ্গু আটষট্টি বছরের বৃদ্ধ আহমদ তৈমুর আলি চৌধুরীর সাতাশ-আটাশ বছরের লাম্পট্য ও নারীর প্রতি স্বেচ্ছাচারিতার কদর্য অতীত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নারীলোলুপ এই লোকটির এলাচিং বা সমর্ত বানু নামে পনের বছরের তরুণীকে দেখে চিত্তলোকে কাম ও প্রেমের দ্বৈত অনুভব জাগ্রত হয়। এলাচিং এর প্রেমিক সুরত জামালকে সে গ্রামছাড়া করে। তৈমুরের দ্বারা অসহায় নারী এলাচিং নিরাপত্তাহীনতায় আত্মরক্ষার বিভিন্ন পথ খুঁজলেও– পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তা আর সম্ভব

হয় না। সে তৈমুরের দ্বারা ধর্ষিত হয়েও প্রতিশোধ নিতে তার জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তৈমুরের সঙ্গে একত্রে অবস্থানের মাধ্যমে তাকে মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়। কারণ এখন তাদের পারস্পরিক অবস্থান হয়ে ওঠে একান্ত বিপ্রতীপ, শিকারির পাতা ফাঁদে শিকারিই অবরুদ্ধ হয়।

তৈমুরের কৃত অপরাধের জন্য বিবেকের দংশনে জর্জরিত করতে এলাচিং তার ওপর নতুন শর্ত আরোপ করে। প্রতিদিন সকালে তৈমুরের নাস্তার পর এলাচিং তার জন্য আনবে পানিপূর্ণ দুটি গ্লাস; যার একটিতে থাকবে তার হাতের আংটির হীরাশ্রিত বিষ, অন্যটি সাধারণ বিষমুক্ত। তৈমুরকে সেখান থেকে পানির গ্লাস নির্বাচনের চরম ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষায় প্রতিদিন জয়ী হতে হবে। কখনও কখনও তৈমুর এই ঘটনাকে ছলচাতুরি মনে করে; কিন্তু ঘটনা যে সত্য তা প্রমাণ করতে এলাচিং বাসর রাতে একটি বিড়ালকে বিষমিশ্রিত ক্ষীর খাইয়ে হত্যা করে। এভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর তৈমুর খান আবার সন্দেহ করে। 'তখন অনেক বছর পর সমর্ত পুনরায় একটা বিড়াল অথবা কুত্তা অথবা ছাগল মেরে আহম্মদ তৈমুর আলিকে ভয় দেখায়।'[৩২]

যৌবনের প্রথমেই যখন সহজেই স্খলন ঘটতে পারত, তখন থেকেই এলাচিং নিজের চারিত্রিক আদর্শ ও নারীত্বের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। তাই তৈমুরের লাম্পট্যের প্রতিশোধ নিতে, সে স্বেচ্ছায় তার তথাকথিত স্বামীত্বকে স্বীকার করে এবং স্পষ্টভাবে হীরার আংটির মাধ্যমে বিষপ্রয়োগে হত্যার পরিকল্পনা জানিয়ে দেয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে বারোটি সন্তানের জননী এলাচিং তৈমুরকে কখনোই ক্ষমা করতে পারে না। স্বামীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে প্রতিদিন সে বিষপানে মৃত্যুমুখী করার আতঙ্কজনক পরীক্ষা অব্যাহত রাখে। তবে সে জানতো, প্রবল কৌতূহলে ও অশেষ উৎকণ্ঠায় একদিন তৈমুর দুটি গ্লাসের পানিই পান করবে– যাতে প্রমাণ হবে হীরার আংটিতে বিষের অসারতা। গল্প শেষে জানা যায়, আংটিটি হীরার নয়, নিতান্তই সস্তা কাচের; যাতে বিষ থাকা অমূলক। অর্থাৎ এলাচিং তৈমুরকে আজীবন মৃত্যুর ভয় দেখিয়েই তার প্রতি লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। যেদিন জেদের বশে উভয় গ্লাসের পানি তৈমুর পান করে সেদিনই তার মৃত্যু ঘটে। বিষমিশ্রিত পানি সে পান করছে এটা ভেবেই আকস্মিকভাবে প্রবল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। 'যে বিষের আতঙ্কে তৈমুরের মৃত্যু সংঘটিত হয়, তা আদৌ বস্তুগত নয়, বরং এলাচিংয়ের বিক্ষুব্ধ চিত্তলোকে পুঞ্জীভূত অসহনীয় বেদনা, অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত ভয়াবহ হলাহল।'[৩৩] শারীরিক পঙ্গুত্ব, মানসিক অস্থিরতা ও নিত্যদিনের একই বিপজ্জনক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার বাধ্যবাধকতা সব মিলে প্রবল চাপে তৈমুরকে বৈকল্যগ্রস্ত করে তোলে। মনস্তত্ত্ববিদ ম্যাক্‌ডুগালের মতে : 'প্যারানইয়া রোগীর গোপন মনে পাপবোধ বা হীনম্মন্যতাবোধ লুকিয়ে থাকার দরুণ সে তার ভ্রান্ত বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে। অবদমনের ফলে আত্মসমালোচনা করতে অপারগ হয়; কাজেই ভ্রান্তি ক্রমশ সুসংগঠিত ও প্রণালীবদ্ধ হতে থাকে।'[৩৪] গল্পটিতে অস্থিতিশীল, কলুষিত সমাজে অবস্থানকারী মানুষের চেতনালোকে নীতিহীনতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পরিণতিতে তাদের মনে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব-সংশয়-অনিশ্চয়তা ও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস উঠে এসেছে।

বাংলাদেশের গল্পকারেরা নারী মনের বিভিন্ন প্রান্তকে উন্মোচন করেছেন সযত্নপ্রয়াসে। নারীর ভাষাহীন রিক্ততার অনুভবময় প্রকাশ, মনের অবচেতন স্তরের নানামুখী টানাপড়েন, সম্ভ্রম রক্ষা করতে না পারার গ্লানি, নীতিহীন পথে ধাবিত হওয়ার কার্যকারণ-সম্পর্ক, সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থনীতিক কারণে সৃষ্ট নানা ধরনের মনোসমস্যা ও অস্তিত্বের যন্ত্রণা এসব গল্পে নারীদের জীবনে দৃশ্যমান হয়। সমাজে নারী মানসের প্রকৃত দীর্ণ অবস্থা ও সংকটকে অত্যন্ত সফলতার সাথে বাংলাদেশের ছোট গল্পকাররা তুলে এনেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১ সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্তরে অন্তরে*, *উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্র মহিলা*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮, পৃ. ১০

২ প্রদীপ বসু, উত্তর আধুনিক নারীবাদ, রতন তনু ঘোষ (সম্পা.), *উত্তরাধুনিকতা*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১০, পৃ. ২৯২

৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫

৪ হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, (সম্পা.) তাহা ইয়াসমিন ও অনুপ সাদি, ঢাকা : কথাপ্রকাশ, ২০১৪, পৃ. ২৫৬-২৫৭

৫ সিমোন দ্যা বেভোয়ার, *দ্বিতীয় লিঙ্গ*, অনুবাদ : হুমায়ুন আজাদ, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ১৪

৬ গোলাম মুরশিদ, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৫

৭ সেলিনা হোসেন, *গল্পসমগ্র*, ঢাকা : সময়, দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০১০, পৃ. ২৯৪

৮ উদ্ধৃত: নীরদ চৌধুরী, 'বাঙালী' থাকিব না 'মানুষ' হইব, *দেশ*, ৫৭ বর্ষ, ১০-সংখ্যা, ৬ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ৩০

৯ সেলিনা হোসেন, *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮

১০ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *রচনাসমগ্র-১*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ৫ম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৪৭

১১ এজাজ ইউসুফী, চন্দ্রালোকের হন্তারক, মানবিকবোধের যুগলবন্দি, (সম্পা.) এজাজ ইউসুফী, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিরিক বিশেষ সংখ্যা*, ঢাকা : বাতিঘর, ২০১৬, পৃ. ১৬২

১২ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *রচনাসমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

১৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

১৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২

১৮ সুবোধ ঘোষ, নিতাই বসু (সম্পা.), *সুবোধ ঘোষ: প্রবন্ধাবলী*, (সম্পা.) নিতাই বসু, কলকাতা : সাহিত্যলোক, ২০০০, পৃ. ১৭৬

১৯ অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, রাজশাহী : ইউরেকা বুক এজেন্সি, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৩

২০ বার্ট্রান্ড রাসেল, *সুখ*, অনুবাদ: মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ২০১০, পৃ. ৬৪

২১ S. Freud, *Introductory Lectures on Psycho-Analysis*, New York : WW Norton & Company 1977, p. 241

২২ আলাউদ্দিন আল আজাদ, *স্বনির্বাচিত গল্প*, ঢাকা : *বইপত্র*, ২০০২, পৃ. ২৪০

২৩ সানাউল্লাহ আল মামুন, *আজকের কাগজ সাময়িকী*, বৃহস্পতিবার, ২১ বৈশাখ ১৪০৭, ৪ মে ২০০০, পৃ. ৮

২৪ আলাউদ্দিন আল আজাদ, *শ্রেষ্ঠগল্প*, ঢাকা : *বইপত্র*, ২০০২, পৃ. ২৯০

২৫ Jean Paul Sartre, *Existentialism and Humanism,* tr. Philip Maireted, London: Methuen. 1970, p. 28

২৬ Ibid, p. 29

২৭ সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ,* ঢাকা : প্যাপিরাস, প্রথম সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ২৪৩

২৮ Hans Jonas, *The Gonstic Religion: The Message to the Alien God and the Begginings of Christianity,* Boston: Beacon Press, 2nd ed. 1963, p. 66

২৯ শহীদুল জহির, *শহীদুল জহির নির্বাচিত গল্প*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ৩৯

৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৩১ রহমান হাবিব, *বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ১৪১

৩২ শহীদুল জহির, *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮, পৃ. ১০০

৩৩ তাশরিক-ই-হাবিক, *গল্পকার শহীদুল জহির*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ২৮

৩৪ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *পাভলভ পরিচিতি*, কলকাতা : পাভলভ ইনস্টিটিউট, ২০০০, পৃ. ৩৯৫

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.008

আগুনপাখি : বিদীর্ণ মানব মনস্তত্ত্বের বিনির্মাণ

জাহিদ হাসান সরকার*

সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে দ্বিমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। নতুন বিশ্বশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক এই দুই বলয়ে। মতাদর্শিক প্রতিযোগিতার পটে সদ্য স্বাধীন অনেক দেশ কোনো এক বলয়ে আশ্রয় নেয়, আবার কিছু দেশ দুই শিবিরের প্রভাব এড়িয়ে স্বাধীন আত্মবিকাশের পথ বেছে নেয়। বৈশ্বিক ময়দানে আধিপত্য বিস্তারের এই ত্রিমুখী লড়াইকে কেন্দ্র করে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অভূতপূর্ব প্রসার ঘটে। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভাষা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুধ্যানী চর্চা ও গবেষণায় উদ্ভাবিত হয় বহুবিধ তত্ত্ব। এই তত্ত্ববিশ্ব শিল্পী-সাতিত্যিকদের সৃজনশীল মননকে যেমন পুষ্টি জুগিয়েছে, তেমনি সাহিত্য-বিশ্লেষণে যুক্ত করেছে এক নবতর মাত্রা। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ জ্যাক দেরিদার 'বিনির্মাণতত্ত্ব', মিখাইল বাখতিনের 'বহুস্বরন্যাস'-এ আলোয় হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* উপন্যাসের একটি উত্তর-উপনিবেশবাদী অবলোকন। এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে এক নামহীন প্রান্তিক নারীর আত্মজাগরণ ও আত্মভুবন নির্মাণের অভিযাত্রা; আর নারীর ভুবনের সমান্তরালে গড়ে উঠেছে আরেকটি ভুবন–সে ভুবন উপনিবেশিত বাংলার, যে বাংলা ঔপনিবেশিক শোষণ-পেষণের যাঁতাকলে নারীর মতোই বিপন্ন। উপদ্রুত নারীর জীবনবীক্ষায় সন্ধান করা হয়েছে উপনিবেশিত ও উপনিবেশ-মুক্ত বাংলার স্বরূপ।

চাবি শব্দ : বিনির্মাণ, কেন্দ্র-প্রান্ত, প্রান্তিক, বহুস্বর, উপনিবেশিত, দেশভাগ।

১

হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১) বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে একজন বিশিষ্ট সৃজনশীল ও মননঋদ্ধ লেখক। তিনি মূলত গল্প ও উপন্যাসের শিল্পী। গল্প রচনার সংখ্যার সাপেক্ষে উপন্যাস রচনায় লেখক স্বল্পপ্রজ। গল্পকার হিসেবে খ্যাতির উত্তুঙ্গ পর্যায়ে তিনি উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং *আগুনপাখি* (২০০৬) ও *সাবিত্রী উপাখ্যান* (২০১৩) শিরোনামের মাত্র দুটি উপন্যাস রচনা করেন। এছাড়া *তিনটি উপন্যাসিকা* শিরোনামে প্রকাশিত স্বতন্ত্র তিনটি আখ্যান *বৃত্তায়ন*, *শিউলি* ও *বিধবাদের কথা*-কে 'উপন্যাসিকা বলা চলে কিনা' (হাসান আজিজুল হক ২০১০, সংকলন সম্বন্ধে) বলে ঔপন্যাসিক নিজে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ, নরসিংদী।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ জ্যাক দেরিদার[১] বিনির্মাণতত্ত্ব ও মিখাইল বাখতিনের 'বহুস্বরন্যাস' তত্ত্বের আলোয় *আগুনপাখি* উপন্যাসের একটি উত্তর-উপনিবেশবাদী অবলোকন।

২

উপন্যাসের অন্বিষ্ট হচ্ছে ব্যক্তিমানুষ; সমাজ, সময় আর ইতিহাসের বিচিত্র জটিল গ্রন্থি পেরিয়ে নির্মিত হয় এই ব্যক্তিমানুষ।[২] তাই উপন্যাসে মানুষকে খুঁজতে গিয়ে সমাজ, সময় আর ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। রাষ্ট্রিক আলোড়ন ব্যক্তিমানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে; তাই রাষ্ট্রকেও খুঁজতে হয় উপন্যাসের আখ্যানে। 'একদিকে ব্যক্তিমানুষ, আর একদিকে সময়–এই দুই দায়ের ভিতর সংগতি আবিষ্কার করাই ঔপন্যাসিকের শিল্পগত সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন।'[৩] *আগুনপাখি* উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষটি এক অনামা বাঙালি গৃহস্থ-নারী। এই নারীর আত্মকথনে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটির কাহিনিবলয় এবং তার আত্মসংজ্ঞাপিত পরিণতিতেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। নিশ্চয়ই রচয়িতার জীবনভাবনা সমেত নারীচরিত্রটি উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ঐতিহ্য অনুসারেই বাঙালি সমাজে নারীর অস্তিত্ব পুরুষসাপেক্ষ। পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া বাঙালি নারীকে রূপময় করা সম্ভব হয় না। কারণ বাঙালি নারীর জীবনে পুরুষের প্রভাব নিয়তির মতোই গভীর। ভারতীয় শাস্ত্রে পুরুষের সর্বময় কর্তৃত্বের আওতায় নারী এক জৈবযন্ত্র; পাতিব্রত্যে, সতীত্বে আর মাতৃত্বে নারীর নারীত্ব প্রস্ফুটিত হয়। ভারতীয় 'নারীর সুপরিচিত মোহময় এক বন্ধনের নাম সংসার–স্বামী-সন্তানের দেখাশুনা'।[৪] ভারতীয় শাস্ত্র নির্দেশিত আদর্শ নারীর ফলিত রূপ হলো সীতা, সাবিত্রী প্রমুখ পৌরাণিক নারী–যারা সেবায়, প্রেমে, মাতৃত্বে, ত্যাগে পুরুষের মহিমা আর আধিপত্যকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছে। এসব শাস্ত্র-কথিত নারীর প্রত্ন-উপাদানে নির্মিত হয়েছে বাঙালি নারীর মনোজগৎ। সমাজকাঠামোর দিকে তাকালে দেখা যায়, পুরুষকে যুক্তি-বুদ্ধির চেতনায় আলোকিত বৌদ্ধিক সত্তা ও নারীকে যুক্তি-বুদ্ধিহীন আবেগের তাড়নায় বশীভূত অবৌদ্ধিক সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরুষকে আধিপত্য ও শাসনের কেন্দ্রে রেখে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পুরুষ/নারীর যুগ্ম-বৈপরীত্যের কাঠামোটি শাসক/শাসিত, প্রভু/ভৃত্য, উত্তম/অধম, শ্রেষ্ঠ/নিকৃষ্ট, ব্যক্তিত্ববান/ব্যক্তিত্বহীন, সবল/দুর্বল, ক্ষমতাবান/ক্ষমতাহীন, রূঢ়/কোমল, আধিপত্য/আনুগত্য, মুক্ত/অবরুদ্ধ, উন্নত/অবনত, শিক্ষিত/মূর্খ, আশ্রয়দাতা/আশ্রিত, বাহির/ঘর, স্বাধীন/পরাধীন, উদার/অনুদার ইত্যাকার সমীকরণে চিহ্নিত। নারীও তার আপন সত্তা বিসর্জন দিয়ে নিজেকে নিম্নস্তরের সত্তা হিসেবে মেনে নিয়েছে। *আগুনপাখি* পুরুষ-আধিপত্যের যুগল-বৈপরীত্যের কাঠামো ভেঙে এক প্রান্তবর্তী নারীর আত্ম-বিনির্মাণ এবং পূর্ণাঙ্গসম্ভব মানুষে উত্তরণের আখ্যান।

৩

আগুনপাখি উপন্যাসে পরিণত নারীর অতীত উন্মোচিত হয় 'পেছন-ফেরা' পদ্ধতিতে। এই উপন্যাসে নারী আত্মজৈবনিক কথামালায় পুনর্নির্মাণ করে নিজেকে, নিজের জীবনের সঙ্গে জড়ানো প্রাসঙ্গিক ঘটনা-প্রবাহ স্মৃতির দৌলতে উন্মোচন করে। আর মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া সেই সব ঘটনাই তো স্মৃতিতে অমলিন থাকে, যা তার চেতনাকে মথিত করে দিয়ে রেখে যায় গভীর ছাপ।

শৈশব থেকে শুরু করে প্রৌঢ়ত্বের পরিণতি বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছাতে তাকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের কাঠামোয় সংগুপ্ত বিচিত্র জটিল গ্রন্থি অতিক্রম করতে হয়েছে। জীবন ও পরিপার্শ্বে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা তার হয়ে-ওঠার কার্য-কারণে রেখেছে নিকট বা দূরপ্রসারী ভূমিকা, যা তাকে ভেঙেচুরে নতুন রূপে গড়ে তুলেছে।

আগুনপাখি উপন্যাসে কথক-নারীর শেকড়-সন্ধানী স্মৃতি-অভিযানে দুজন পুরুষের দীপ্র উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তাদের একজন পিতা, আরেকজন স্বামী, -যাকে কথক সমগ্র উপন্যাস জুড়ে স্বামী না বলে 'কত্তা' বলে সম্বোধন করেছে। দুজনই আপনাপন বৈশিষ্ট্যের দুটো স্বতন্ত্র স্বর নিয়ে কথকের স্মৃতিরেখোয় আবির্ভূত হয়েছে। একজন পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধি, আরেকজন পুরুষতন্ত্রের। পিতৃতন্ত্রে পিতার কর্তৃত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সন্তানের মাথায় পিতার স্নেহময় হাত রাখার স্মৃতি। কথক-নারীর কাছে পিতা সংসারে একক কর্তৃত্বের প্রতিভূ। নারীর প্রতি কোনো মর্যাদাবোধ তার নেই; নারীর অপত্য-স্নেহ তার কাছে মূল্যহীন। স্ত্রীর মৃত্যুতে তার আচরণে শোকের প্রকাশ ছিল না, তার চেতনায় সক্রিয় 'বউ মরলে কাঁদলে সেই পুরুষের খুব নিন্দে'।[৫] কথকের বর্ণনামতে, তার পিতা 'ল্যাখাপড়া জানা মানুষ– বাংলা জানত, ফারসি জানত।... ফারসি বয়েত বলত মাঝে মাঝে আর একটো বাংলা শুভঙ্করি বই লিখেছিল।'[৬] কিন্তু সন্তানদের শিক্ষিতকরণে তার তীব্র অনিচ্ছা, বিশেষ করে কন্যার শিক্ষায়। সে মনে করে শিক্ষা নারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব করার পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ শিক্ষা যে কোনো মানুষকে প্রশ্ন করতে এবং যুক্তির আলোয় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে শেখায়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত করে। শুধু যে কন্যার শিক্ষায় তার অনাগ্রহ তা নয়, পুত্রের শিক্ষায়ও তার সায় নেই। তবে একরোখা মানুষটির মধ্যেও মঙ্গলকামী পিতার অনুভূতি লক্ষ করা যায়। দায়িত্বশীল পিতা হিসেবে সে কন্যার জন্য 'নামজাদা বেরাট বংশে'র পাত্র স্থির করেছে, যেখানে 'ভাত-কাপড়ের অভাব কুনোদিন হবে না'।[৭] আর ধান বিক্রি করে ছেলের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে সংসারের সকলের প্রতি তার দায়িত্ববোধ থেকেই: 'মরাইয়ে যে কটো ধান আছে তা সবারই মুখের গ্রাস। বেশি যা আছে, তা বেপদ-আপদের লেগে রাখতেই হবে। ধান বেচা যাবে না।'[৮] একটি স্থবির সামন্তব্যবস্থার পরিবার-কর্তা হিসেবে তার দায়িত্ববোধ অনুপেক্ষণীয়। পিতার সূত্রে কথক-নারী জেনেছে, পুরুষের অহম্ আর প্রবল কর্তৃত্ব এ সমাজে শেষ কথা, নারীর মতামতের মূল্য এ সমাজে কানাকড়িও নয়, নারী এখানে চরমভাবে অবরুদ্ধ ও পরাধীন। প্রাণীর মতো প্রায় বিনা যত্নে বেড়ে উঠতে উঠতে জেনেছে এ সমাজে 'মেয়ে হলো বাপের আঘিন্নে দায়।'[৯] ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত মেনে নেয়াই ছিল নারীর নিয়তি। তাই বিয়ে সম্পর্কে কন্যার মতামত নেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি কথকের পিতা। কথকের প্রতি মামাদের ভূমিকাও ছিল তার পিতার অনুরূপ। মামারা ভাগ্নেকে মানুষ করার দায় বোধ করলেও ভাগ্নির প্রতি একই রকম দায়িত্ব অনুভব করেনি। কারণ, নারীকে মানুষ করার গরজ এ-সমাজের ছিল না; নারীর ব্যক্তি হয়ে ওঠার ন্যূনতম সুযোগ তাই এ-সমাজ রাখেনি। উল্লেখ্য, পিতৃগৃহে কন্যা হিসেবে কথকের ছিল বঞ্চনার যন্ত্রণা, তবে ছিল না কর্তব্যকর্মের বাধ্যবাধকতা, ছিল না দায়িত্বে অবহেলার কারণে ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার কঠোর অনুশাসন।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় স্বামীগৃহে পুরুষতন্ত্র পরিপূর্ণরূপে সক্রিয়, যেখানে স্নেহ-ভালবাসার মানবিক সম্পর্ক অকার্যকর, দায়িত্বের কঠিন রজ্জুতে নারীর প্রতিটি মুহূর্ত বাঁধা। বিয়ের পরদিনই কত্তামা-র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কথক জেনে গিয়েছিল তার সাংসারিক দায়িত্বের কথা: 'তোমার কিন্তুক দেওর-ননদ আছে। তারা সব ছোট।... তোমাকেই সব দেখেশুনে নিতে হবে।' [১০] দায়িত্ব তাকে বুঝে নিতে হয়েছে শীঘ্রই : 'কানে তুলো, পিঠে কুলো চোখে ঠুলি লাগিয়ে সোংসারের ঘানিতে জুতে গ্যালম দু-দিন না যেতেই।'[১১]

স্বামীর সংসারে কথক-নারীর পরিচয় 'মেতর বউ' হিসেবে। এই নারীর সম্পদেই তার স্বামীর যৌথপরিবারের সম্পন্নতা, যাকে বলে 'উপচে পড়া সোংসার'। সংসারের আশি-নব্বই বিঘা জমির মধ্যে কথক-নারীর সূত্রেই ৫৫ বিঘা জমির মালিকানা (দাদির দেওয়া ১৬ বিঘার পরিবর্তে ২৫ বিঘা আর অলংকার বিক্রির টাকায় ৩০ বিঘা ক্রয়); কিন্তু সম্পদের মালিকানা তার বধূ জীবনে কোনো প্রভাব ফেলেনি; তার ওপর স্বামীর কর্তৃত্বের মুঠো বিন্দুমাত্র আলগা হয়নি। স্বামীর তীব্র অনুশাসনে সে জেনেছে, সংসারে একান্ত নিজের ও ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই। শ্রমবিভাজনেও সম্পদ তার জন্য কোনো সুবিধা বয়ে আনেনি। সারাদিন খেটেছে, কোনো প্রশ্ন তোলেনি; কর্তৃত্বের দাবি উত্থাপন করেনি। এ বিষয়ে কথকের আত্মভাষ্য: 'বড়ো বউ আর আমি শুদু ঘুন্নিপাক খেলেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেই যি ঘানি টানতে লাগলম, সারা জেবন একবারও আর থামতে পারলম না। ডাইনে বললে ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে। শুদুই হুকুম তামিল করা। এ্যাকন মনে হয়, জেবনের কুনো কাজ নিজে নিজে করি নাই, নিজের ইচ্ছা কেমন করে খাটাতে হয় কুনোদিন জানি নাই। আমি কি মানুষ, না মানুষের ছেঁয়া ? তা-ও কি আমার নিজের ছেঁয়া?'[১২]

স্বামীগৃহে কথকের কদর ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা ছিল না। স্বামীর প্রবল ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্বের কাছে সে ছিল ম্রিয়মাণ। আর এ কারণেই স্বামীর সঙ্গে তার কোনো সহজ সম্পর্ক তৈরি হয়নি; স্বামীকে সে সারাজীবন জেনেছে 'কত্তা' বলে। স্বামীর শ্রেষ্ঠত্বে সংস্কার-লালিত বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিজ স্বামীর বিভিন্ন উচ্চতর গুণ সম্পর্কিত নিজস্ব পর্যবেক্ষণ: 'আসমানের বাজের মতুন শক্ত। তবু সে সোনার মানুষ।', 'উ লোক সামান্যি নয়, উ মানুষ বটবিরিক্ষি, তামাম মানুষকে ছায়া দিতে পারে', 'ইরকম ধন কারুর একার লয়, এমনকি শুদু একটো সোংসারেরও লয়। মায়ের তেমন পুত্তুর গোটা চাকলার।', 'উ মানুষ যা করবে ঠিক করে, তা নিয়ে চ্যাঁচামেচি করে না, ভেতরে ভেতরে ঠিক করে', 'আমার খালি মনে হতো, এই মানুষ জানে না এমন কিছু কি ভূভারতে আছে?', 'ভয়-ডর বলে কুনোকিছু তো কত্তার কুনোদিন নাই', 'হিঁদু-মোসলমান সক্কলেরই মধ্যমণি', 'এই কত্তা লোকটিকে আমি য্যাতোদূর চিনি–আমার ছেলেমেয়ের বাপ, বাড়ির কত্তা বলে লয়–অন্য একটো লোক মনে করেই বলছি, এই লোকটিকে বিশ্বাস করা যায়। ওর যি কথা সেই কাজ। তা নাইলে কেউ বলতে পারে, খ্যামতা পেলে নিজের লেগেও কিছু করব, পরের লেগেও কিছু করব? এমন হিসেব করে কেউ বলতে পারে নিজের একটো করলে দ্যাশের দশটো কাজ করবে?'– এসব টুকরো টুকরো মন্তব্যে প্রতিভাত হয় স্বামীর গুণাবলির প্রতি কথকের মুগ্ধতাবোধ। নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব-ক্ষমতা, তীব্র দায়িত্ববোধ, কর্তব্যকর্মে অবিচল নিষ্ঠা, পরার্থ চেতনায় আত্ম-নিবেদন, বিশ্বস্ততা,

বিচিত্র বিষয়ে গভীর জ্ঞান ইত্যাকার গুণের কারণেই স্বামী তার চেতনায় এক হিরোইক ইমেজে প্রতিষ্ঠিত। প্রবল স্বামীর বিপরীতে সে নিজেকে আবিষ্কার করেছে একজন অশিক্ষিত, মূর্খ, দুর্বল ও অসহায় নারী হিসেবে, যার ভাবার ক্ষমতা খুব সীমিত, যে নিজে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এবং অন্যের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত বশংবদের মতো তামিল করে মাত্র। যোগ্যতা ও চেতনার নিরিখে স্বামীর সঙ্গে সে অনুভব করে মেরুদূর পার্থক্য। স্বামীই তাকে জানিয়েছে এই পার্থক্যের অন্তর্নিহিত কারণ: 'আলো আঁধারের মধ্যে যে তফাত – অক্ষর জানা আর না-জানার মধ্যে ঠিক সেই তফাত।'[১৩]

পিতা ও স্বামীর সূত্রে কথক জেনেছে নারী পরাশ্রয়ী, জন্মস্থান নিজের স্থান নয়, স্বামীগৃহও নির্বাসন। যদিও ঘরেই সে থাকে, সবচেয়ে বেশি থাকে; ঘরের সঙ্গে তারই সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড়, তবু কোনো ঘরই নিজের ঘর নয়। নারীই ঘরকে সাজায়, পূর্ণতা দেয়; অথচ তার ঘরে থাকা বা না-থাকা দুটোই পুরুষের ইচ্ছাধীন। কথকের আত্মবীক্ষণে ফুটে উঠেছে নারীর উন্মূলিত সত্তার এই প্রতিচ্ছবি। এই বক্তব্যের সমর্থনে *আগুনপাখি* উপন্যাস থেকে দুটো উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলো :

(ক) 'যাই নাই কিন্তুক ইবার যেই যাবার কথা হলো, কত্তাও মত দিলে, ত্যাকন জান যেন ছেড়ে যেতে লাগল। কি করে ভুলে ছেলম মা! কোন্ নিব্বাসনে পড়ে আছি? কাদের নিয়ে কি করতে সোদর ছেড়ে এত দূরে পড়ে আছি? কোথা রইল মা-বাপ, কোথা ভাই-বুন, কোথা রইল গাঁ-ঘর – এইসব মনে করে বুকের মদ্যে হু হু করতে লাগল।'[১৪]

(খ) 'ওমা, আমি এখুনি বাড়ি যাব, আমার বুকের ধন মানিকদের নিয়ে এখুনি বাড়ি যাব। ই বাড়িতে আর এক দণ্ড লয়।'[১৫]

উদ্ধৃতি দুটোতে স্বামীগৃহকে নির্বাসন ও পিতৃগৃহও নিজের নয় – এ সত্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

পিতা ও স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও অম্ল-মধুর সম্পর্কের ভিত্তিতে কথক তাদের কাছ থেকে পরিবারের প্রতি কল্যাণব্রতী দায়িত্ববোধের শিক্ষা লাভ করে। পিতা ও স্বামীর বদৌলতে মানুষের অবিচল মানসিকশক্তি আর পরিবারের ভরকেন্দ্র শনাক্তিসহ এর উপযোগিতা সম্পর্কে লব্ধ-বোধ কথকের চেতনাকাঠামোতে মনস্তাত্ত্বিক তলানি হিসেবে জমা হয়।

৪

মানুষ কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়; একাকী তার জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ কিছুই হয় না। মানুষ এমন এক সমগ্র-বাস্তবে অবস্থান করে যেখানে বহুবিচিত্র মানুষ আপনাপন অস্তিত্বের স্বতন্ত্র স্বর নিয়ে উপস্থিত থাকে; প্রত্যেকেই তৈরি করে আপন স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বাস্তবের একেকটি তল। বহুবাস্তবের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই প্রতিটি মানুষকে যেতে হয়, যেতে যেতে বিচিত্র অভিজ্ঞতার চাপে বদলে যেতেও হয়। অভিজ্ঞতা আসে সমাজের বিচিত্র তল থেকে, বিচিত্র অঙ্গন থেকে। এই বদলানোর মধ্য দিয়ে মানুষ পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। আবার এই পরিণতিও চূড়ান্ত পরিণতি নয়; এই পরিণতিরও আবার শুরু আছে, নতুন পরিণতির দিকে ধাবমানতা আছে। ভারতীয় সামন্তকাঠামোর

একক পরিবারে *আগুনপাখি* উপন্যাসের কথকের জন্ম আর কথকের দেওয়া তথ্যমতে জন্মসালটি ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ। এ বিষয়ে কথকের ভাষ্য উদ্ধরণীয়: 'আমি য্যাকন চোদ্দ বছরের মেয়ে, আমার বিয়ের সোমায়ে ... সারা দুনিয়া যুদ্ধু হয়েছিল।'[১৬] আর যুদ্ধটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বিশ শতকের গোড়ায় যার জন্ম তার শিকড়টাতো অনিবার্যভাবে উনিশ শতক ও তার পূর্ববর্তী বহু শতাব্দী বাহিত ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে প্রসারিত। উপন্যাসে কথকের জন্ম-বৃত্তান্ত নেই, তার মায়ের জীবন্ময় উপস্থিতিও নেই। আট বছর বয়সে কথকের মাতৃবিয়োগের করুণ বার্তা দিয়ে উপন্যাসের পট উন্মোচিত হয়েছে। সম্ভবত মানুষের পক্ষে আট বছরের আগে স্মৃতির উপলব্ধিজাত পুনরুৎপাদন সম্ভব নয় বলেই এর আগের কথা নেই এবং মায়ের কোনো স্মৃতিও তার নেই। তবে মাতৃবিয়োগজনিত করুণ বেদনা আর অসহায়ত্বের কথা আছে। প্রকৃতির অসাধারণ প্রতীকী পরিচর্যায় বিম্বিত হয়েছে সেই অসহায়ত্ব : 'ঘরে জ্বলছে রেড়ির ত্যালের পিদিম, দেড় বছরের ভাই ঘুমিয়ে আছে অঘোরে, গায়ে একটো ক্যাঁথা চাপানো। মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকছে বাদুলে হাওয়া। পিদিম নেবে নেবে।... মনে হছিল দুনিয়ায় আমাদের কেউ নাই।'[১৭] কিন্তু কথকের একটি শেকড় তো থাকতেই হবে; আর সেই শেকড় তার দাদি, যে মায়ের অবর্তমানে চরম বিপন্ন সময়ে স্নেহ-শীতল ছায়া হয়ে কথকের জীবনে উপস্থিত হয়েছে। স্নেহ-মমতায় সংসারকে আঁকড়ে থাকার ভারতীয় নারীচেতনার যে প্রত্ন-শিক্ষা নিয়ে *আগুনপাখি*-র কথকের নির্মাণ, এর ভিত নির্মিত হয়েছে দাদির চৈতন্যমথিত উত্তরাধিকারে। দাদি তো সেই ভারতীয় নারী, যে জীবনের চরিতার্থতা ও প্রশান্তি খুঁজেছে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়া অপত্য-স্নেহ ও ভালবাসার মধ্যে। এ প্রসঙ্গে কথকের ভাষ্য: 'আমরা দুই ভাই-বুন ছেলম তার জানের জান।' কথক সর্বার্থে দাদির উত্তরাধিকারী–সহায়-সম্পত্তি, মানসচেতনা, এমনকি ভাগ্য ও পরিণতিরও। বিশেষত দাদির চেতনায় যে অপত্য-স্নেহের ফোয়ারা বহমান ছিল, তা-ই কথকের চেতনার জমিনকে সিক্ত করে নিত্য বয়ে গেছে; দাদিকে শুষে নিয়েছে তার চেতনা-জগতে। অসাধারণ উপমায় ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে কথকের চৈতন্যের গভীরে দাদির অমলিন অবস্থান: 'দাদি চলে গেল যেন দুনিয়ার সব গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে গেল। আবার দাদি নিজেও কতোদিন বাদে শুকনো পাতার মতোনই কোথা হারিয়ে গেল। এ্যাকন আর কিছুই মনে পড়ে না। তবে বুকটোকে চিরলে সোনার পিতিমে আমার দাদিকে আজও দেখতে পাওয়া যাবে নিশ্চয়।'[১৮]

স্বামীগৃহে কথক ছিল শাশুড়ির সুকঠিন কর্তৃত্বের তত্ত্বাবধানে। মিতবাক শাশুড়ির দৃঢ়চেতা কর্তৃত্বের অন্তরালে কথক অনুভব করেছে অকৃত্রিম মমতার প্রস্রবণধারা। তার সত্তায় নিহিত গভীর মমত্ব ও কঠোর ন্যায়পরায়ণতার কারণে সে হয়ে ওঠে সকলের আস্থা ও স্বস্তির ভরকেন্দ্র। শাশুড়ি সংসারের 'গিন্নি', কথকের ভাষায়, 'ই সোংসারের মুদুনি। মুদুনি ভাঙলে কি আর ঘর থোকে ?'[১৯] মমতাময়ী ও কল্যাণী মাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধনে সবাইকে নিপুণভাবে গেঁথেছে একান্নবর্তী এক বৃহৎ সংসারের গ্রন্থিতে। এই সংসারটি তাকে কেন্দ্র করেই বলয়িত; আর এই কেন্দ্রের বাইরে তারও কোনো আগ্রহ নেই: 'রাস্তায় আমার আর দরকার নাই বাবা, রাস্তা ধরে এখন আর কোথাও যাবার নাই। যে কদিন আছি সব রাস্তা আমার এই বাড়িতে।'[২০] উপন্যাসের পরিণামে তো এই রাস্তা ধরেই

তার সাধের সংসার পাড়ি জমায় দেশের সীমানার বাইরে। অর্থের তাৎক্ষণিকতা ভেঙে শব্দ কীভাবে ভবিষ্যদ্‌দর্শী ব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ হয়ে যায় উপর্যুক্ত উক্তিটি তার উদাহরণ।

৫

আগুনপাখি উপন্যাসে কথকের স্মৃতি-উৎসারিত জীবনের প্রবাহটি লক্ষযোগ্য। কথকের জন্ম ও বেড়ে ওঠা নিস্তরঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজকাঠামোর ভারতীয় মূল্যবোধ-লালিত একক পরিবারে। কৃষিভিত্তিক কৌম-সভ্যতার গভীরে তার শেকড়, যার মনস্তত্ত্বের গভীরে ফসল-সৃজনের স্মৃতি। হলের কর্ষণে কোমল মৃত্তিকার বুকে জন্ম নেয়া ফসলের সম্পন্নতায় তাদের জীবন স্বস্তিময়। এ জীবন কেন্দ্রীভূত, আপন পরিসীমায় ঘুরপাক খাওয়া। আধিভৌতিক বিশ্বাস এ সমাজের রন্ধ্রের গভীরে – মানুষ ও জিন, জীবিত ও মৃতরা এখানে একই সঙ্গে বসবাস করে। কথকের বয়ানে বিম্বিত এই সমাজের রূপটি: 'আমরা জানি যি রাতদোপর আর দিনদোপর একরকম, কুনো তফাত নাই। নিশুতি রাতদোপর যেমন ছমছম ছমছম করে, দিনদোপরও তেমনি। পেত্যয় না হলে জষ্টি মাসের দোপরবেলায় ত্যাকনকার দিনের গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতে হবে। দোপর ঠিক নিশুত রেতের মতুন। সারা গাঁ খাঁ খাঁ করছে, রাস্তায় একটি লোক নাই, কুনো পেরানির সাড়া-শব্দ নাই – গরুর গোয়ালের আঁদার মাচান থেকে উই যি খটাশটো রাস্তায় গরম ধুলোর ওপর দিয়ে বাপ বাপ বলে ডাকতে ডাকতে যেচে কে বলবে ওটো খটাশ লয় আর কিছু ?'[২১]

বিয়ের সুবাদে কথকের জীবনে ঘটে গৃহ-বদল। কথকের ভাষায়, 'ওঠলম ডোবা থেকে দিঘিতে।'[২২] অভিন্ন সামন্ত কাঠামোর অন্তর্গত হলেও স্বামী-গৃহের পরিসরটি একটু বড়– আকারগত ও গুণগত–দুই দিক থেকেই। স্বামী, শাশুড়ি, দেবর, ননদ, জা, সন্তান, মাহিন্দার সবকিছু নিয়েই এ এক বর্ধিষ্ণু সামন্ত পরিবার।

কর্তার কর্তৃত্বের ছায়া ছাড়া সামন্ত পরিবার-কাঠামো অচল; আর কর্তার কর্তৃত্বের গুণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে পরিবারের চারিত্র্য। পিতার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের কারণেই পিতৃ-পরিবার ভিতরমুখীন; বাইরের সকল প্রভাবকে পিঠ দিয়ে ঠেকিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে টিকিয়ে রাখার নিরন্তর চেষ্টা। অর্থাৎ পিতৃ-পরিবার একস্বরপ্রধান। আর 'কত্তা'র অস্তিত্ব-বিকাশী প্রবণতার কারণেই স্বামীর পরিবার বহির্মুখীন। সামন্ত-কাঠামোর ভিতে প্রতিষ্ঠা হলেও পরিবর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে তাল রেখে চলা এটি এক বিকাশমান পরিবার – নিজেকে ছড়িয়ে দেয় বিশ্বময়, আর বিশ্বকে গ্রহণ করে আপন পরিসরে। শিক্ষা ছাড়া চেতনার প্রসার সম্ভব নয়; আর শিক্ষার দ্বার এখানে অবারিত। 'কত্তা' শিক্ষিত; শিক্ষার ছাপ তার কর্মে, চিন্তায়, আচরণে, পোশাকে এবং তার বাক্-বিন্যাসে। শিক্ষার মার্জিত প্রভাবে তার গেঁয়ো খোলসটি পুরোপুরি অপসৃত। মানবিক মূল্যবোধের সত্তানিহিত শক্তিতে হয়ে সে উঠেছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তিত্ব; সাম্প্রদায়িক চিন্তার দেওয়াল ডিঙিয়ে হয়ে যায় হিন্দু-'কত্তামা'-র বড় ছেলে। অপরিসীম দক্ষতায় তার পারিবারিক কর্তৃত্বকে প্রসারিত করেছে সমাজে। রাজনীতি ও ক্ষমতা-কাঠামোতে নিজেকে করেছে অন্তর্ভুক্ত। ভাবনার জগৎকে দেশের সীমা ছাড়িয়ে প্রসারিত করেছে বিশ্বময়। কুসংস্কারের বৃত্ত ভেঙে বিজ্ঞানচেতনায় স্নাত হয়েছে। যথাযথ অভিভাবকত্বে আত্মবিস্তারের প্রক্রিয়ায় সম্মিলিত করেছে

পরিবারের সদস্যদের। ভাই, সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য পাঠিয়েছে শহরের বড় স্কুলে। স্ত্রী হিসেবে কথকও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার আত্মপ্রসারী 'মিশনে'। স্ত্রীকে অক্ষর-জ্ঞান প্রদানেই দায়িত্ব শেষ করেনি; প্রতিনিয়ত তাগিদ দিয়েছে জ্ঞানচর্চার। স্ত্রীর সঙ্গে বিচিত্র বিষয়ে নিজের ভাবনাগুলো বিনিময় করেছে। বাড়িতে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা নিয়মিত রাখত; আর এই পত্রিকার পাতায় ভর করে আসত দেশ-বিদেশের বিচিত্র সংবাদ। গ্রামের পাশাপাশি ভাইকে দিয়ে শহরে বসতি গড়ল। শহরের সঙ্গে তৈরি করল নিবিড় যোগাযোগ। এভাবে তার বিরাট কর্তৃত্বের তত্ত্বাবধানে তৈরি হলো এক বহুস্বরিত একান্নবর্তী পরিবার। আর বলাবাহুল্য, এই বহুস্বরের চাপেই এক সময় ভেঙে পড়ে কর্তার বৃহৎ পরিবার। এভাবেই কথক ডোবা থেকে দিঘিতে ওঠে, পরিশেষে সমর্পিত হয় জীবনের বিশ্বজনীন প্রবাহে।

৬

নারীর সন্তানকে স্নেহ করার স্বাধীনতাও এ সমাজে অবরুদ্ধ। সন্তানও যেন এখানে যৌথ মালিকানার অধীন। তবু ভারতীয় নারীত্বের চেতনায় মাতৃত্বের জয়জয়কার। সকল গ্লানি, অপমান, সবকিছুকে ছাপিয়ে, নিজের যা কিছু আছে সবকিছুর বিনিময়ে অনশ্বর মঙ্গলময়ী মাতৃত্বের পরিচয়েই কথক থিতু হতে চেয়েছে। মাতৃত্বের পরিচয়েই সে সত্তার আনন্দময় পূর্ণতা অনুভব করেছে: 'একদিকে সারা দুনিয়া আর একদিকে ঐ নাড়িছেঁড়া সন্তান।'[২৩]

বড় খোকাই আসলে কথকের চেতনাজগতের 'নাভিবিন্দু'। বড় খোকার জন্মের মধ্য দিয়ে শুধু বংশের 'লতুন ঝাঁড়ের গোড়া পত্তন' হয়নি, উদ্বোধন ঘটেছে কথকের মাতৃসত্তার; এই ছেলের সান্নিধ্যেই সে পেয়েছে প্রথম মাতৃত্বের অনির্বচনীয় স্বাদ, পরম প্রশান্তি : 'বড়ো খোঁকা ছিল শামলা, সি রঙ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত, জানে শান্তি হতো। গরমকালে গাছের ছেয়ায় বসার মতুন মনে হতো।'[২৪] খোকার প্রতিটি বিষয়েই মায়ের মুগ্ধতা-মিশ্রিত পর্যবেক্ষণ; এই খোকাকে আশ্রয় করেই নির্মিত হয়েছে তার চেতনার ভুবন, তার মাতৃত্ববোধে সঞ্চারিত হয়েছে গঙ্গাপ্রবাহী প্রসার। তার নিস্তরঙ্গ জীবনে মাতৃত্বের ফাঁক গলে আসে বৃহৎ জীবনের বার্তা, দেশের মুক্তির জন্য হাজার হাজার ছেলেমেয়ের ঘর ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের সংবাদ মর্মমূলকে ভেদ করে যায় তারা তার খোকার সমবয়সী বলেই। ছেলের সমবয়সী বলেই এক অচেনা মেয়ের (প্রীতিলতা, উপন্যাসে নাম উল্লেখ নেই) দেশপ্রেম ও তার আত্মত্যাগে সম্মোহিত হয় এবং পরম স্নেহে তাকে নিজের সন্তানরূপেই চৈতন্যে ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে কথকের মাতৃত্ব-সম্পর্কিত উপলব্ধিজাত নির্যাস: 'সব্বার ছেলে তো আমার লয়, আমারটোই শুধু আমার। আজকাল পেরায়ই মনে হচে কুনো কিছুই শুদু আমার লয়। আমার ছেলেটিও শুদু আমার লয়। ঐ যি মেয়েটি ধরা পড়ার পর মানের ভয়ে কঠিন বিষ খেয়ে মরল, ঐ মেয়েটি কার ? উ কি শুদু ওর বাপ-মায়ের? উ কি আমারও মেয়ে লয়? উ আমার হলে দোষ কি। উকেই যেদি জিগ্‌গাসা করা হতো, তুমি মেয়েটি কার গো, তাইলে সি মেয়ে কি জবাব দিত? মরবার আগে সি কি বলত, কারু মেয়ে সি লয়, সি ই দ্যাশের সব মানুষের মেয়ে – সি সারা পিথিমির মেয়ে!'[২৫] এভাবে নিজের ছেলেকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে আর অন্যের সন্তানকে নিজের করে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে কথক হয়ে ওঠে একজন সর্বজনীন মা।

এই মাতৃত্ববোধে বিলীন হয়ে গেছে জাতপাত, ধর্মের ভেদাভেদ, দেশ-কালের সীমারেখা। এই মাতৃত্বই তাকে জুগিয়েছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আর ভারত-বিভক্তিকে প্রত্যাখ্যান করার অনিঃশেষ শক্তি; যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষের মতো মানব-সৃষ্ট বিপর্যয়কে ঘৃণা করার অকুতোভয় সাহস। মাতৃত্ব তার এমন এক খুঁটি, যা তাকে দান করেছে শত প্রলোভন আর ভীতি উপেক্ষা করে আপন সংসারের ভরকেন্দ্রে অবিচল থাকার অফুরান শক্তি: 'যে যায় নাই সে আছে ঐ দিঘিটোরই ঢালু পাড়ে কবরের ভেতর ঘুমিয়ে। সে কুনোদিন যাবে না। একদিন আমি তার পাশেই চেরকেলের লেগে ঘুমুবো।'[২৬]

৭

কর্তার কর্তৃত্বপরায়ণতার মধ্যে নিহিত ছিল শুভবোধ। কর্তা যৌথ-পরিবারের কাঠামো দৃঢ়বদ্ধ করার প্রয়োজনে যেমন স্ত্রীর সম্পদকে ব্যবহার করেছে, তেমনি বজায় রেখেছে স্ত্রীর প্রতি কঠিন নিয়ন্ত্রণ। তবে নিজের চিন্তা ও কর্মের যোগ্য সঙ্গী হিসেবেই সে স্ত্রীকে পেতে চেয়েছে। নিজের অন্তর্নিহিত শুভবোধ থেকেই সে স্ত্রীর মানসমুক্তির পথটি উন্মুক্ত করে। তার নিবিড় পরিচর্যায় স্ত্রী অক্ষর-জ্ঞান লাভ করে। স্বামীর উদ্যোগ ও প্রেরণায় কথকের চেতনায় তৈরি হয় অন্তর্নিহিত গ্রহিষ্ণু ক্ষমতা, উন্মুক্ত হয় অবরুদ্ধ চেতনার আগল। দেশ-বিদেশের বিচিত্র প্রসঙ্গ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে, এভাবে কথকের চেতনায় প্রবেশ করে জগৎ-জীবনের বিচিত্র বার্তা। স্বামীই তাকে জানান দেয়: 'ই দ্যাশ পরাধীন।... কোথাকার কোন্ দ্যাশের লোক রাজা-রানী হয়ে ই দ্যাশ শাসন করছে।'[২৭] এরই মধ্যে ব্রিটিশ পণ্য-বর্জন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কথক স্বামীর কাছ থেকে তথ্য হিসেবে জেনে নিয়েছে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার কথা। কথক দেখল, একটু আগে-পিছে হাত ধরাধরি করে এলো যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ; তৈরি করল এক ভয়াবহ মানবিক সংকট। এই সংকটকে আরো ঘনীভূত করলো হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আলাদা রাষ্ট্রের নামে। পরিণামে ভারত ভেঙে টুকরো হলো, প্রতিষ্ঠিত হলো আলাদা আলাদা রাষ্ট্র। এই ভাঙন আবার সর্বগ্রাসী হানা দিল তার স্বামীর যৌথ পরিবারে, এমনকি একক পরিবারেও—সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল তাকে। পরিণামে এক নিঃসীম একাকিত্বে নিক্ষিপ্ত হলো কথক।

৮

'সব মানুষেরই একটি করে শ্যাষ কথা থাকে, সেই কথাটির লেগেই তো সারাজেবন।'[২৮] আর শেষ কথাটি বলার জন্যই কথকের আত্মকথনের এই আয়োজন। নিঃসীম নৈঃসঙ্গ্যে নিপতিত হওয়ার হেতু সন্ধানেই যাপিত জীবনে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা, বিভিন্ন উৎস থেকে আহৃত প্রতিটি তথ্যের পর্যালোচনায় বসেছে কথক, ঘটনাসমূহের কার্য-কারণ সন্ধান করেছে, বিনাশী সময়ে দাঁড়িয়ে উপনীত হতে চেয়েছে অবিনাশী জীবনোপলব্ধিতে।

প্রশ্ন হলো, কী এক অমোঘ শক্তি তার বিপুল বিক্রমে তছনছ করে দিল কথকের দেশ, কাল, পরিবার, সমাজ– সবকিছুকে?

আগুনপাখি উপন্যাসের সময় প্রবাহ 'এই সময়'/'সেই সময়' এই যুগ্ম-বৈপরীত্যে পরস্পরিত। 'সেই সময়' সুস্থির, আত্মভোলা, আপনার মাঝে আপনি সমাহিত। লোভ, হিংসা, ক্রোধ, লুণ্ঠন – এসব অনিষ্টকারী উপাদানের সঙ্গে এর সম্পর্ক বহুদূরের। 'সেই সময়' তার স্বভাব বদলিয়ে 'এই সময়'-এর স্বভাব পরিগ্রহ করেছে। এই সময়-স্বভাব পরিবর্তনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে ঔপনিবেশিক শক্তির উপস্থিতি। অপরের সম্পদের প্রতি বিপুল লোভ আর তা অধিগ্রহণ করার দুরভিসন্ধি নিয়ে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ বিস্তার করে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির সবচেয়ে সম্পদশালী ও লাভজনক উপনিবেশ ছিল ভারত। বাণিজ্য করতে এসে বিপুল বাজারের পাশাপাশি এর বিশাল সম্পদ-ভাণ্ডারের খোঁজ পায় তারা। ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশায়নের সবচেয়ে ভয়াবহ ও ক্ষতিকর নীতিটি ছিল দুটি বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের দেয়াল তুলে তাদেরকে বিভক্ত করে দেওয়া। ব্রিটিশদের এই বিভাজন-নীতিই ভারতের সমন্বয়বাদী ও অহিংস সংস্কৃতিকে ভেঙে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'বৃহত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তত্ত্বগতভাবে মেনে নিয়ে একধরনের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। কিন্তু ঐ আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে যখন সত্যিকার অর্থে ডিকলোনাইজেশনের প্রশ্ন উত্থাপিত হলো, তখন ধর্মগত পার্থক্য এতটাই প্রবল হয়ে উঠল যে ভারতকে অবিভক্ত রেখে তার মীমাংসা করা সম্ভব হল না।'[২৯]

আগুনপাখি উপন্যাসের পুরো আখ্যানজুড়ে ছড়িয়ে আছে সনাতন ভারতের স্মৃতি আর ভারতে উপনিবেশায়ন ও তার ক্ষতচিহ্ন। বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ-কাঠামোর পরিচয় বিম্বিত হয়েছে কথকের বিবাহ-পূর্ববর্তী পিতৃ-পরিবার ও নিস্তরঙ্গ গ্রামের রূপায়ণের মাধ্যমে। ভারতে উপনিবেশায়নের গোড়ায় ছিল ভারতের সম্পদের প্রতি সীমাহীন লোভ আর উপনিবেশায়নের উপায় ছিল সকলের মধ্যে হিংসা বিষ আর স্বার্থপরতার বীজ ছড়িয়ে দেওয়া। নিজেদের ভিতরকার লোভ আর হিংসাকে চতুরতার সঙ্গে সংক্রমিত করে দিয়েছে উপনিবেশিতের মনে। ব্রিটিশ উপনিবেশকরা অর্থ আর ক্ষমতার লোভের ফাঁদে ফেলেছে এ দেশীয় জমিদার ও অভিজাত সামন্তদের, নিজেদের ক্ষমতা-কাঠামোর নিচের দিকে স্থান দিয়ে। যে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোটি তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ ক্ষমতাকে সংহত ও নিরঙ্কুশ করার প্রয়োজনে, তারই নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেই সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার অংশীদার হয়েছে কর্তা। কর্তার উক্তিতে তারই প্রতিফলন: 'সরকারের কথা হলো, নিজের নিজের এলেকায় তোমাদের রাজা করে দিয়েছি'।[৩০] কিন্তু কর্তার মধ্যে আমরা লক্ষ করি, নিজ এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন আর এলাকার মানুষের জীবনে স্বস্তি ও শান্তির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মনিবেদন। সীমিত ক্ষমতার এ প্রচেষ্টা তাকে দেশপ্রেমিক হিসেবে শনাক্ত করে। দেশের স্বাধীনতা তার কাঙ্ক্ষিত, দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশপ্রেমিকদের আত্মদানে সে সম্মোহিত ও শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ নয়, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের– যা চিরায়ত ভারতীয় চেতনার ধারক– কর্তার ছিল গভীর আস্থা। ভারতে ইংরেজদের স্বার্থ প্রতিহত করা গেলেই এ দেশ থেকে তাদের বিতাড়ন করা সম্ভব– ইংরেজবিরোধী

আন্দোলনের কৌশল হিসেবে গান্ধী ব্রিটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলনের ডাক দেন; আর এ আন্দোলনে কর্তা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সাম্রাজ্যবাদের গোড়ার কথাই হলো অন্যের সম্পদ গ্রাসের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা; আর এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের অবলম্বন হলো অমানবিক ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতা। সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্য-রক্ষা ও দখলের আন্তঃবিবাদের অনিবার্যতায় সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ভয়ানক এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দাবানল পশ্চিমা বিশ্বে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে উপনিবেশগুলোর দিকে জিহ্বা বাড়িয়েছে। যুদ্ধের কোনো পক্ষ না হয়েও উপনিবেশিত ভারত এ যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার হয়েছে। পশ্চিমা দুনিয়ার যুদ্ধের ভয়াবহতার খবর প্রথম প্রথম এসেছে খবরের পাতায়। যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির শিকার না হয়েও মানবিক-বিপর্যয়ের খবরে কথকের মানবিক-মন গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়েছে। মানবিকতা-বিরহিত এ যুদ্ধের প্রভাবে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় শুরু হয়, যার দূরবর্তী প্রভাব এ দেশে পড়তে শুরু করে বাজার থেকে একটি একটি করে পণ্য উধাও হওয়ার মাধ্যমে। যুদ্ধের প্রভাবে ব্রিটিশদের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে; একারণে যেসব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ব্রিটিশ বেনিয়াদের মাধ্যমে এ দেশে আসত সেগুলোর সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। বাজার থেকে প্রথম 'নাই' হয়ে যায় কাপড়। যুদ্ধ প্রথমে এদেশের মানুষকে বিবস্ত্র করেছে। নারীকে বেআব্রু করার মাধ্যমে আসলে সভ্যতা-গর্বী সাম্রাজ্যবাদীদের নির্লজ্জ চেহারাই উদোম হয়ে গেছে। এরপর প্রকৃতির বৈরিতা আর ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের যৌথ প্রযোজনায় এদেশে সংঘটিত হয় ইতিহাসের ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষ। মৃত্যুর মিছিল নিয়ে হাজির হয়েছিল এ দুর্ভিক্ষ। কথকের ভাষ্যে, 'ত্যাকন দেখেছেলম, মানুষরা সব এক জায়গায় বসে না, কেউ কারুর সাথে কথা বলে না, দুটো গপ্পগাছাও করে না। কিসের লেগে দিনরাত কুকুরের মতুন হাঁ হাঁ করে ঘুরে বেড়াইছে। এমনিতে কথা নাই, আবার কথা মানেই মারামারি।'[৩১]

যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের সর্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা কর্তার যৌথ-পরিবারেও হানা দিয়েছে, কাঠামোটির গোড়ায় ধরে দিয়েছে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। তবে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব এ পরিবারটিকে কাবু করতে পারেনি; যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে মানুষের মনে যে স্বার্থপরতা, অবিশ্বাস, হিংসা, লোভ ও বিচ্ছিন্নতা বোধের জন্ম হয়েছে, তা-ই ভেতর থেকে ঘুণপোকার মতো ঝুরঝুরে করে দিয়েছে পরিবারের গাঁথুনিটিকে। 'খারাপ সময়' ভাইদের চিন্তা-চেতনাকে কলুষিত করে দিয়েছে; আর চিন্তার দূষণ ভাষাকেও করে দিয়েছে নোংরা; ভাই হয়েছে ভাইয়ের দুশমন, এক ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে আরেক ভাইয়ের হাত। সময়ের বৈরী স্বভাবে আলগা হয়ে গেছে কর্তার কর্তৃত্বের মুঠো। তাই পারিবারিক ভাঙন এক সময় অনিবার্য হয়ে ওঠে। যার পরম নিষ্ঠায় ও একাগ্র সাধনায় ক্ষয়িষ্ণু একটি পরিবার বর্ধিষ্ণু পরিবারে পরিণত হয়েছিল, তাকেই বিনাশী সময়ের কাছে পরাভব স্বীকার করে নিজ হাতেই ভেঙে দিতে হয়েছে নিজের গড়া সংসারকে। কর্তার ভাষ্যে প্রতিবিম্বিত হলো সেই ঐতিহাসিক সত্য: 'ইংরেজরা যা চেয়েছিল তাই হলো। হিঁদু-মুসলমান দুই জাতকে চিরদিনের মতো একে-অপরের শত্রু করে দিলে। পাকিস্তানের নাম করে জিন্না ইংরেজদের কাজটিকেই সহজ করে দিলে আর ক্ষমতার লোভে পড়ে নেহেরু-রাও তাই করলে। প্যাটেল, শ্যামা মুখুজ্জে

মুসলমানদের আলাদা করে দিতে চেয়েছিল, তাই হলো। গান্ধি এখন একঘরে। দরজায় দরজায় তাকে কেঁদে মরতে হবে।'[৩২] উপনিবেশক শাসকেরা ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে গেল, তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ভেঙে দু টুকরো করে। (তবে দু টুকরোয় তিনটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সংগুপ্ত ছিল, উপন্যাসে যার আভাস আছে তিনটি ভাগের উল্লেখে)। এ বিভাজনে দুই সাম্প্রদায়িক মানসিকতা সক্রিয় হলেও এর চেতনাগত কোনো ভিত্তি ছিল না; ভারত শুধু হিন্দুদের রাষ্ট্র হলো না, আর পাকিস্তানও হলো না তাবৎ ভারতীয় মুসলমানের রাষ্ট্র। স্পষ্টতই এই দুটো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যে মানবতা-বিধ্বংসী দাঙ্গা সংঘটিত হয়ে গেছে তাতে জনগণের জন্য কোনো কল্যাণচিন্তা ছিল না, ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবিমৃষ্যকারিতা ও স্বার্থান্ধতা – এটি ছিল দুই সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের স্বার্থ-রক্ষার গোজামিল। এখানেই শেষ নয়, এই গোজামিলের হিসাব মিলাতে লাখ লাখ মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে, সাজানো-গোছানো নিজের পরিবার ও জন্মস্থান ত্যাগ করে তাদেরকে বেছে নিতে হয়েছে অনিশ্চিত মানবেতর জীবন। অন্যদিকে যুদ্ধের প্রভাবে ভেঙে গিয়েছিল যৌথ পরিবার, আর উপনিবেশিত স্বাধীনতা কথককে করেছে পরিবারহীন। বহির্জীবনের প্রভাবমুক্ত শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন নিয়ে গড়া 'সেই সময়' উপনিবেশিকায়নের প্রবল আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে কীভাবে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন-তাড়িত 'এই সময়'-এ পর্যবসিত হয়েছে; বি-উপনিবেশায়নেও ঔপনিবেশিক দৌরাত্ম্য কীভাবে সক্রিয় ছিল আর বি-উপনিবেশিত রাষ্ট্র-কাঠামোয় মানুষের জীবন কতটা দুর্বহ হয়েছিল, তারই একটি পাঠ গড়ে উঠেছে *আগুনপাখি* উপন্যাসে।

৯

কথক-নারীর আত্ম-অন্বেষার যাত্রা পথে ভিড় করেছে দেশ-কাল-সমাজের বিচিত্র অনুষঙ্গ। স্মৃতি-উৎসারিত আখ্যানে পরিলক্ষিত হয় ঘটনার ঘনঘটা; কখনো একটির পর আরেকটা সার বেঁধে, কখনো একটির ওপরে আরেকটি চেপে উপস্থিত হয়েছে। ঘটনাগুলো বিচিত্র চরিত্রকে ভর করে সৃষ্টি করেছে জীবনের বিচিত্র বাস্তবতার তল। ঘটনাগুলো যুগ্ম-বৈপরীত্যের টেকনিকে আখ্যানে সন্নিবেশিত হয়েছে; এক চরিত্রের বিপরীতে আরেক চরিত্রকে দাঁড় করিয়ে, এক ঘটনার বিপরীতে প্রতিস্পর্ধী ঘটনাকে উপস্থাপন করে আখ্যানকে টেনে নিয়ে গেছে পরিণতির দিকে। পরিণতির নৈঃসঙ্গ্য ও রিক্ততায় উপনীত হতে ঔপন্যাসিক প্রাচুর্যপূর্ণ ও ভর-ভরন্ত যৌথ-পারিবারিক জীবনের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এই উপন্যাসের কাঠামোয় গড়ার জৌলুস না থাকলে ভেঙে-পড়ার বেদনা এত তীব্র হতো না। কথকের মন্তব্য তাৎপর্যে মণ্ডিত : 'মানুষের সোংসারে নিয়মই এই, উঠতে উঠতে আকাশে ঠেকবে মাথা, তারপরে পড়তে পড়তে একদিন মাটিতেই আশ্রয়। এ হবেই– সব বংশেই হয়। নিয়তির পথ কেউ বন্ধ করতে পারবে না।'[৩৩] আসলে উপনিবেশ কোনো কিছুকেই স্থায়ী হতে দেয় না; প্রয়োজন মতো গড়ে, আবার প্রয়োজন হলে ভেঙে দেয়।

মাতৃবিয়োগের বিষাদময় শূন্যতার অনুভবে কথকের আখ্যান-কথিত যে জীবনের শুরু, আখ্যানের সমাপ্তিও অনুভূতির একই বিন্দুতে – সর্বস্বহারা একাকিত্বের তীব্র যন্ত্রণায়। মধ্যবর্তী পর্যায়ে চলে এক শূন্যতা থেকে আরেক শূন্যতায় পৌঁছনোর ঘাত-প্রতিঘাতময় বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের তরঙ্গায়ন।

কোনো প্রকার উন্নাসিকতায় কোনো ঘটনাকেই কথক পাশ কাটায়নি; নতুন পরিস্থিতিতে জিজ্ঞাসাতাড়িত হয়েছে, গভীর অভিনিবেশে পর্যবেক্ষণ করেছে পরিস্থিতি, আর পরিস্থিতির কার্য-কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছে। এভাবে বিচিত্র স্বর তার চেতনায় সমন্বিত হয়ে তার মধ্যে একটি আপন স্বর হয়ে ওঠার ভ্রূণ জন্ম নিয়েছে।

বিচিত্র চরিত্রের সংশ্লেষে আর দ্বন্দ্বে ভাঙচুর হতে হতে গড়ে উঠেছে কথকের আত্মভুবন। আর কথকের ভুবনের সমান্তরালে গড়ে উঠেছে আরেকটি ভুবন – সে ভুবন উপনিবেশিত বাংলার, যে বাংলা ঔপনিবেশিক শোষণ-পেষণের যাঁতাকলে কথক-নারীর মতোই বিপন্ন। যুদ্ধ, আকাল, মহামারির মতো দুর্যোগ বাংলার জনপদে বারবার হানা দিয়েছে, বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে আবার চলেও গেছে; কিন্তু এর অশেষ প্রাণকে ধ্বংস করতে পারেনি। এর অফুরান প্রাণ লুকিয়ে ছিল ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের মর্মমূলে নিহিত মানবতায়। ঔপনিবেশিক শাসকদের ছড়িয়ে দেওয়া হিংসার গরলে সেই প্রাণ শক্তি হারিয়েছে; উপনিবেশকদের অভিপ্রেত বিভাজনের রাজনীতির খড়্গে দু টুকরো হয়েছে বাংলার দেহ। এই বিভক্তির ক্ষেত্রে কোনো শুভ উদ্দেশ্য আর কল্যাণচিন্তা কাজ করেনি। কথকের ভাষ্যে – 'ওটো মোসলমানদের দ্যাশ আর এটা হিঁদুদের দ্যাশ ই কথা বলে আর কেউ আমার কাছে পার পাবে না। উ যি মিছে কথা, উ যি শয়তানদের কাজ তা এ্যাকন মনে মনে সবাই জানছে।'[৩৪] উপনিবেশিত স্বাধীনতা বাংলার লাখ লাখ মানুষকে করেছে বাস্তুচ্যুত, তাদের জীবনে বয়ে এনেছে সীমাহীন বিভীষিকা। জীবন-রক্ষার দায়ে কর্তাও পা বাড়ায় দেশান্তরের মিছিলে, সঙ্গী হয় পরিবারের সবাই। কেবল বেঁকে বসে কথক, যে জীবনভর পরবশতা করে এসেছে কর্তার। দেশান্তরিত হয়ে একটি জঘন্য অন্যায়কে বৈধতা দিতে চায়নি বলেই সে প্রবল বিদ্রোহে ফেটে পড়ে: 'সে তুমি যেতে পারো, তবে চেরকাল তুমি যা ঠিক কর তাই হয় না। তুমি অ্যানেক কিছু ঠিক কর নাই, কিন্তুক তাই হয়েছে। তুমি পাকিস্তান হওয়াও ঠিক কর নাই, তোমার সোংসার ভাঙাও ঠিক কর নাই। কিন্তুক উসবই হয়েছে। পিথিমিতে যতো জোর তোমার নিজের পরিবারের ওপর। আর একটি মানুষও পাও নাই জোর খাটাবার লেগে। তা ইবার আমি বলছি, বড়ো খোঁকা য্যাতোই বলুক, আর তুমি য্যাতো জোরই খাটাও, আমি যাব না।'[৩৫] 'এক স্বাধীনতা (১৯৪৭-এ) 'আগুনপাখি'তে আসে, তা নিঃসঙ্গ করে অন্তঃপুরের এক নারীকে। কিন্তু অদম্য জেদে সে পার্টিশনকে অগ্রাহ্য করতে পারে। পার্টিশন তাকে একা করল। তার মস্ত সংসার ভাঙল। সবাই দেশান্তরী হলো, সে বসে রইলো একা।'[৩৬]

ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষ-নারীর যুগ্ম-বৈপরীত্যে পুরুষের কর্তৃত্বের ছায়ায় নারীর যে পরাধীনতা ও পারবশ্যতা ছিল সুনির্দিষ্ট, সেই যুগ্ম-বৈপরীত্যের উগ্র বিচ্যুতি ঘটিয়ে কথক-নারীই চলে আসে কর্তৃত্বের ভরকেন্দ্রে। সময়-স্বভাবের কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে সবাই যখন ছিটকে গেছে কেন্দ্র থেকে, কিন্তু অক্টোপাসের মতো কেন্দ্র আঁকড়ে থেকে গেছে কথক। কক্ষচ্যুত হয়েছে সবাই, কিন্তু অনিঃশেষ শক্তিতে এক ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতায় কেন্দ্রে সংস্থিত থেকে গেছে এই নারী। এক অনন্য সাধারণ উপমায় বিম্বিত হয়েছে তার মূলে নিহিত থাকার যুক্তি: 'চারাগাছ এক জায়গা

থেকে আর জায়গায় লাগাইলে হয়, এক দ্যাশ থেকে আর দ্যাশে লাগাইলেও বোধায় হয়, কিন্তুক গাছ বুড়িয়ে গেলে আর কিছুতেই ভিন্ মাটিতে বাঁচে না।'[৩৭]

স্বামী, সন্তানের মতো আপনজনদেরকে অবলীলায় পরিত্যাগ করেছে, নিজেকে নিজের মতো করে পাওয়ার এক প্রচণ্ড দৃঢ়তায়: 'আমি আমাকে পাবার লেগেই এত কিছু ছেড়েছি।'[৩৮] ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের সুউচ্চ মিনারে দাঁড়িয়ে যে অনায়াসে ঘোষণা দিতে পারে: 'আমি আর আমার সোয়ামি তো একটি মানুষ লয়, আলেদা মানুষ। খুবই আপন মানুষ, জানের মানুষ, কিন্তুক আলেদা মানুষ।'[৩৯]

সীমাহীন নৈঃসঙ্গ্যের পটে দাঁড়িয়ে এই নারী নতুন করে শুরুর স্বপ্ন দেখে, যে শুরু সবাইকে আপন করে পাবার, যার ভিত্তি চিরায়ত মানবতা, যা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে পাশবশক্তির দৌরাত্ম্যে : 'সকাল হোক, আলো ফুটুক, তখন পুবদিকে মুখ করে বসব। সুরুজের আলোর দিকে চেয়ে আবার উঠে দাঁড়াব আমি। আমি একা। তা হোক, সবাইকে বুকে টানতেও পারব আমি। একা।' এই কথক মিশরীয় মিথের সেই 'আগুনপাখি' যে, '(In stories) a magic bird that lives for several hundred years before burning itself and then being born again from its ashes.' (*Oxford Advanced Learner's Dictionary*)। কথক দেরিদীয় দর্শনের সেই বিনির্মিত নারী, যার চেতনায় বহমান ভারতীয় নারীত্বের চিরায়ত কল্যাণবোধ, শেকড়ে সন্নিহিত থাকার তীব্র তাড়না; কিন্তু সনাতন নারীর অন্ধ আনুগত্য আর আত্মবিলীনতার পথে নয়, সে বাঁচতে চায় আপন স্বাতন্ত্র্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার শেকড়ে দাঁড়িয়ে। কথক-নারী হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা সেই অহিংস, সর্বংসহা বঙ্গমাতার প্রতীক, যে যুগে যুগে বহিরাগত ও অন্তর্গত সকল অপশক্তির উপদ্রবকে প্রতিহত করেছে আপন নিষ্ঠায়; শোষণে-পেষণে-আগ্রাসনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও অনশ্বর ক্ষমতায় ধ্বংসস্তূপ থেকে সমহিমায় আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। এই মাতা অপরাজেয়, অপরাভূত, অবিনশ্বর; চরম নৈরাশ্যের পটে দাঁড়িয়েও যে নতুন সৃজনের স্বপ্নে বিভোর।

আগুনপাখি উপন্যাসে নারীর প্রবল বিদ্রোহ ও আত্মজিজ্ঞাসায় প্রতিফলিত হয়েছে মানবিক চেতনায় স্নাত বাংলার অপরাজেয় রূপ। শুধু পরিপার্শ্ব নষ্ট হয়ে গেছে; কিন্তু এ মাটির উর্বরতা, প্রকৃতির শ্যামলতা অনিঃশেষ। সম্ভাবনার এই খুঁটিটিই আঁকড়ে আছে কথক-নারী; আর এ খুঁটিতেই নিহিত ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বীজ। বাঙালি মানসে যে চিরায়ত অসাম্প্রদায়িক চেতনা সক্রিয় ছিল, সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা অবসিত হয়ে আসলে বিভক্ত বাংলার পাকিস্তানের অংশ পূর্ব-পাকিস্তানে আবার সেই চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটে; যার ফলে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক কাঠামোকে অস্বীকার করে বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভূত হয় শাশ্বত বাঙালি চেতনায় ভাস্বর 'বাংলাদেশ'-এর।

১০

হাসান আজিজুল হক দেশ-কাল-রাজনীতি সচেতনতার শিল্পী। ব্রিটিশ উপনিবেশায়ন বাংলা তথা ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ভয়ানক ক্ষত সৃষ্টি করেছে আর ভারতের বি-উপনিবেশায়নেও উপনিবেশায়ন কতটা কুপ্রভাব রেখে গেছে তারই একটি শিল্প-

সমীক্ষা আমাদের আলোচ্য উপন্যাস। উপদ্রুত নারীর জীবনবীক্ষায় ঔপন্যাসিক সন্ধান করেছেন উপনিবেশিত ও উপনিবেশ-মুক্ত স্বদেশের স্বরূপ। আমাদের দেশের রক্তসিক্ত বিভক্তির উপনিবেশপোষিত রাজনৈতিক বি-উপনিবেশায়ন সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত বি-উপনিবেশায়নের অভীপ্সায় ঔপন্যাসিক করেছেন পথ-সন্ধান। রোগ সারানোর জন্য যেমন প্রথমেই রোগ-শনাক্তির বিষয়টি সবচেয়ে বেশি জরুরি, তেমনি লক্ষ্যে পৌঁছাতে তিনি আতশি পর্যবেক্ষণে ব্যবচ্ছেদ করেছেন বাংলায় উপনিবেশায়নের ধূর্ত কৌশলগুলোকে। ভারতীয় নারীর সহজাত বিপন্নতার অন্তরালে ক্রিয়াশীল চিরায়ত কল্যাণবোধ আর অশুভশক্তিকে প্রবল তেজে প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতার মধ্যেই ঔপন্যাসিক পেয়ে গেছেন সফল বি-উপনিবেশায়নের সূত্র আর বি-উপনিবেশিত দেশের সোনালি ভবিষ্যতের রূপরেখা। বিপন্ন নারী বি-উপনিবেশিত বিশ্বের কল্যাণী রাষ্ট্রের অভিব্যঞ্জনায় বিনির্মিত হয় ঔপন্যাসিকের বোধিদীপ্ত সজ্ঞায়। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে বিনির্মাণের শিল্পী হিসেবে হাসান আজিজুল হকের বিশেষত্ব এখানেই।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ *জ্যাক দেরিদা* (১৯৩০- ২০০৪) ১৯৬৬ সালে হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে উপস্থাপন করেন তাঁর বিখ্যাত বিনির্মাণ তত্ত্ব, যা বিশ শতকের ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছে। জ্যাক দেরিদার বিনির্মাণ তত্ত্ব মূলত ভাষা-সৃষ্ট অধিবিদ্যার সমালোচনা। এর মূল উদ্দেশ্য রূপান্তরহীন ধ্রুব অর্থ কিংবা ধারণাকে ভাষাচিহ্নের প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে দিয়ে অধিবিদ্যার ভিতকে নাড়িয়ে দেওয়া। এ কাজটি করতে গিয়ে তিনি উপস্থাপন করেছেন শব্দব্রহ্ম (Logos), শব্দব্রহ্মকেন্দ্রিকতা (Logocentrism), বিচ্ছেদ (Differance) আর বিনির্মাণ (Deconstruction) সম্পর্কীয় চিন্তা ও ধারণাসমূহকে।

দেরিদীয় দর্শন গড়ে উঠেছে সস্যুরের কাঠামোবাদী ভাষাদর্শনকে বিনির্মাণ করে। সস্যুর ভাষা-ব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদানকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের নিজস্ব অবচেতনে (জেনেটিক কোয়ান্টাম নক্শায়) জৈব সংগঠনের অংশ হিসেবে ভাষাসম্পর্কীয় একটি সহজাত নিয়ম ও যুক্তি অবস্থান করে; সস্যুর একে বলেছেন Langue বা ভাষাকাঠামো। অবচেতনে রক্ষিত ভাষার যুক্তি যখন ভাষাচিহ্ন হিসেবে উচ্চারিত হয় বা লিখিতরূপে ব্যবহৃত হয় তখনকার অবস্থাকে সস্যুর বলেছেন Parole বা বাক্। সস্যুরের মতে, একটি শব্দ বা ভাষাপ্রতীক প্রত্যক্ষভাবে কোনো বস্তু বা বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করে না; অর্থ উদ্‌ঘাটন করে মাত্র। এক্ষেত্রে অহং-অস্তিত্বকে নির্ভর করে একটি ভাষাচিহ্ন কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের দ্যোতক হিসেবে উপস্থিত হয় এবং দ্যোতিত হয়ে বস্তু বা বিষয়কে অর্থবোধক করে তোলে।

সস্যুর মনে করতেন, অহং-সত্তার উপস্থিতির কারণে 'উচ্চারিত ভাষারূপ' বিশুদ্ধ আর তার 'লিখিত রূপ' সর্বতোভাবে অশুদ্ধ ও বিপজ্জনক। দেরিদা একে দেখেছেন 'ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য' হিসেবে এবং 'মৌখিক ভাষা/লিখিত ভাষা'-এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের শ্রেণিমর্যাদায় লিখিত ভাষার ওপর মৌখিক ভাষার প্রাধান্যকে চিহ্নিত করেছেন 'উগ্র শ্রেণিমর্যাদা' বা violent hierarchy বলে। অথচ মৌখিক ও লিখিত ভাষার একক ও অভিন্ন উৎস হলো মানুষের অবচেতনে অঙ্কিত ধ্রুব ভাষাকাঠামো। তাই দেরিদা প্রচলিত 'মৌখিক ভাষা/লিখিত ভাষা'– এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের উগ্র শ্রেণিমর্যাদার বিচ্যুতি ঘটিয়ে মৌখিক ও লিখিত ভাষার সমান মর্যাদার কথা ভাবেন।

দেরিদার মতে, মানবিক উপস্থিতি বা অস্তিত্ব ভাষামাধ্যমেই প্রকাশিত, যা কিছু আছে তা সবই অস্তিত্বশীল কিন্তু অস্তিত্বহীনতার উপস্থিতি না থাকলে মানুষের পক্ষে অস্তিত্বকেও অনুধাবন করা সম্ভব নয়। দেরিদীয় দর্শনে, কাঠামোবাদের বহুল আলোচিত যুগ্ম-বৈপরীত্যের উগ্র বিচ্যুতি ঘটানো হলেও, কোনো একটি বিশেষ শব্দ-ধারণাকে অধিক মূল্য দেওয়া হয় না, বরং বিচ্যুত যুগ্ম-বৈপরীত্যের যে-কোনো একটি শব্দ-ধারণা'র মাঝে তার বিপরীত শব্দের ছায়া-উপস্থিতি (trace), অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বকে কেন্দ্র করে, ক্রিয়াশীল থাকে। যার ফলে মানবিক চিন্তা কোনো স্থির কেন্দ্র খুঁজে পায় না। বিনির্মাণ দর্শনে ভাষার উচ্চারিত ও লিখিত রূপের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত সম্পর্কই সম্পূরক এবং একই সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে বিনিময়যোগ্য। একটি ভাষাব্যবস্থার আওতাধীন বিভিন্ন ভাষাচিহ্ন দেশ-কাল-কেন্দ্রিক তুলনামূলক গ্রহণ-বর্জন, বিনিময়যোগ্যতা ও সম্পূরকতার নীতি অনুসরণ করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অর্থ প্রদান করে। উচ্চারিত মৌখিক ভাষায় অহং-এর উপস্থিতির কারণে কোনো ভাষাচিহ্ন আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে। আর অহং-এর গৌণ অস্তিত্বের কারণে লিখিত ভাষার ব্যাখ্যা সবসময় সময়কেন্দ্রিক এবং বিভিন্ন দেশ-কাল প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষিত হয়ে সৃষ্টি করে বহুমাত্রিক ও অসীম দ্যোতনা (endless signification)। দেরিদা এর কারণ হিসেবে শনাক্ত করেছেন যতিভেদ বা differance-কে।

বিনির্মাণতত্ত্বে ভাষার উপাদান যুগ্ম-বৈপরীত্যে ঘটে উগ্র শ্রেণি-বিচ্যুতি। যুগ্ম-বৈপরীত্যের এই উগ্র শ্রেণি-বিচ্যুতির কারণে শব্দসমূহের মধ্যে যে মুক্তক্রীড়ার সৃষ্টি হয় তারই ফলে ভাষায় কোনো স্থির কাঠামো কিংবা ভাষা-অর্থের কোনো নির্দিষ্ট উপস্থিতি থাকে না। ভাষার মুক্তক্রীড়া বা free play-ই আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারে সৃষ্টির ব্যঞ্জনা ও নান্দনিক উপলব্ধি। সাহিত্যের বেলায় দেরিদার বিনির্মাণ কাজ করবেই, কারণ সাহিত্যের নান্দনিক প্রকাশে গূঢ়োক্তি (trope), ব্যাজস্তুতি (irony), রূপকালংকার (metaphor), আংশিক উপস্থাপন (synecdoche), লক্ষণালংকার (metonomy), অতিশয়োক্তি (hyperbole), রূপান্তর (metalepsis) ইত্যাদি কাজ করে। তবে কিছু পাঠ করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে দেরিদার সেই বিখ্যাত উক্তি: 'There is nothing outside text.' একটি সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে কীভাবে বিনির্মাণ কাজ করছে এবং একটি text-র মাঝে বিনির্মাণযোগ্য কী কী উপাদান লুকিয়ে আছে তা উদ্‌ঘাটন করাও একজন সাহিত্য-সমালোচকের কাজ। [দ্রষ্টব্য: মঈন চৌধুরী ২০১২, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, নদী প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২২৭-৫২]।

২ রুশ ভাষাতাত্ত্বিক *মিখাইল বাখতিন* (১৮৯৫-১৯৭৫) প্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে উপন্যাসের নান্দনিক এককের সন্ধান করেছেন। 'জীবনের বহুস্বরন্যাস'-এর ভিতে গড়ে উঠেছে তাঁর তত্ত্বদর্শন। তাঁর তত্ত্বে জীবন ও শিল্প অভেদ মর্যাদায় অভিষিক্ত। জীবনকে তিনি বলেছেন 'উপন্যাসত্ব'। তাঁর কাছে উপন্যাস শুধু আর মাত্র একটি সাহিত্যরূপ নয়, উপন্যাসই আমাদের কালের সাহিত্যের প্রধান বিষয়। লিরিক, এপিক ও ট্র্যাজেডি – সাহিত্যের এসব প্রতিষ্ঠিত ও কাঠামো-নির্দিষ্ট ফর্মের সঙ্গে তুলনা সাপেক্ষে তিনি উপন্যাসের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রূপের সন্ধান করেছেন। বাখতিন বলেছেন, উপন্যাস এমনই এক শিল্পকর্ম, যা কোনো কাঠামোতে, কোনো কাঠামোতেই, আঁটে না। ফর্মের কাঠামো অস্বীকারের প্রয়োজনে, সাহিত্যের সীমা ও প্রচলিত বিধিনিষেধ অতিক্রমণের তাগিদ থেকেই উপন্যাসের সৃষ্টি। উপন্যাস স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, স্বাবলম্বী, ফর্মনিরপেক্ষ ও স্বক্ষেত্রে স্বাধীন।

লিরিক, এপিক ও ট্র্যাজেডিতে রচনাকারের উপস্থিতি উহ্য থাকে ফর্মের কারণেই; আবার ফর্মের প্রয়োজনেই উপন্যাসের ভেতরে ঔপন্যাসিককে কোনো না কোনোভাবে উপস্থিত থাকতে হয়। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সচেতনভাবে শব্দসংকর ঘটিয়ে একটি সংঘটন তৈরি করেন। শব্দের

সেখানে কোনো জন্মান্তর বা অর্থান্তর হয় না; বরং শব্দকে অনেক বেশি করে, প্রায় পরিত্রাণহীনভাবে অর্থের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। তারপর সেই অর্থান্তরহীন শব্দকে তার মূল অর্থসহই একটা ভিন্নতর উদ্দেশ্যে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

উপন্যাসে একটি বিষয়ের বহু পক্ষ তৈরি করে অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতিতে চরিত্রগুলোকে নিক্ষেপ করা হয়, সেই পরিস্থিতি তাকে আরো বেশি উন্মোচিত করে। নতুন নতুন আঘাতে বার বার তার ধ্যানের জগৎ পরিবর্তিত হয়। কখনো সে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে, কখনো তাও পারে না।

উপন্যাস সংলাপপ্রধান; আর সংলাপবৈচিত্র্য থেকে আসে পলিফনি বা বহুস্বরসংগতি। উপন্যাসে এমন সব উপাদানের সমাবেশ ঘটানো হয় যাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। সেই উপাদানগুলিকে নিয়ে তৈরি হয় উপন্যাসের ভেতরে সেই উপাদানগুলির বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র জগৎ। তাদের থাকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সচেতনা। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেও উপন্যাসে তাদের মূল্য সমান। এই সচেতনাগুলি শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে একটা উচ্চতর শৃঙ্খলায় বাঁধা পড়ে। স্বাতন্ত্র্য, পরস্পর-বিচ্ছিন্নতা ও সমমূল্য থেকেই উচ্চতর শৃঙ্খলা তৈরি হয়। বাখতিন একেই বলেছেন 'পলিফনিক উপন্যাসের শৃঙ্খলা'। এই শৃঙ্খলা বা পলিফনি হয়ে ওঠাটাই উপন্যাসের ফর্ম বা আধার। [দ্রষ্টব্য: তপোধীর ভট্টাচার্য ২০০৯, *বাখতিন*, এবং মোশায়েরা, কলকাতা এবং মোহাম্মদ আজম, *বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব*, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ: ৫২, সংখ্যা: ২, ২০১৫, পৃ. ২৭-৫১]

৩ দেবেশ রায়, *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৮৭
৪ সিরাজ সালেকীন, *ভারতীয় শাস্ত্রে নারীকথা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৩।
৫ হাসান আজিজুল হক, *আগুনপাখি*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৪
৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪
২৯ আমীনুর রহমান, 'ইম্পিরিয়াল থেকে পোস্টকলোনিয়ালিজম', বেগম আকতার কামাল (সম্পা.), *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, অবসর, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৯৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৩০ হাসান আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬
৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭
৩৬ অমর মিত্র, 'এপারের মানুষ ওপারের মানুষ', গল্পকথা, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩, ২০১২, পৃ. ৪৯
৩৭ হাসান আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮
৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪
৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.009

জাকির তালুকদারের ছোটগল্প : ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নিম্নবর্গীয় বাস্তবতা

মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষ ঔপনিবেশিক ও নব্য-ঔপনিবেশিক শোষণের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে প্রান্তিক ও নিম্নবর্গের বাস্তবতায় পতিত হয়েছে। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর এমন বাস্তবতা পাওয়া যায় জাকির তালুকদারের 'রাজার বাড়ি', 'পণ্যায়নের ইতিকথা', 'স্বজাতি', 'আতশ পাখি', 'কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই', 'টানাবাবা' প্রভৃতি গল্পে। অর্থ ও ক্ষমতার বাইরে থাকা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষদের ওপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চিত্রসহ শোষণ-নির্যাতনের পটভূমিতে রচিত এই গল্পসমূহ বুর্জোয়া চেতনা বিরোধী উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবধারা পুষ্ট। দলিত শ্রেণির ঐতিহাসিক ও বাস্তব জীবনরে অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ এই গল্পগুলো ' সাব-অল্টার্ন স্টাডিজে'র গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। পাঠ-বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে এই গল্পসমূহে প্রতিফলিত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নিম্নবর্গীয় বাস্তবতা অনুসন্ধান করাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান বিষয়।

চাবি শব্দ: ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী, সাব-অল্টার্ন পরিস্থিতি, ছোটগল্প, নিম্নবর্গীয় বাস্তবতা।

বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষায় সাংবিধানিক নীতি বা আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রাখলেও এখানে বসবাসরত সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া, চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরাসহ ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর অনগ্রসর মানুষ আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে জটিল এক পরিস্থিতি বয়ে বেড়াচ্ছে। ঔপনিবেশিক সময় থেকে বুর্জোয়া আধিপত্যবাদের শিকার হয়ে তারা নিজস্ব সংস্কৃতি (পরিচয়ের জমিন) থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পাশাপাশি ভূমি থেকে উৎখাত, অর্থনৈতিক শোষণসহ শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছে।[১] স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোতে একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক ভাবধারা বিদ্যমান তেমনই বিশ্বায়ন, প্রযুক্তির বিকাশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন পরবর্তী পুঁজিবাদের উত্থানের মাধ্যমে নব্বইয়ের দশক হতে নব্য-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি চালু হয়। নব্য-ঔপনিবেশিক শোষণের সূত্র ধরে বর্তমান সমাজের মূলস্রোতের বাইরে থাকা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা 'নিম্নবর্গের ভিতরে নিম্নবর্গ' হিসেবে বিবেচ্য হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের ছোটগল্পে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর উপস্থিতি নতুন নয়। আবু বকর সিদ্দিক (১৯৩৪-২০২৩), আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯), বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬-২০২০), হাসনাত আবদুল হাই (১৯৩৭), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১), রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-২০১৯), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭)-সহ অনেক লেখক ছোটগল্পের ক্যানভাসে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর জীবন-চিত্র বিনির্মাণের চেষ্টা করেছেন। তবে নিম্নবর্গ বাঙালির বিপরীতে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীকে 'নিম্নবর্গের ভিতরে আরও

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।

নিম্নবর্গ' বা Double Colonised হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে মূলত নব্বইয়ের দশক ও পরবর্তী সময়ের গল্পে। নব্য-ঔপনিবেশিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নব্বইয়ের দশকের গল্পকারগণ, বিশেষভাবে– শাহাদুজ্জামান (১৯৬০), শাহীন আখতার (১৯৬২), আকমল হোসেন নিপু (১৯৬২), সাদ কামালী (১৯৬২), ইমতিয়ার শামীম (১৯৬৫), জাকির তালুকদার (১৯৬৫), শাহনাজ মুন্নী (১৯৬৯), প্রশান্ত মৃধা (১৯৭১), অদিতি ফাল্গুনী (১৯৭৪) প্রমুখ গল্প রচনা করেন। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর জীবন ও বাস্তবতা নিয়ে জাকির তালুকদার সর্বাধিক গল্প রচনা করেন।

জাকির তালুকদার বাংলাদেশের প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক যিনি ১৯৬৫ সালের ২০ জানুয়ারি নাটোর জেলার আলাইপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন চিকিৎসক হয়েও উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধসহ অন্যান্য সাহিত্য রচনার মাধ্যমে মানবিক দায়বদ্ধতা ও অগ্রগামী চিন্তার সাক্ষর রেখেছেন। *স্বপ্নযাত্রা কিংবা উদ্বাস্তু পুরাণ* (১৯৯৭), *বিশ্বাসের আগুন* (২০০০), *কন্যা ও জলকন্যা* (২০০৩), *কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই* (২০০৬), *হা–ভাতভূমি* (২০০৬), *মাতৃহন্তা ও অন্যান্য গল্প* (২০০৭)-সহ তাঁর অনেক গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই গ্রন্থসমূহের অধিভুক্ত 'রাজার বাড়ি', 'পণ্যায়নের ইতিকথা', 'আতশ পাখি', 'কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই', 'টানাবাবা', 'স্বজাতি' প্রভৃতি গল্পে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নিম্নবর্গীয় জীবন ও বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়। মূলত এই গল্পগুলোতে প্রতিফলিত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষের জীবন ও সমাজের নিম্নবর্গীয় বাস্তবতা, ঐতিহ্য-সংস্কৃতির রূপ ও রূপান্তরসহ তাদের মুক্তির সংগ্রামের চিত্র 'সাব-অল্টার্ন স্টাডিজে'র আলোকে বিশ্লেষণ করার অপেক্ষা রাখে।

দুই

প্রচলিত ইতিহাসে শাসকশ্রেণি বা উচ্চবিত্তের প্রভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি আরোপিত থাকে বলে নিম্নবর্গের প্রকৃত ইতিহাস তুলে আনতে বিশশতকের আশির দশক হতে 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা'র (Subaltern Studies) ধারা গড়ে উঠেছে। এই ধারার মূল প্রবক্তা ইতালির দার্শনিক আন্তনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭), যিনি নিম্নবর্গের পরিচয় তুলে ধরতে ইংরেজি 'সাব-অল্টার্ন' (Subaltern) শব্দের ব্যবহার করেন। 'সাব-অল্টার্ন' শব্দটি প্রথম সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত হতো, যার আভিধানিক অর্থ 'অধস্তন'। গ্রামসির মতে, ক্ষমতার বিন্যাস অনুযায়ী প্রভুত্বের অধিকারীদের অধীনে যারা শাসিত ও নির্যাতিত হয়ে থাকে তারাই সাবলর্টান। 'সাব-অল্টার্ন' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে রণজিৎ গুহ বাংলায় প্রথম 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ব্যবহার করেন।[২] সাব-অল্টার্ন স্টাডিজের ধারণা ও কার্যাবলি এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে মার্কসীয় 'শ্রেণি-সংগ্রাম' তত্ত্ব। এই তত্ত্ব মতে, নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক স্বার্থ দ্বারা সমপর্যায়ের মানুষের মধ্যে উদ্ভূত গোষ্ঠীকে শ্রেণি বলা হয়। প্রাচীন সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমাজ বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম বিদ্যমান, যেখানে এক শ্রেণি আরেক শ্রেণির ওপরে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে।[৩] শ্রেণি-সংগ্রাম তত্ত্বের প্রবক্তা দার্শনিক কাল মার্কস মনে করেন, মানবজাতির ক্রমোন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে 'যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস'[৪] বা পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ইতিহাস। তিনি আরও মনে করেন– উৎপাদনের মূল চালিকা-শক্তি হচ্ছে শ্রম, আর

শ্রমিকের শ্রম থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত মালিক আত্মসাৎ করে আর শ্রমিক তার যথার্থ মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এই ব্যাপারে শ্রমিক যখন সচেতন হয় তখনই দুয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিকেরা শ্রেণি-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।[৫] শ্রেণি-সংগ্রামের মাধ্যমেই এক সময় নিম্নবর্গ শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রেণি-সংগ্রাম তত্ত্ব শ্রমিক ও মালিকের বিভাজনকে সুস্পষ্ট করলেও সাব-অল্টার্নিজমে নিম্নবর্গ হিসেবে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ কর্মক্ষেত্রের সকল অধস্তনের প্রতি ইঙ্গিত করে। শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে যারা শ্রমিক দ্বারা পরিবার ও সমাজে শোষিত ও নির্যাতিত (নারী বা উপার্জনহীন অক্ষম) তারাও সাব-অল্টার্ন বা নিম্নবর্গ হিসেবে বিবেচ্য।

সর্বোপরি সাব-অল্টার্ন জনগোষ্ঠীর পরিসর অত্যন্ত বৃহত্তর হলেও মার্কসীয় শ্রেণিবিভক্ত সমাজের নিম্নবর্গ জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক জড়িত। বাংলাদেশে অর্থ ও ক্ষমতার শাসনকে কেন্দ্র করে উচ্চবর্গ বনাম নিম্নবর্গের যে সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছে সেখানে অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য সর্বহারা, হরিজন ও দলিতদের নিম্নবর্গ হিসেবে দেখা যায়। অর্থ ও ক্ষমতার শাসন টিকিয়ে রাখতে উচ্চবর্গ যেভাবে তাদের ওপরে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ আরোপসহ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, সেই কৌশলকে সাব-অল্টার্ন স্টাডিজের প্রবক্তাগণ সাহিত্যে অনুসন্ধান ও উপস্থাপন করতে আগ্রহী। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষ নিম্নবর্গ হিসেবে কতটা অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য তার একটা পাঠ জাকির তালুকদারের গল্প হতে পাওয়া যাবে। তাছাড়া উচ্চবর্গ দ্বারা তারা কীভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে তার পরিচয়ও তাঁর গল্পে অনুসন্ধান যোগ্য।

সাম্প্রতিক সময়ের প্রথিতযশা গল্পকার জাকির তালুকদার ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর বাস্তবতা নিয়ে রচিত গল্পে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ বিনির্মাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করেছেন। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর বহুসংকটের অন্যতম তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখা। উপনিবেশিতের ওপরে সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের একটি প্রকল্প। সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক শক্তি বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রচার চালিয়েছে। ঔপনিবেশিক সময় থেকে তারা চিকিৎসা ও সাহায্যের নামে বাঙালিসহ ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ওপরে খ্রিষ্টধর্ম আরোপ করে সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় হারা করতে চেয়েছে। উল্লেখ্য যে–

> ব্রিটিশরা সাম্রাজ্যের অনুষঙ্গ হিসেবে মিশনারিদের কার্যক্রমকে ভারতবর্ষে উৎসাহিত করে। বলা হতো: কোনো ইন্ডিয়ান যদি খ্রিস্টধর্ম বিবর্জিত থাকে তার জন্য স্বাধীনতা অনুপযুক্ত। [...] মিশনারিদের কার্যক্রম মুসলমানদের দ্বারা বাধার আশঙ্কা ছিল। কিছু ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেছেও। তারপরও দলিত শ্রেণী ও অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর অনেককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে তারা সমর্থ হয়েছে।[৬]

উদ্ধৃতির আলোকে এবং বাংলাদেশের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বলা যায়, ঔপনিবেশিক শক্তি বাঙালিদের অল্পপরিমাণে খিষ্টধর্মের পরিণত করতে সক্ষম হলেও ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অনেকটা সফল হয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বধারা অনুসারে– বুর্জোয়া সভ্যতা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে নিম্নবর্গকে প্রান্তিক ও অধীন করে রাখে, তেমনই অর্থনৈতিক শোষণের কাজ ত্বরান্বিত করতে নিম্নবর্গের সংস্কৃতিকে প্রান্তিক দাবি করে নিজেদের কেন্দ্র হিসেবে

উপস্থাপন করে।[৭] বুর্জোয়াদের আধিপত্যবাদী কর্মকাণ্ডে নির্যাতিত নিম্নবর্গ জনগোষ্ঠী দুর্বল অর্থনীতি ও হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হয়ে নিজেদের সংস্কৃতি ছেড়ে বুর্জোয়াদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য। ঔপনিবেশিকদের রেখে যাওয়া বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামো ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ওপরে এখনও যেমন আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর রয়েছে তেমনই তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

জাকির তালুকদার রচিত 'রাজার বাড়ি' গল্পে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় হারানোর চিত্র পাওয়া যায়। এই গল্পটি বিশ্লেষণের পূর্বে একই সময়ে একই ভাবধারায় রচিত অর্থাৎ 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় হারানোর' পটভূমিতে লেখা অদিতি ফাল্গুনীর 'ব্রিংনি বিবাল' গল্প প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। এই গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে ময়মনসিংহ-মধুপুর অঞ্চলে বসবাসরত মান্দিদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও বিশ্বাসসহ বর্তমান বাস্তবতা ঘিরে। সেখানে সুররিয়ালিস্ট চৈতন্যের গতিপ্রকৃতি ও কল্পবাস্তব ভাবনার আবেশে মান্দিদের আদি ইতিহাস, তাদের বিশ্বাসে জড়িয়ে থাকা দেবদেবী, ধর্মবোধ, লোকশ্রুতি, প্রকৃতি নির্ভরতাসহ সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়। গল্পে গল্পকার প্রাবন্ধিকসত্তা দিয়ে উপস্থাপন করেন– প্রাচীন 'সাংসারেক' ধর্মের অধিভুক্ত 'আচেক' মান্দিরা প্রায় হাজার বছর আগে চীনের কিদিও অঞ্চল হতে আসাম, মধুপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল পাহাড়ি এলাকায় এসে বসতি গড়ে। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ হতে মান্দিদের ভেতরে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার হতে থাকে। মান্দিদের ধর্মীয় রূপান্তরের প্রয়োজনে পাদ্রিরা প্রথমত তাদের সংস্কৃতি ও দেবদেবীদের নিজেদের সাথে আত্মীকরণ করে। প্রসঙ্গত পাদ্রির নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য–

> মান্দি জাতি! তোমরা স্মরণ হও সেই পূতচরিত্র ফাদারদের কথা, যাহারা শত দুঃখ-কষ্ট সহিয়া মধুপুরের শালবন হইতে মেঘালয় পর্যন্ত মান্দি আদিবাসীদের ভেতর খ্রিস্টধর্মের অগ্নিশিখা প্রজ্জলন করিয়াছেন। ইতিহাসে সর্বদাই দেখা গিয়াছে, পরম পিতা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্যচারী আদিবাসী গোষ্ঠীদের ভেতরেই পাঠাইয়াছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাজক ও মারিয়াদের। [...] ইদানিং কোনো কোনো বাতুল যুবা প্রশ্ন করেন, খ্রিস্টান হইবার কারণে আমরা আমাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ভুলিতে বসিয়াছি তাহার কী হইবে? [...] জবাব দিতে আমি আমাদের প্রাচীন শস্য উৎসব "ওয়ানগালা" উপলক্ষে স্বহস্তে কিছু গান রচনা করিয়াছি। [...] কোথাও প্রাচীন উৎসবের সাথে খ্রিস্টের বন্দনা জুড়িয়া দিয়াছি, কোথাও-বা যে সকল গানে আদি পৌত্তলিক দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তব রহিয়াছে, সেইখানে দেবতার স্থলে 'শয়তান' শব্দটি বসাইয়া দিয়াছি।[৮]

এভাবে মান্দিদের দুর্বলতা, রোগ-ব্যাধি ও দারিদ্র্যকে কেন্দ্র করে পাদ্রিরা কৌশলে আত্মীকরণের নামে তাদের ধর্মান্তরিত করে খ্রিষ্টান বানিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতে স্থিত মান্দি জাতির ৯৫% খ্রিষ্টান, বাকি ৫% মাত্র তাদের প্রাচীন 'সাংসারেক' ধর্ম অবলম্বন করে আছে।[৯] আরও দেখা যায়, প্রকৃতির সাথে বসবাসকারী মান্দিরা তাদের নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি হারিয়ে নিম্নবর্গ প্রান্তিক জাতিসত্তায় পরিণত হয়েছে। ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় শাসনের পটভূমিতে মান্দিসহ অন্যান্য নৃগোষ্ঠী যেমন উপনিবেশিত ছিল, তেমনই উপনিবেশ পরবর্তী পাকিস্তান পর্বেও তারা অবদমিত, উপেক্ষিত এবং শোষিত হয়ে আসছে। স্বাধীন বাংলাদেশে তারা বাঙালিদের তুলনায় প্রান্তিক ও অবদমিত হয়ে নিম্নতর জীবনধারায় বাধ্য হচ্ছে। গল্পের শেষপর্বে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে জায়গা পেয়েছে মুক্তিযোদ্ধা প্রবীর চিরাণ মান্দি এবং তার কন্যা সালনিমা। চিরাণ মান্দি উন্মাদ অবস্থায় গলায় লাল অক্ষরে প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে ভিক্ষা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য –

> প্রবীর চিরাণের গোটা পরিবারটাই ছিল শাপগ্রস্ত। প্রবীর চিরাণের খুব সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল, যার হবু বর সিমসাং থেকে বিপাং টানতে যেয়ে আর ফিরে আসেনি। মেয়েটি পরে ঢাকায় চলে যায়, সেখানে সে পার্লারে চুল কাটে। আর প্রবীরের বউ...কে আর এত খোঁজ রাখে, আজকাল মান্দিদের জীবনও তো অনেকটা বাঙালিদের মতো ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে [...] সম্ভবত মেঘালয় চলে গেছে, কোনো আত্মীয়ের বাড়ি? [১০]

মান্দিদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মৃত্যু শুরু হয় মূলত ঔপনিবেশিক সময় হতে। গল্পে সালনিমার দুঃখ-যন্ত্রণার কাহিনির মাধ্যমে পুরো মান্দি জাতির বর্তমান করুণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে মান্দিরা ধর্ম-সংস্কৃতি ও পেশা হারিয়ে অনেকে দিনমজুর খাটে, অনেকে নগরমুখী হতে বাধ্য হয় এবং কাউকে কাউকে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়। মান্দিদের সংস্কৃতি হরণ ও শোষণের ভূমিকায় উচ্চবর্গ হিসেবে ঔপনিবেশিক শক্তির পাশাপাশি বর্তমান বাঙালি জাতিকেও গল্পে পাওয়া যায়। অদিতি ফাল্গুনীর 'ব্রিংনি বিবাল' গল্পে প্রতিফলিত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী মান্দিদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারানোর এমন চিত্র জাকির তালুকদারের 'রাজার বাড়ি' গল্পের ভূমিকা হিসেবে চিন্তা করা যায়। সমাজের মূল স্রোতের বাইরে থাকা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর বাস্তবতার পটভূমিতে রচিত 'রাজার বাড়ি' গল্পটি ঐতিহাসিক একটি গল্প। ইতিহাসের পাঠ থেকে জানা যায়– সমতলভূমিতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র-জাতি সাঁওতাল এবং ওঁরাওরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার্থে ভাসমান জাতি হিসেবে নিজেদের ভাগ্য মেনে নিয়েছে। তাদের প্রধান পেশা ছিল কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক পেশা ঘিরেই তাদের লোকজ ঐতিহ্য-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। লোকশ্রুতি আছে– সাঁওতালরা হিহিড়ী, পিপীড়ি ও হারাতা পর্বত পেরিয়ে আয়রে দেশ, কায়রে দেশ ও চাঁই দেশে আশ্রয় নিয়েছে।[১১] প্রশ্ন হচ্ছে– যাদের প্রধান পেশা কৃষি তারা কি সহজে দেশ ত্যাগ করে এখানে এসেছিল! তা অবশ্যই হতে পারে না। সাঁওতালরা মূলত স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ। তাই তারা বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, তবুও কারো দাসত্ব মেনে নেয়নি।[১২] এই সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মালপাহাড়ি ও মুণ্ডাদের ঘনিষ্ঠ জনতাত্ত্বিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

১৮৫৫-১৮৫৬ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাঁওতালরা নওগাঁ ছেড়ে মালদহে চলে যায়। পরে বুর্জোয়া জোতদারদের প্রয়োজনে ফিরে এলেও জমির মালিকানা হারিয়ে ভূমিহীন শোষিত শ্রেণিতে পরিণত হয়। সাঁওতাল বা ওঁরাওরা বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিতেও যেভাবে উপনিবেশিত হয়ে আসছে এবং বুর্জোয়া শোষণব্যবস্থা তাদের ওপর যেভাবে বিদ্যমান রয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'রাজার বাড়ি' গল্পের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে–

> ওঁরাওদের নিজ দেশ ছেড়ে এদেশে আসা পর্যন্ত ইতিহাসের সঙ্গে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ– এই সময়পর্বের জীবন-বৃত্তান্ত, বর্ণনার ভিতর দিয়ে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। কিন্তু সকল পর্বেই তাদের দুঃখ কষ্ট বেড়েছে বৈ কমে নি। চেষ্টার কমতি ছিল না ওঁরাওদের। কিন্তু পাহাড়-জঙ্গলের সরল জীবনকে বারবার তছনছ করেছে সমতলের জটিল প্রভুরা।[১৩]

জাকির তালুকদার তাঁর এই গল্পে সাঁওতাল এবং ওঁরাওদের প্রায় অভিন্ন করে আঁকলেও ওঁরাওদের স্বতন্ত্র ভাষা, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। তারা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে যুগযুগ ধরে রাজশাহী বিভাগ ও তার আশেপাশে বিস্তৃত বন-জঙ্গল ও জলাভূমি অঞ্চলে বসবাস করে। প্রকৃতির সাথে তাদের জীবনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বনের মধ্যে কুঁড়ে ঘরে তাদের বসবাস

আর বনমুরগী দিয়ে তারা 'ফাগুয়া' পার্বণ উৎযাপন করে। লাকড়া, তিগগ্যা, বিন্ডো, এক্কা, টপ্য, ক্ষেস, খাঁখাঁসহ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ওঁরাওদের ঐক্যবদ্ধ চেতনা দৃঢ়মূল রাখতে দেবতা তাদের নিজ গোত্রে বিয়ে-সাদি বারণ করেছে। তাদের জীবন কাটে অতি সারল্যে ভরা বিশ্বাস ও আন্তরিক মূল্যবোধ নিয়ে। তাছাড়া তাদের সংস্কৃতি জুড়ে আছে নানা রকম লোককাহিনি, বিশ্বাস ও দেশপ্রেম। কিন্তু ঔপনিবেশিক কৌশলে রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের প্রকৃতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে তৎপর। তাদের ওপরে নির্যাতন শুরুর বিষয়ে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি লক্ষ করা যেতে পারে–

> প্রথম প্রথম এসে আলগোছে তাদের বসতির এক কোণে বসত গড়ত এক এক ঘর মানুষ। তারা তখন খুশিই হতো। একঘর প্রতিবেশী তো বাড়ল। কিন্তু দেখা গেল তারা বড় নাক উঁচু মানুষ। ওঁরাওদের সাথে মিল-মহব্বত তো দূরের কথা তাদের মানুষ বলেই গণ্য করে না। তারা খাবলা বসায় ওঁরাওদের জমিনে। রাজার লোক, রাজার সেপাই তাদের পক্ষেই সবসময় কথা বলে।[১৪]

এভাবে রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ ও বাঙালি জনগোষ্ঠী আদিবাসীদের ভূমি কেড়ে নিয়েছে এবং ওঁরাওদের সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ওঁরাওদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ঢোলক-মাদল ও নাচ-গানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় এই মোহাজেররা হামলা চালিয়ে ছাদনাতলা, মঙ্গলঘট, সিঁদুর, শঙ্ক, আতপ চাল, ধান-দুর্বা সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। আর পুলিশ এসে কোমরে দড়ি বেঁধে তাদের মধ্য থেকে রত্নেশ্বর, রঘুনাথ, শান্তিয়াসহ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায়। ভিটেটুকু ছাড়া ওঁরাওদের যখন আর চাষের জমিও থাকে না তখন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়ক ফাদার-সিস্টাররাও নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে গল্পের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য–

> ত্রাণকর্তা হিসেবে ফাদার-সিস্টাররা আসে। দুধের কৌটা নিয়ে, ফলের রস নিয়ে, কাটা ঘাঁয়ের ওষুধ নিয়ে আর প্রভু যীশুর সুসমাচার নিয়ে। দোয়াতপাড়ায় নারদ নদের ধারে মিশন তৈরি হয়, গির্জার চূড়া দেখা যায়। সময়কে টুকরো টুকরো করে গির্জার ঘণ্টা বাজে। আর হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায় সুনীল বিন্ডো হয়ে যাচ্ছে সুনীল রোজারিও, নরেশ কিসপট্টা হয়ে যাচ্ছে নরেশ বেনজামিন, তরুদাসী খালকো হয়ে যাচ্ছে তরু মার্টিনা রোজারিও। তাদের কেউ গির্জার হাসপাতালের নার্স হয়, কম্পাউন্ডার হয়, কেউ কেউ গির্জার ব্যবস্থাপনায় দর্জিবিদ্যা শিখে আসে। বিদেশি টাকায় ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে দোকান খুলে বসে।[১৫]

ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় শক্তি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনৈতিক সংকটকে পুঁজি করে তাদের চিকিৎসা ও খাদ্য সহায়তার নামে নিজেদের ধর্মীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে নির্যাতিতদের সহায়তার নামে ধর্মান্তরিত করা বা তাদের সংস্কৃতিকে আত্মীকরণের পাশাপাশি পশ্চিমারা নিজেদের উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগের জন্য যে ক্ষুদ্র-ঋণের ব্যবস্থা করে সেই ঋণের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে দরিদ্র ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে দরিদ্র হতে থাকে। মূলত ওঁরাওদের বাস্তবতার পটভূমিতে রচিত 'রাজার বাড়ি' গল্পটি ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচেবের (১৯৩০-২০১৩) *থিংস ফল এপার্ট* (১৯৫৮) উপন্যাসের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে আছে। আফ্রিকান ইবো গোত্রের ঐতিহ্য এবং তা ধ্বংসের মতো ঘটনা এই গল্পের কাহিনিতে থাকা ওঁরাওদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

সর্বোপরি বাংলাদেশের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কাঠামোতে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া ভাবধারা বিদ্যমান থাকায় ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ওপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য ক্রিয়াশীল রয়েছে। তাছাড়া গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক হতে বুর্জোয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বিশ্বায়নের প্রভাবে তারা যেমন বিশ্বনাগরিকে পরিণত হচ্ছে তেমনই তাদের সংস্কৃতির রূপান্তর ত্বরান্বিত হচ্ছে। তাদের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের বাস্তবতায় রচিত বাংলাদেশের ছোটগল্প সম্পূর্ণত সাব-অল্টার্ন স্টাডিজের ধারার সাথে অন্বয়সম্পৃক্ত এমন দাবি করা অযৌক্তিক নয়।

তিন

অর্থ ও ক্ষমতার বাইরে প্রান্তিক জীবনধারায় অভ্যস্ত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষ ঔপনিবেশিক সময় হতে বর্তমান বিশ্বায়ন ও পুঁজিবাদের যুগ অবধি শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'এক্সক্লুডেড এরিয়া' দাবি করে পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই লেকে বাঁধ নির্মাণ করে পার্বত্যবাসীর ৪০% বসতি ও জুমচাষের জমি পানির নিচে ডুবিয়ে দিয়েছে। ১৯৭০-র দশকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে হাজার হাজার বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসিয়ে আদিবাসী-বৈরী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার নীলনকশা বাস্তবায়ন করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য–

> স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের শুরুতেই 'জাতি'র ধারণাকে একচ্ছত্রভাবে 'বাঙালি' পরিচয়ের সাথে বেঁধে ফেলাটাকেই স্বাভাবিক মনে করেছিলেন নবীন রাষ্ট্রের স্থপতিরা। বাংলা অঞ্চল যে বরাবরই বহুজাতির দেশ ছিল এবং সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশও যে এর ব্যতিক্রম ছিল না– এই উপলব্ধি হারিয়ে যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোতে।[১৬]

এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষ দীর্ঘদিন যাবৎ সংগ্রাম করে আসছে। সাংবিধানিকভাবে আদিবাসী শব্দ ব্যবহার, পৃথক ভূমি কমিশন, নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন তাদের প্রাণের দাবি। উল্লেখ্য ২০১১ সালে সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ৩২ (ক) ধারা সংযোজন করে আদিবাসী শব্দের পারিবর্তে ক্ষুদ্র-জাতিসত্তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নকল্পে সরকারি চাকরিতে কোটা সংরক্ষণ ও তাদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দৃষ্টি প্রদান সত্ত্বেও তারা নিম্নবর্গের মধ্যে নিম্নবর্গ হিসেবে বিবেচ্য। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী ইতিহাসের পাতায় অধস্তন হিসেবে উচ্চবর্গ রাষ্ট্রশক্তি, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিসহ বৃহত্তর বাঙালি জাতি দ্বারা যেভাবে নির্যাতিত, শোষিত ও অবদমিত হয়ে থাকে তার প্রকৃত স্বরূপ উপস্থাপন করা দুঃসাহসিক কাজ। জাকির তালুকদার সাহিত্যে তাদের জীবনায়ন ঘটিয়ে শিল্পের সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় রেখেছেন।

নিম্নবর্গ হিসেবে পাহাড়ি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর তুলনায় হাওর, উপকূল ও বরেন্দ্রভূমি ও অন্যান্য সমতলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা অধিক বঞ্চিত বলে অধ্যাপক আবুল বারাকাত তাঁর এক গবেষণায় মতামত প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন– ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট-বরাদ্দে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ ১১ হাজার ২৭০ টাকা, আর পাহাড়ে মাথাপিছু বরাদ্ধ ১৬ হাজার ৭২৪ টাকা।[১৭] তাছাড়া সমতলের ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠীর জন্য আলাদা কোনো মন্ত্রণালয় নেই, তাদের অনেককে ধর্মান্তরের মাধ্যমে হিন্দুত্ব গ্রহণ করানোর চেষ্টাসহ হিন্দু বলে

তাদের জমি দখল করে নেয়া হচ্ছে। জমি বেদখলসহ পানি-সংকটের কারণে তারা দরিদ্র কৃষক হিসেবেও বেঁচে থাকতে পারছে না।[১৮] সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর এই রকম বাস্তবতার পটভূমিতে রচিত জাকির তালুকদার রচিত 'পণ্যায়নের ইতিকথা' গল্পটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক শক্তির কাছে সাঁওতালরা কতটা নির্যাতিত ও প্রান্তিক তার পরিচয় পাওয়া যায় এই গল্পে। গল্পে স্থানীয় এমপির ক্ষমতার জোরে মোজাম্মেল চেয়ারম্যান দরিদ্র সাঁওতালদের পুঁজি করে নিজেদের সম্পদের পাহাড় তৈরি করে। টিকা দান, ক্ষুদ্র-ঋণসহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বিদেশি অনুদানের অর্থ নিজেরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলেও সাঁওতালদের কোনো পরিবর্তন হয় না। তারা জোরপূর্বক সমস্ত সম্পত্তি দখলে নিয়ে সাঁওতালদের নিজস্ব ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে। তাদের সাথে মিলে বাঙালি সাধারণ জনগোষ্ঠীও নির্যাতন চালায়। গল্পের একটি স্থানে তাদের মমকথা বিধৃত হয়েছে এভাবে :

> সাহেব, আমরা যে কয়দিন বেঁচে থাকি, চোঁয়ানিই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। জমি কেড়ে নেয় বাবুরা। রিলিফের চাল কেড়ে নেয়। মঙ্গার খয়রাত কেড়ে নেয়। আঙুলের টিপছাপ নিয়ে ভাগিয়ে দেয় আমাদের। পেটের খিদে নিয়ে কোথায় যাই? তখন চোয়ানি। ও-তো ভাতেরই জিনিস। ভাতও খাওয়া হলো, দুঃখ ভোলার নেশাটুকুও হলো। শুধু কি আমরাই খাই? বাচ্চাগুলো যখন খিদের জ্বালায় ট্যাঁ, ট্যাঁ করে কাঁদে, তখন চোয়ানিতে আঙুল ডুবিয়ে সেই আঙুল চোষাই বাচ্চাদের। তবেই না বাচ্চারা শান্ত হয়ে ঘুমাতে পারে।[১৯]

উদ্ধৃতিটির মধ্যে সম্বলহীন অসহায় মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন ও ভবিষ্যতের ভাবনার নিরুদ্বেগ এক পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। জীবনের সম্ভাবনায় মানুষ যখন বেঁচে থাকার মৌলিক উপকরণ খাদ্যের নিশ্চয়তাও নিশ্চিত করতে ব্যর্থ, তখন তারা শূন্যতায় ডুবে যায়। দুই-একজন সুবিধাভোগী ছাড়া পুরো সাঁওতাল জনগোষ্ঠী মূলত অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। বুর্জোয়া সভ্যতার দালাল হিসেবে সত্য মেম্বারের মতো যে দুই-একজন সাঁওতাল পরিবারের অবস্থার পরিবর্তন হয় তারা নিজেদের সাঁওতাল পরিচয় নিয়ে হীনম্মন্যতাবোধে আক্রান্ত থাকে। জাকির তালুকদারের 'স্বজাতি' গল্পেও দেখা যায়, বাঙালিরা সাঁওতাল নারী-শিশুকে ধর্ষণ করে। স্বজাতির চেতনায় উজ্জীবিত বাঙালি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ধর্ষকেরা সাঁওতালদের ওপরেই হামলা করে। সর্বোপরি বলা যায়, জাকির তালুকদার তাঁর 'পণ্যায়নের ইতিকথা' ও 'স্বজাতি' গল্পদুটির মধ্যে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নিম্নবর্গীয় করুণ বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। এখানে তারা বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিপরীতে নিম্নবর্গ হিসেবে বিবেচ্য।

নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় সাব-অলর্টান স্টাডিজের তাত্ত্বিক পর্যালোচনাসহ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্যসহ এই ধারায় আন্তনিও গ্রামসির প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মুক্তির তাড়নাজাত মার্কসীয় শ্রেণিচেতনাকে সাব-অল্টার্ন স্টাডিজে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হয়। দার্শনিক কার্ল মার্কস নিম্নবর্গের শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, আর্থ-সামাজিক অচলায়তন বিনাশে বিপ্লবী শ্রেণিগুলোর সংগ্রাম আবশ্যক। অন্যভাবে বলা হয়, শ্রেণিচেতনার মাধ্যমে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সর্বহারাদের মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ।[২০] গল্পকার জাকির তালুকদার এরকম মার্কসীয় ভাবনার আলোকে নিম্নবর্গীয় নির্যাতিত বাস্তবতা থেকে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষের মুক্তির পথক্রম নির্মাণ করেছেন তাঁর

'টানাবাবা' গল্পে। আসলে জাকির তালুকদার মার্কসীয় দর্শন-পরিস্রুত বামপন্থি চেতনার একজন মানুষ।[২১] ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ওপরে নানা অত্যাচার-নির্যাতনের বাস্তবতাসহ তাঁর গল্পের অন্তঃস্রোতে প্রগতিশীল, সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসীয় চেতনাজাত বক্তব্য লক্ষ করা যায়। 'টানাবাবা' গল্পে শোষিত সাঁওতালদের শ্রেণিচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে যতীন সরেন অত্যন্ত শ্রেণিসচেতন একটি চরিত্র। বুর্জোয়া শাসকদের প্রতিভূ চেয়ারম্যানের দাসত্ব বরণ করে সে একসময় অনুভব করে, খাকি উর্দি পরে যেদিন থেকে সরকারি কর্মচারি হিসেবে দফাদার পদে যোগ দিয়েছে, সেদিন থেকে সাঁওতাল সমাজ থেকে সরে গিয়ে সে বাঙালি চেয়ারম্যানের গোলাম হয়েছে। তার মধ্যে শ্রেণিচেতনা তৈরির পর গোলামি অস্বীকার করে এক সময় গায়ের খাকি উর্দি টান দিয়ে পটাপট ছিঁড়ে অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে। এভাবে গল্পের কাহিনিতে নিম্নবর্গ সাঁওতালদের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় উপস্থাপনের মাধ্যমে গল্পকার মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রামের গুরুত্ব উপস্থাপন করেছেন। মার্কসবাদী শ্রেণিচেতনার সাথে একাত্ম হয়ে দার্শনিক আন্তনিও গ্রামসি নিম্নবর্গের মুক্তির জন্য সংঘবদ্ধ বিপ্লবের কথা স্বীকার করেছেন; তবে তাঁর মতে বিপ্লব সৃষ্টির বিষয়টি অতটা সরল নয়। কারণ নিম্নবর্গের বৃহত্তর সীমাবদ্ধতা হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা। নিম্নবর্গ যখন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের শিকার হয়ে উচ্চবর্গের অধীনে কুণ্ঠিত হয়, তখন তার বিদ্রোহীসত্তা থেকে শুরু করে চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি অবদমিত, খণ্ডিত ও নির্জীব থাকে।[২২] এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেনি বলে চেয়ারম্যানের নির্দেশে মহৌষধ হাতে পাওয়ার জন্য (সন্তানদানে অক্ষম মেয়ের সন্তান লাভের) যতীন সরেনকে চরকের বর্শির সাথে ঝুলে ঘুরতে হয়। অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল হওয়ায় যতীন সরেনের প্রতিবাদের ভাষা থাকে অবদমিত, ভীত ও শঙ্কিত। জাকির তালুকদার ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠীর নির্জীব ও ভীত সত্তার পরিচয় নির্মাণ করে তাঁর 'আতশপাখি' গল্পটিকে তাৎপর্য মণ্ডিত করে তুলেছেন। ১৯৪৫ সালের তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস সন্নিবেশ করে রচিত গল্পটির মধ্যে সাঁওতাল কৃষকদের ওপরে বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক শোষণের বর্তমান বাস্তবতাসহ তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্র পাওয়া যায়। এই গল্পে নিম্নবর্গ বাঙালি ও সাঁওতালদের অভিন্ন বাস্তবতার বিপরীতে শোষকশ্রেণির প্রতিভূ হিসেবে মহাজন ও জোতদারদের পাওয়া যায়। গল্পের কাহিনিতে দেখা যায়– 'খাসজমিগুলো বেআইনীভাবে দখল করে রেখেছে জোতদারেরা। এগুলোর আসল হকদার ভূমিহীন ক্ষেত মজুরেরা।'[২৩] খাসজমি পুনরুদ্ধারের জন্য মার্কসবাদে দীক্ষিত এক যুবক শহর থেকে গ্রামে গিয়ে সাঁওতালপল্লি ও আশেপাশের ভাগচাষী কৃষকদের সমন্বিত করে আন্দোলন গড়ে তুলতে চায়। গল্পকথক সাঁওতাল পল্লির সিধুবুড়া অনুভব করে– এটা নাচোল, গোদাগাড়ি, ফরাদপুর ও সাঁওতাল পল্লির প্রত্যেক ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের প্রাণের কথা। তবে তাদের আন্দোলন-সংগ্রামের ফলাফল কী হতে পারে তেভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে তা মূল্যায়ন করতে চায়। তার অনুভবের আলোকে বিপ্লবী ছেলেটির পরিণতি (জোতদারের কারণে ছেলেটির লাশ মহানন্দার জলে ভাসে) পরিলক্ষিত হলেও ছেলেটির নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রেরণা নিয়ে সাঁওতাল কৃষক কার্তিক, কালিয়া, নিতাই, যোসেফসহ কৃষকেরা জেগে ওঠে। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সংগ্রামী চেতনা দানা বাঁধতে থাকে তাদের হৃদয়ে। যা দেখে–

> ঝিরঝির করে আশ্বাসের পরশ লাগল সিধুবুড়োর বুকে। আছে! আছে! এদের চোখেও আছে সেই পবিত্র আগুনের নাচানাচি। ছেলেটা, সেই জেদী বেপরোয়া সোনার মতো ছেলেটা মরার আগে তার বুকের আগুন জ্বালিয়ে রেখে গেছে ওদের বুকেও। নিজের ঘোলা চোখেও আগুনের সোনারঙ শিখা ঠিকই দেখতে পেয়েছে সিধুবুড়ো।[২৪]

নিম্নবর্গ কৃষকদের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সর্বহারার অধিকার প্রতিষ্ঠায় মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রামের সূত্র এগিয়ে নিয়ে গেছেন গল্পকার। মার্কসবাদী শ্রেণিচেতনার মাধ্যমেই সমন্বিত শক্তি ভূমিমালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেয়। তবে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে সিধুবুড়া প্রথম পর্যায়ে শঙ্কিত থাকে। ছেলেটি যখন গ্রামের নিম্নবর্গ মানুষকে একত্র হওয়ার কথা বলে তখন সিধুবুড়োর মধ্যে নির্জীবতা কাজ করে। গ্রামসির দেখানো নিম্নবর্গের অবদমিত বাস্তবতার সূত্র ধরেই সিধুবুড়োর ভাবনা সত্যি হয় এবং বুর্জোয়াদের হাতে ছেলেটির মৃত্যু ঘটে। তাই বলা যায়, উল্লিখিত গল্পসমূহে নিম্নবর্গ হিসেবে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী যখন শোষিত ও নির্যাতিত হতে থাকে তখন কিছু চরিত্র মার্কসবাদী শ্রেণিচেতনায় সচেতন হয়ে ওঠে।

চার

ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হারা করে উপনিবেশিত করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক শোষণ ও অবদমন। মার্কসীয় ধারণামতে সমাজের সবকিছুর মূলে অর্থনীতি বিদ্যমান। তবে গ্রামসি দেখিয়েছেন, উচ্চবর্গ কর্তৃক নিম্নবর্গের ওপরে আধিপত্য বিস্তারের কৌশলটি কেবল ক্ষমতা ও অর্থনীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। বুর্জোয়া শক্তি নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও চিন্তাভাবনা চাপিয়ে দিয়ে নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক ও চৈতন্যগত রূপান্তর ঘটিয়ে থাকে।[২৫] সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ চাপিয়ে শোষণের পথ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে গ্রামসি 'হেজিমনি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হেজিমনিক কৌশলে আবদ্ধ নিম্নবর্গ জাতি বুর্জোয়াদের দৃষ্টিতে নিজেদের দেখতে এবং নিজেকে তাদের অধস্তন মনে করতে শেখে। এই অধস্তনতার মধ্য দিয়ে এক সময় যখন নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পেশা সম্পর্কে হীনম্মন্যতাবোধ তৈরি হয়, তখন উপায় হারিয়ে অসহায় মানুষেরা নিজে থেকেই নিজেদের শাসন ও পরিচালনার ভার বুর্জোয়াদের ওপরে অর্পণ করে এবং শোষিত হতে প্রস্তুত থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে–

> The Concept of hegemoni is really a very simple one. It means political leadership based on the consent of the led, a consent which is secured by the diffusion and popularization of the world view of the rulling class.[২৬]

ঐতিহ্য রক্ষা বা অধিকার আদায়ের প্রয়োজনে মাঝে-মধ্যে শোষিত জনগোষ্ঠী প্রতিবাদী হয়ে উঠলেও হেজিমনিক কৌশলে পরাস্ত জাতি এই প্রতিবাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে না। ফলে তারা অনেকটাই নির্জীব সত্তায় পর্যবসিত হয় এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতির আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়। নব্য-ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষ শ্রেণিশত্রুকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা হারিয়ে নির্জীব সত্তায় পরিণত হয়ে যেভাবে 'নিম্নবর্গের ভেতরে নিম্নবর্গ' জীবন কাটাতে বাধ্য হয় তার পরিচয় পাওয়া যায় শাহীন আখতারের 'আস্‌তান' গল্পে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিন্দুবালার মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর একজন নারীর প্রান্তিক অবস্থান সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে, যেখানে তার

বিপরীতে সমাজের মূলধারায় বসবাসকারী নারীদের পাওয়া যায়। এই গল্পের মতো জাকির তালুকদারের 'কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই' গল্পে দুর্বল অর্থনীতি নিয়ে ক্ষমতার বাইরে থাকা নিম্নবর্গ চাকমা নারী ও চাকমা জনগোষ্ঠীর ওপরে চলা শাসন-শোষণসহ তাদের নির্জীব ও প্রতিবাদী সত্তার পরিচয় রয়েছে। গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে ১৯৯৬ সালের 'হিল উইমেন্স ফেডারেশনে'র সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমার অপহরণ বিষয়ক ঐতিহাসিক[২৭] বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে। গল্পে দেখা যায়, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কাপ্তাই বাঁধের মাধ্যমে প্রায় চুয়ান্ন হাজার একর চাষের জমি জলমগ্ন করে চল্লিশ হাজার পরিবারকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করা, পাবর্ত্য চট্টগ্রামকে 'এক্সক্লুডেড এরিয়া'র অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, বাঙালিদের দিয়ে সম্পত্তি দখল এমনকি তাদের ওপরে সেনাবাহিনীর কঠোর নির্যাতন আর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে কল্পনা চাকমা। উচ্চবর্গ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে কল্পনা চাকমার প্রতিবাদী চেতনার সাথে গল্পকার মার্কসবাদী চেতনাসদৃশ ভাবনা জুড়ে দিয়ে গল্পের বর্ণনায় উল্লেখ করেন–

> রাজা জানে না, কল্পনা প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। নিজের সমস্ত শরীর-মনে বিষ মিশিয়ে রেখেছিল। পাহাড়-জঙ্গলে প্রতি মূহূর্তে তৈরি হয় এই বিষ। সবচেয়ে মারাত্মক বিষ নিপীড়িত আত্মার অভিশাপ। এই বিষ তার কাজ করবেই। দেরিতে হলেও।[২৮]

চাকমা সম্প্রদায়ের ওপরে সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, লুণ্ঠনের তথ্য বিদেশি তদন্ত দল যাচাই করতে গেলে জান্তা সদস্যরা তদন্ত রিপোর্টকে মিথ্যা ও ভুল বলে প্রমাণ করতে চায়। কল্পনা চাকমা তার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে; যে প্রতিবাদের সূত্র ধরে 'রাজার সেপাইরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। আর রাজা তাকে হাড়-মাংস-চুল-নখসহ গিলে খায়।'[২৯] মূলত চাকমারা ঐতিহ্য-সংস্কৃতিতে স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর হলেও নব্য-ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় হেজিমনিক কৌশলের কাছে পরাস্ত হয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হতে হচ্ছে। কখনও কখনও তাদের মধ্যে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় পরিলক্ষিত হলেও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, মানসিক হীনম্মন্যতাবোধ ও হেজিমনির আবর্তে দিশেহারা হয়ে আন্দোলনের বীজকে তারা দানায় পরিণত করা থেকে ব্যর্থ হয়ে থাকে। তাদের হীনম্মন্যতাবোধ ও নির্জীবতার এমন পরিচয় পাওয়া যায় 'কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই' গল্পের শুরুতেই–

> রঙরাঙা মানে কোলাহলের পাহাড়। সেই পাহাড়ের উপত্যকা এখন নিথর। মানুষগুলো এখন চলাফেরা করে খুবই নিঃশব্দে। যেনো তারা ভয়ে ভয়ে থাকে তাদের পায়ের শব্দে অচেনা কোনো দৈত্যের ঘুম ভেঙে যাবে। মানুষগুলোর মুখে এমনভাবে লেপ্টে থাকে বিষাদ, মনে হয় তারা বিষাদ ও দুঃখের চিরস্থায়ী মুখোশ এঁটে রেখেছে মুখে। দেবশিশুর মতো বাচ্চাদের ঘুমপাড়ানোর সময় বাঘডাঁশ কিংবা ভূতের ভয় দেখানোর প্রয়োজন পড়ে না। জন্ম থেকে বড়োদের [...] জড়োসড়ো থাকতে দেখে এরাও ভয় পাওয়া শিখে গেছে।[৩০]

দেখা যায়, নব্য-ঔপনিবেশিক শোষণ, পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের জাঁতাকলে চাকমা জাতিগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও নিজস্ব ভূমি হারিয়ে বর্তমান সময়ে অনেকটা নির্জীব ও শান্ত। তাদের ওপরে উচ্চবর্গের শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের চিত্র অভিন্নপ্রায় বাস্তবতা নিয়ে উঠে এসেছে জাকির তালুকদারের ছোটগল্পে, যেখানে বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তির আওতায় তারা প্রকৃত সাব-অল্টার্ন বা 'নিম্নবর্গের ভিতরে নিম্নবর্গ' হিসেবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়ে আসছে। রাষ্ট্রশক্তির পাশাপাশি

সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর ওপরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগসহ যেভাবে আগ্রাসন চালিয়ে সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে, তা অনেকটা গ্রামসি নির্ধারিত হেজিমনিক কৌশলসদৃশ। সর্বোপরি জাকির তালুকদার তাঁর গল্পে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি বিনির্মাণের পাশাপাশি তাদের প্রান্তিক অবস্থানের পরিচয় সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, প্রান্তিক নিম্নবর্গ হিসেবে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক পরম্পরা হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশেও আর্থ-সামাজিকভাবে নির্যাতনের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। কিন্তু এর প্রতিবাদে তারা অনেকটাই নির্জীব ও ক্লান্ত।

পাঁচ

ঔপনিবেশিক পরম্পরা হয়ে আসা স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিতে বিদ্যমান বুর্জোয়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মানুষদের নিম্নবর্গ হিসেবে অধঃপতিত ও নির্যাতিত হতে হচ্ছে। নব্বইয়ের দশকের কাল ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনপরবর্তী পুঁজিবাদের উত্থান, বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি বিকাশের ফলে পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে চাকমা, মারমা, গারো, সাঁওতাল, কোচ, মান্দি প্রভৃতি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী মিশ্র জীবনধারা ও মিশ্র জীবনবোধে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের গল্পকার জাকির তালুকদার তাঁর গল্পে ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অতীত ঐতিহ্যসহ রূপান্তরমূলক সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ও বর্তমান বাস্তবতা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

জাকির তালুকদার তাঁর কয়েকটি গল্পে দেখিয়েছেন যে, বাঙালি সমাজের মূল স্রোতের বাইরে থাকা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী মূলত নিম্নবর্গ বাঙালির তুলনায় প্রান্তিক, অবদমিত এবং দলিত। নিম্নবর্গ ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর বিপরীতে উচ্চবর্গ হিসেবে অত্যাচারী ও শোষকের ভূমিকা নিয়েছে দালাল, মহাজন, ভূমির-মালিক, প্রশাসক, রাজনীতিবিদ, মিশনারীসহ বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতিভূরা। বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজের মূল স্রোতে থাকা নিম্নবর্গ বাঙালি জনগোষ্ঠীও তাদের ওপরে আধিপত্যবাদী মনোভাব প্রয়োগ করে শোষণ-নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়েও ক্ষুদ্র-জাতির মানুষেরা উচ্চবর্গ দ্বারা শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বহুমুখী নির্যাতনের শিকার। উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রশক্তিই এই প্রান্তিক নিম্নবর্গ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করে নির্যাতনের পথ প্রশস্ত করে রেখেছে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে মার্কসীয় ভাবধারাপুষ্ট বিচ্ছিন্ন কিছু প্রতিবাদের চিত্র বিনির্মাণ করলেও বাস্তবতার পথ ধরে হাঁটতে গিয়ে গল্পকার বলিষ্ঠ কোনো প্রতিবাদের চিত্র উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি।

সাব-অল্টার্ন স্টাডিজের প্রবক্তাগণ মনে করেন– শাসন ও নিষ্পেষণের কবলে সহায়-সম্বলহীন নিরুপায় মানুষগুলো হেজিমনির শিকার হয়ে নিজেদের শোষণের পথকে অবারিত করে দেয় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভাষা-শক্তি হারিয়ে নির্জীব সত্তায় পরিণত হয়। জাকির তালুকদারের গল্পসমূহেও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাবে সহায়-সম্বলহীন ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর অসহায়ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়। ক্ষমতা ও কেন্দ্রের বাইরে থাকা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী যদি কখনও

অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে প্রবৃত্ত হয় তখন স্বয়ং রাষ্ট্রযন্ত্রই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে তৎপর হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রনীতি, পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার জটিল ও কঠিন আবর্তে দিশেহারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে জড়িয়ে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নির্জীব ও নিঃশেষিত অবস্থা লক্ষ করা যায় জাকির তালুকদারের গল্পে। পরিশেষে বলা যায়, জাকির তালুকদার ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, তাদের ওপরে চালানো শোষণ-শাসন, স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহ্য হারানোর চিত্রসহ সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বাস্তবচিত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের যে অভীপ্সা উপস্থাপন করেছেন– তা উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা সমৃদ্ধ এবং নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ধারায় গুরুত্ববহ।

তথ্যনির্দেশ

১ প্রশান্ত ত্রিপুরা, 'অস্তিত্বের জমিন যখন লুটেরাদের দখলে', *বহুজাতির বাংলাদেশ: স্বরূপ অন্বেষণ ও অস্বীকৃতির ইতিহাস*, সংবেদ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪২-৪৮

২ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (সম্পাদক: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়), আনন্দ প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২-৪

৩ অনুপ সাদি, *মার্কসবাদ*, ভাষা প্রকাশ, ঢাকা ২০১৬, পৃ. ৩৩

৪ মার্কস এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', *মার্কস এঙ্গেলস রচনা সংকলন* (১ম খণ্ড), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ২৬

৫ ভ. কেল্লে ও ম. কোভালসন, *মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের রূপরেখা*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫, পৃ. ২৪৭-২৫০

৬ ফখরুল চৌধুরী, 'উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি', *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ* (সম্পাদক: ফখরুল চৌধুরী), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৯-২০

৭ এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাইদ, 'অরিয়েন্টালিজম' (অনুবাদ: আমীনুর রহমান), পৃ. ১৪২-১৫১

৮ অদিতি ফাল্গুনী 'ব্রিংনি বিবাল', *ইমানুয়েলের গৃহপ্রবেশ*, উড়কি প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৭৩-৭৪

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

১০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

১১ মুহম্মদ আবদুল জলিল, *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯১, পৃ. ১-৯

১২ জাকির তালুকদার, ওয়েব সাইট: https://roar.media/bangla/main/art-culture/santal-people-and-their-culture, ২০১২ (Acceed: 13 June 2019)

১৩ শামীম নওরোজ, 'জাকির তালুকদারের ছোটগল্প: জীবনের আখ্যান', *আবহ* (সম্পাদক: নাজমুল হাসান), জাকির তালুকদার সংখ্যা, নাটোর, ২০১৩, পৃ. ৮১

১৪ জাকির তালুকদার, 'রাজার বাড়ি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩।

১৬ প্রশান্ত ত্রিপুরা, "জাতির কী রূপ: বাঙালির 'নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' ও 'হাজার বছরের ইতিহাস' পর্যালোচনা", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

১৭ জানুয়ারি ১৬, ২০২৩, *প্রথম আলো*, ওয়েব সাইট: https://www.prothomalo.com/bangladesh/1asxzyiajf

১৮ প্রাগুক্ত

১৯ জাকির তালুকদার, 'পণ্যায়নের ইতিকথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬

২০ ভ. কেল্লে ও ম. কোভালসন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭-২৫০

২১ শামীম নওরোজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

২২ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

২৩ জাকির তালুকদার, 'আতশপাখি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

২৫ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

২৬ R. Bates Thomas, 'Gramsci and the Theory of Hegemony', *Journal of the History of Ideas,* Vol. 36, No. 2, 1975, p. 351

২৭ অবিভক্ত 'হিল উইমেন্স ফেডারেশনে'র সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমা নারী ও উপজাতিদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে কাজ করতেন। ১৯৯৬ সালের ১১ জুন মধ্যরাতে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার নিউ ল্যাইল্যাঘোনার নিজ বাড়ি থেকে তাকে অপহরণ করা হয়। এই নিয়ে তখন জাতীয় দৈনিকগুলোতে বেশ লেখালেখি হয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠে। কল্পনা চাকমার অপহরণের বিষয়ে তার পরিবার থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্যকে অভিযুক্ত করে আসা হলেও গত ২৩ বছরেও কারো কোনো বিচার হয়নি এবং এই মামলার তদন্ত এখনও শেষ হয়নি।

২৮ জাকির তালুকদার, 'কল্পনা চাকমা ও রাজার সেপাই', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.010

গ্রন্থ-পর্যালোচনা

মনসুর মুসা, *পাণিনি, চমস্কি ও তারপর*, প্রকাশক : মধ্যমা মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, মূল্যঃ ৪০০ টাকা, পৃ. ২৬১

'পাণিনি, চমস্কি ও তারপর' গ্রন্থটি মনসুর মুসা কর্তৃক রচিত ভাষাবিষয়ক একটি প্রবন্ধ সংকলন। এটি মূলত তাঁর আলোচনা, সমালোচনা, বক্তৃতা ও লেখার সংকলন।

বইটির নামকরণ থেকে আমরা অবগত হতে পারি যে, এখানে ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশ এবং প্রসারণের বিভাগকে ত্রিমাত্রিকতায় বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন– একদিকে আছে বৈদিক ঐতিহ্যের ধীমান সাধক পাণিনি। অন্যদিকে আছে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তীক্ষ্ণধী দিক-নির্দেশক নোয়াম চমস্কি (১৯২৮- বর্তমান)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাষানুসন্ধানের জগতে, এই দুজন পণ্ডিত সর্বাধিক পরিচিত। এবং এই দুজন ব্যক্তির পথ-নির্দেশনায় বা তাঁদের অনুসরণে তৈরি হয়েছেন অনেক জ্ঞানপিপাসু, অনুসন্ধিৎসু গবেষক, বিজ্ঞানী যারা ভাষাবিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ধারাকে সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য ভাষায় তুলে ধরেছেন।

বইটির সামগ্রিক আলোচনায় আসলে প্রথমেই 'ভূমিকা নয়, উপকথন' নামকরণটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এতে লেখকের অনুশীলন, শব্দগঠন, শব্দ ব্যবহার এবং ভাষা ব্যবহারের সূক্ষ্ম ভাব-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আঙ্গিক গঠনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি বইটি মোট ৬টি পর্বে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পর্ব বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পর্ব ৬টি যথাক্রমে– ব্যাকরণ ও বৈয়াকরণ, ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব, ভাষা-ভাবনা, উপভাষা ও ভাষারীতি, প্রযুক্তি ও ভাষা, বিবিধ বিষয় এবং সর্বশেষ অংশে আছে নির্ঘণ্ট।

'উপকথন' অধ্যায়টিতে আমরা লক্ষ করি, ভাষাবিজ্ঞান চর্চা, ভাষাবিজ্ঞান সংবলিত বিষয়াদি, বৈয়াকরণিক জ্ঞানের ভিত্তি গড়ে ওঠার প্রাথমিক মাধ্যমগুলোর সাবলীল বর্ণনা। সর্বপ্রথম লেখক পাণিনির নাম শুনেছিলেন তাঁর শিক্ষক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অনুশীলন ক্লাসে। এভাবে ক্রমান্বয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাগ্রহণের তাগিদে গিয়ে জানতে পারেন প্রাচীনকালের আরো অনেক ব্যাকরণবিদকে। তিনি ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব পড়তে গিয়ে সেখানে জানতে পারেন বৈয়াকরণ জগতের দিকপাল নোয়াম চমস্কির সম্পর্কে।

'ব্যাকরণ ও বৈয়াকরণ' পর্বে মোট ৭টি পর্ব রয়েছে। প্রবন্ধ ৭টি যথাক্রমে 'পাণিনি ও তাঁর ভাষাচিন্তা', 'পাণিনি ও বাঙলা ব্যাকরণ', 'বৌদ্ধ সংস্কৃত ধারণার পুনর্মূল্যায়ণ', 'ভাষাবৃত্তি', 'অমরকোষ পরিচিতি', 'নতুন বাংলা ব্যাকরণঃ আলোচনা চক্র', 'বাংলা নতুন ব্যাকরণের কথা'।

প্রবন্ধগুলোর নামকরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, সেই পাণিনির যুগ থেকে ক্রমান্বয়ে ভাষার গতিবিকাশের যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার মাধ্যমে প্রবন্ধগুলো রচিত হয়েছে। আমরা জেনেছি যে, পাণিনি বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ ছিলেন। বেদের ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রেষণা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনায়। এটি ভাষার ব্যাকরণ। 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ ৪৯৯৬টি সূত্রে গ্রথিত। তবে পাণিনির ব্যাকরণ ভাষা সংক্রান্ত হলেও ধর্মীয় বিরোধের কারণে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা এটিকে গ্রহণ করতে চাননি। কিন্তু পরবর্তীকালে কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরি প্রমুখ পণ্ডিত এ বিষয়ে কাজ করেছেন। এবং কাজটি করেছেন পাণিনির ভাষাচিন্তা উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে।

যেহেতু পাণিনির ব্যাকরণ ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে একটি অত্যাশ্চার্য মানব মনীষার নিদর্শন; তাই এর সূত্রগুলোকে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও গবেষণা করার মাধ্যমে পাণিনির ভাষা সংক্রান্ত চিন্তাগুলোকে অনুধাবন করা জরুরি। আর সেটা আমরা এই গ্রন্থটিতে লক্ষ করি।

'পাণিনি ও বাঙলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে জানা যায় বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নির্মাণে পাণিনির অবদান সম্পর্কে। এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী'তে মোট ৩০৫টি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনাকে ৩৯৯৬টি সূত্রে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন।

ধ্বনিরূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে (Morpho-phonemic Domain) পাণিনি প্রবর্তিত এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসৃত গুণ ও বৃদ্ধির নিয়ম বাংলা ব্যাকরণের শব্দগঠন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় রেখেছে। আমরা যে বাংলায় বিশেষ্য থেকে বিশেষণ নির্মাণের কৌশল প্রসঙ্গে 'ইক' প্রত্যয় যোগ করি, সেই কাজে সংস্কৃত তথা পাণিনি নির্মিত সূত্র দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

'বৌদ্ধ সংস্কৃত: ধারণার পুনর্মূল্যায়ন' প্রবন্ধটিতে লেখক 'বৌদ্ধ সংস্কৃত' নামটি কে দিয়েছে, এর উৎপত্তি কোথা থেকে সেই সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন– বৌদ্ধ-সভ্যতার বিস্তার, বৌদ্ধ মতবাদের সম্প্রসারণ, হিউয়েন সাঙ এর দেখা ভারত এবং তিনি কোন ভাষায় কথা বলতেন, একেশ্বরবাদের সূচনা, সাংকার্য ও সংস্কৃতায়ন, ভাষা-পরিস্থিতি ও নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশনা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জিজ্ঞাসা, বৌদ্ধযুগের লিপিতাত্ত্বিক অবস্থা, সমকালীন পরিস্থিতির অনুরূপতা, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও এডগারটন, সংবিধিবদ্ধ ভাষার অনুকৃতি সম্পর্কে।

'সাংকর্য ও সংস্কৃতায়ণ' উপ-অধ্যায়ে লক্ষ করি গুপ্তযুগে (৩২০-৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ), পালযুগে (৭৫০-১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ) এবং সেনযুগে (১০৭০-১২৩০) এ অঞ্চলে ভাষা সাংকার্য ও ভাষা প্রমিতায়ন এই দুটি ব্যাপার ঘটেছিল ব্যাপকভাবে। বঙ্গদেশের গ্রামের নামকরণে ব্যাপক সংস্কৃতায়ন প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন– শ্রীনগর, শ্রীমঙ্গল, শ্রীহট্ট, প্রাগজ্যোতিষপুর, বর্ধমান, কর্ণ-সুবর্ণ, পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, গোকর্ণ ইত্যাদি। নদীর নামকরণেও এই সংস্কৃতায়নের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন– ময়ূরাক্ষী, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র, সুবর্ণরেখা, কর্ণফুলী, কপোতাক্ষ। বৌদ্ধবিহারগুলিও সংস্কৃতমুখী।

'বৌদ্ধ সংস্কৃত: ধারণার পুণর্মূল্যায়ন'– প্রবন্ধটির শেষের দিকে এসে 'বৌদ্ধ সংস্কৃত' এই নামটির জট আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। দেখা যায় যে, বৌদ্ধ সংস্কৃতের কোনো সমকালীন অস্তিত্ব ছিলনা। এ নামে কোনো রীতি প্রচলিত ছিল না। ধারণাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক প্রখ্যাত পণ্ডিত এডগারটনের উদ্ভাবনা। সুতরাং ঐতিহাসিক দিক থেকেই বৌদ্ধ সংস্কৃতে এই সম্প্রত্যায়ের কোনো অস্তিত্ব নেই।

সুতরাং, এডগারটন যে Buddhist Hybrid Sanskrit রীতির কথা বলেছেন, সেই রীতি ওই যুগের বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। তিনি সংকর কথাটি বলেছেন। এই কথাটিও সামাজিক উপভাষা কথাটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, ভাষা যখন কোনো নতুন পেশায় বা নতুন কাজে বা নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু শব্দ মূল রীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে সম্ভবত তা-ই হয়েছিল। অর্থাৎ 'বৌদ্ধ সংস্কৃত' কোনো নতুন ভাষা নয়; পাণিনি নির্ধারিত সূত্রাবলির বিলোপ, সম্প্রসারণ ও সংযোজনের ফলেই এই রীতি গড়ে উঠেছে। এটি একটি উপভাষা।

'ভাষাবৃত্তি'-তে আমরা দেখি লেখক ভাষাবৃত্তি সম্পর্কিত অনেক আলোচনা করেছেন এবং এ কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত পণ্ডিতগণের কাজ উল্লেখ করেছেন। 'ভাষাবৃত্তি' বলতে আমরা সাধারণ অর্থে বুঝে থাকি– ভাষার যা উদ্দেশ্য তাই ভাষাবৃত্তি। অর্থাৎ এটি কোনো মৌলিক ব্যাকরণ নয়। এটি পাণিনির 'অষ্ট্যাধ্যায়ী' নামক ব্যাকরণের টীকাভাষ্য।

শিক্ষার সাথে ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর ভাষাচিন্তা যখন থেকে মানুষের উপলব্ধির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন থেকেই ভাষার প্রসঙ্গ আসে। আর তখনকার দিনে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা, বিশেষ করে বামন– জয়াদিত্য, জিনেন্দ্র বুদ্ধ, মৈত্রেয় রক্ষিত এবং পুরুষোত্তম দেব বৈয়াকরণ হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী কলেজের সংস্কৃতের সিনিয়র প্রফেসর শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী 'ভাষাবৃত্তি' নিয়ে কাজ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী 'কাশিকারঞ্জন বৃত্তি' সম্পাদনা করেছিলেন। এটি সম্পন্ন করার পর আমরণ অনশন শুরু করেন এবং ৭ দিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভাষা সম্পর্কে মানুষের যত আগ্রহ তৈরি হতে লাগলো ততই মানুষ ভাষা চর্চা শুরু করলো এবং একটি ভাষার সাথে আরেক ভাষার সম্পর্ক নিরূপণ করা শুরু করলো। নতুন নতুন শব্দকোষ মানুষকে ভাষার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুললো। সেটা শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিদেশীদের মাঝেও ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করলো। তেমনি নজির পাই আমরা লেখক মনসুর মুসার *পাণিনি, চমস্কি ও তারপর* বইটিতে।

'নতুন বাঙলা ব্যাকরণ: আলোচনা চক্র'-তে দেখা যায়–

একজন ভাষাবিজ্ঞানী ড. হানেরুথ ঠম্পসনের বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহকে বর্ণনা করেছেন। কীভাবে হানেরুথ ঠম্পসনের মনে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় তার সুনিপুণ বর্ণনা পাওয়া

যায় এখানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউটের মিলনায়তনে একটি কথাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই কথাচক্রে সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন মনসুর মুসা, সভাপতিত্বের দায়িত্বে ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ড. রফিকুল ইসলাম ও ড. মনিরুজ্জামান। এবং এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন ড. হানেরুথ ঠম্পসন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং রচনা করেন– 'Bengali : A Comprehensive Grammar'. হানেরুথ ঠম্পসন প্রথমে বাঙলা ভাষা অধ্যয়ন করেন, শব্দের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি গ্রহণ করেন। পরে তিনি ব্যাকরণ রচনার কাজে হাত দেন। বাঙলা ভাষার যে দুটি শব্দ তাঁকে আগ্রহী করে তুলেছিল সে-দুটি হলো– বৃহস্পতি ও প্রজাপতি।

বইটির নামকরণে আমরা ৩টি অংশ পেয়েছি। প্রথমত, পাণিনি; দ্বিতীয়ত, চমস্কি; তৃতীয়ত, তারপর।

ভাষার সামগ্রিক উদ্ভব নিয়ে পাণিনি ও কালক্রমে অনেক পণ্ডিতের মতামত ও আলোচনা সম্পর্কে আমরা পাণিনি পর্বে বিশেষভাবে অবগত হয়েছি। পরবর্তী পর্বে আলোচিত হয়েছে ভাষাতত্ত্বে চমস্কির অবদান সম্পর্কে। চমস্কির সৃষ্টিশীল ব্যাকরণতত্ত্বের কারণে ভাষার আচরণবাদী তত্ত্ব ভাষার বোধিগততত্ত্ব দ্বারা স্থানচ্যুত হয় এবং ভাষার বোধিগততত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে চমস্কির ফলেই নতুন বিজ্ঞান 'Psycholinguistics' (মনোভাষাবিজ্ঞান)-এর উদ্ভব হয়। এছাড়াও মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক নোয়াম চমস্কি জেনারেটিভ ভাষাতত্ত্বেরও প্রবক্তা।

নোয়াম চমস্কির *সিনট্যাক্টিক স্ট্রাকচার্স* (১৯৫৭) সালে প্রকাশিত হয়। তিনি প্রাণির যোগাযোগ সংশ্রয়ের অনির্দিষ্ট ক্ষমতার ওপর বক্তব্য রাখেন। এরপর ক্রমান্বয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ব্যাকরণে বাক্য আলোচনার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তবে, চমস্কির *সিনট্যাক্টিক স্ট্রাকচার্স* পাঠ করতে হলে ভাষাতত্ত্ব, গণিত এবং যুক্তিবিদ্যার পটভূমি মনে রাখা জরুরি।

নোয়াম চমস্কির *সিনট্যাক্টিক স্ট্রাকচার্স* আলোচনার সূচনা ঘটেছে দুটি বাক্য নিয়ে। একটির বাংলা করলে তা হবে–

১. 'রংহীন সবুজ ভাবগুলো ঘুমায় হিংস্রভাবে' (Colourless green ideas sleep furiously)
২. 'হিংস্রভাবে ঘুমায় ভাবগুলো সবুজ রংহীন'

বাক্য দুটিকে আমরা দেখি বৈয়াকরণিক দিক থেকে ঠিক আছে কিন্তু অর্থগত দিক থেকে এটি গ্রহণযোগ্যতা পায়না। তাই তাঁর মতে এটি অবৈয়াকরণিক। সুতরাং দেখা যায় যে, বাক্যের

বৈয়াকরণিকতা ও গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে একটি ব্যবধান থেকে গেছে। এ বিষয়টি পাণিনির আগে কেউ প্রয়োগ করেননি।

ভাষাপ্রবাহ ও চর্যার ভাষা : বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ। প্রাচীনকাল থেকেই চর্যার ভাষা নিয়ে বেশ কিছু মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে। চর্যাপদের ভাষা নিয়ে বিতর্ক, উপলব্ধির প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি রয়েছে। তারপরও লেখক এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, চর্যার ভাষা নিয়ে কোন কোন পত্রিকা এ পর্যন্ত লেখালেখি করেছে। কিন্তু দেখা যায় পত্রিকার সম্পাদকীয় মতামতে, মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধে চর্যার ভাষা সংক্রান্ত বিচার বিবেচনার অন্ত নেই। লেখক এখানে চর্যার ভাষা বিষয়টিকে উত্থাপন করেছেন। চর্যাপদের ভাষা বিষয়ে যে অস্বচ্ছতা যুগের পর যুগ ধরে আমাদের মনে রয়েই গেছে, তার পেছনে কয়েকটি কারণ লেখক দেখিয়েছেন–

১. উপলব্ধির বিতর্ক
২. ভাষাপ্রবাহ সম্পর্কে অস্বচ্ছতা
৩. ভাষিক তাৎপর্য
৪. তৎকালীন ভাষা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব

পর্যায়ক্রমে লেখক মনসুর মুসা 'ভাষাভেদ ও ভাষাবোধ', 'ভাষা-ভাবনা বিষয়ে' বিভিন্ন পণ্ডিতের অবদান উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখক যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন– গোপাল হালদার (উপভাষা-ভাবনা), সৈয়দ মুজতবা আলী (রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে), অন্নদাশঙ্কর রায় (ভাষাচিন্তা) ইত্যাদি। এরপর জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন ঢাকাই ভাষার নমুনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। গ্রীয়ারসন ঢাকাই উপভাষা নিয়ে কাজ করার পর দু'জন গবেষকের ঢাকাই উপভাষা সংক্রান্ত কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– একজন অনিমেষ কান্তি পাল, অপরজন মনিরুজ্জামান। দু'জনই ঢাকার সন্তান। ধীরে ধীরে বাংলা ভাষার পরিসর ব্যাপক হতে থাকে এবং বাংলা ভাষা সাংবিধানিক মর্যাদা পায়। বাংলা ভাষা ও প্রযুক্তির বিস্তার ঘটতে থাকে এবং সেটি আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শেষের দিকে এসে আমরা বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে লেখককে বেশ উদ্বিগ্ন হতে দেখেছি। কেননা লেখকের মতে, বাংলা ভাষার চর্চা ক্রমাগতই কমে যাচ্ছে আর গুটিকতক যারা বাংলা চর্চা করার সামান্য চেষ্টা করছে তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে তাদের গতিবিধিকে সমুন্নত রাখতে পারছে না।

এই গ্রন্থের শেষে লেখক ভাষার বহিঃগঠন, অর্ন্তগঠন এবং বৈয়াকরণিক ও অর্থগত দিক শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের ভিত্তিতে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: তার ভাষিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য' এই অধ্যায়ে গবেষক মনসুর মুসা ঐতিহ্যবাহী সেই ভাষণে বলা প্রতিটি বাক্যের নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক বাক্যগুলো গণনা করে ১০০৭টির মতো বাক্য পেয়েছেন এবং সেগুলো বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য নম্বর দিয়েছেন। এবং দেখিয়েছেন কোন বাক্য কোন আওয়াজে, কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন বাক্য

কতবার উচ্চারিত হয়েছে এবং কতটি খণ্ডাংশে গঠিত হয়েছে সেটারও বিস্তারিত আলোচনা আমরা এখানে দেখতে পাই।

আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটির বাক্যগুলোর মোট ৭৫টি শ্রেণিবিভাগ লক্ষ করি। এখানে ৬৫ প্রকারের বাক্য ১টি করে আছে। ১০টি বাক্যের প্রকারভেদে একাধিক বাক্য এসেছে। যেমন : প্রত্যাশাবাক্য আছে ৩টি, সমব্যথী ও সমবেদনামূলক বাক্য আছে ৪টি, ঐতিহাসিক বঞ্চনার স্মৃতিজাগানিয়া বাক্য ২টি, প্রতিপক্ষের অন্যায়কর্ম নির্দেশ বাক্য আছে ২টি, প্রতিপক্ষের অন্যায়ের স্বরূপ উন্মোচন বাক্য ২টি, শর্তবাক্য আছে ৬টি, নির্দেশবাক্য আছে ১২টি, বিকল্প নির্দেশ বাক্য আছে ৪টি, আদেশ বাক্য আছে ২টি, সতর্কবাক্য ২টি, ঘোষণাবাক্য ও প্রতিজ্ঞামূলক বাক্য আছে ২টি করে।

সামগ্রিকভাবে এই গ্রন্থে ভাষাবিজ্ঞানী মনসুর মুসার ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানীদের বিষয়ে যে ধারনা ও পঠন-পাঠন তারই একটি প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি। গ্রন্থটি ভাষা বিষয়ের ওপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মোছাঃ খাদিজা খাতুন মিম*

* গবেষণা সহকারী, গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাভার